মেঘমল্লার

শিবনাথ ভাদুড়ী

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭০

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অনিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীবিদ্যা অশোক

মুদ্রাকর : শ্রীমতী মমতা ঘোষ, প্রিন্টার্স কর্নার
৪৫এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

৺রঞ্জুকে

অরুণাংশু ঘোষের কথা মনে পড়ছে আমার। কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে কফি নিয়ে নরক গুলজারের উচ্চকিত কোন মুহূর্তে আমার হাত দেখে একটি ভারী আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণী করেছিল সে একদিন। খুব হাসাহাসি হয়েছিল তা নিয়ে আমাদের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যায় এখন বহু বছর আগের এক ধূসর অতীত।

পুরনো সহপাঠী-সহপাঠিনীদের সঙ্গে কাটানো অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্ত এখন বিস্মৃতির দরিয়ায় তলিয়ে গেছে। কালস্রোতে ফসিলে রূপান্তরিত আজ সেই সব জীবন্ত ঘটনার স্মৃতি। স্মৃতির ডুবোজাহাজে পাড়ি দিয়ে কখনও কখনও উদ্ধার করা যায় কোন কোন ঘটনা, কোন কোন দৃশ্য। ফসিল হয়ে যাওয়া সেই সব ঘটনা তখন রক্তপ্রবালের মত উজ্জ্বল বর্ণময় দামী ধাতু হয়ে যায় আশ্চর্য অলৌকিক কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।

আজ শরতের এই শান্ত মধুর রাতে জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল আমার অরুণাংশুর ভবিষ্যৎবাণীর কথা। আজ যা ঘটতে যাচ্ছে আমার জীবনে অনেকদিন আগেই তার আভাস ধরা পড়েছিল অরুণাংশুর কাছে। সেদিন আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি তার কথা। আজ ভবিষ্যতের একটা ছবি যখন একটু একটু করে ধরা দিচ্ছে চোখের সামনে তখন তার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কফি হাউসের সেই বিকেল।

দিন তারিখ কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু অরুণাংশুর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অনুষঙ্গের মত মনে পড়ে যায় সুনীপা, সুস্মিতা, বিশ্বজিৎ, তপন আর সুধাংশুদার কথা। একমাত্র সুধাংশুদাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়েছিল। বাকী সকলে ছিলাম ইতিহাস বিভাগের পঞ্চম বর্ষের ছাত্রছাত্রী।

কফি হাউসে নিয়মিত আড্ডার আসর বসত আমাদের। কখনও 'অফ পিরিয়ডে' কখনও বা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে চলে আসতাম আমরা কফি হাউসে। রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন আর ইতিহাসের আলোচনার মধ্যে চাটনীর স্বাদ আনত প্রফেসর বা কোন বিশেষ ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে কোন বিশেষ উত্তেজক ঘটনার রসালো আলোচনা।

সেদিনও যথারীতি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছিলাম আমরা। সুধাংশুদা আগেই এসে হাজির হয়েছিল। আমাদের দেখে চীৎকার করে

নিজের টেবিলে ডাকল। কফি আর পকৌড়ার ফরমাস করে চুটিয়ে বসলাম আমরা। আর তখনই সেই তাজ্জব হবার মত খবরটা দিল সুধাংশুদা।

—শুনেছ তোমরা এম. এস. বিয়ে করেছেন মেখলা রায়কে ?

একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল সেই খবর আমাদের কাছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা শান্ত স্বভাবের মেয়ে মেখলা রায়। তার সঙ্গে এম. এসের কোন ব্যাপার চলছিল বলে জানতাম না আমরা। যার পর নাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাই সকলে। একমাত্র অরুণাংশুই দেখেছিলাম নিরুত্তেজিত শান্তভাবে গ্রহণ করেছিল সেই আশ্চর্য সংবাদটি।

—তোর মনে আছে তপন মেখলার হাত দেখে কি বলেছিলাম ?

—মনে আছে। বলেছিলি প্রেম করে বিয়ে ওর। আর বিয়েটা হবে দু'তিন মাসের মধ্যেই। আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কথাটা শুনে। শুধু মেখলাই লজ্জায়, সংকোচে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমরা খুব হাসাহাসি করেছিলাম। ও কিন্তু কিছু বলতে পারছিল না। তখন আমরা সেটাকে ওর স্বাভাবিক লজ্জা বলে ভেবেছিলাম। এখন দেখছি তুই সত্যিই ভৃগু পরাশর।

হৈ হৈ করে হাত পেতে বসেছিল সকলে তখন অরুণাংশুর কাছে। দু' একজনের হাত দেখা শেষ করে আমার হাত নিয়ে পড়েছিল অরুণাংশু। মনে আছে, অবাক হয়ে গিয়েছিল সে।

—কি দেখছি তোর হাতে মীনাক্ষী ?

আমি বুঝতে পারিনি কি বলতে চাইছে ও। ভেবেছিলাম নিছক রসিকতা করে আজেবাজে কিছু বলতে চাইছে। অরুণাংশুর কণ্ঠস্বরে কিন্তু রসিকতার লেশও ছিল না। গম্ভীর বিস্ময়ে আমার হাতের তেলো লক্ষ্য করছিল ও। অন্য সকলে নির্বাক কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

—তোর স্বামী দেখছি বিদেশী হবে। আশ্চর্য ! তোকে দেখে তো বিন্দুমাত্রও মনে হয় না এরকম কাণ্ড ঘটাতে পারিস তুই !

আমি নিজে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিংবা হয়ত বিশ্বাস করতে চাইছিলাম না। অত্যন্ত রক্ষণশীল আমার পরিবার। জাতে বিয়ে না হলেই যেখানে হুলুস্থুল পড়ে যায় সেখানে ভিন্‌দেশী পাত্রকে কেউ সাগ্রহে বরণ করে নেবে না। আমার দিদি যখন এক কায়স্থ ছেলেকে

পছন্দ করে বিয়ে করেছিল তখন গোটা পরিবারে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে মত দেয়নি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল দিদি। ছেলের বাড়ি থেকেই বিয়ে আর বৌভাতের আয়োজন হয়েছিল। আমাদের বাড়ি থেকে কেউ সে বিয়েতে উপস্থিত হয়নি। জ্যাঠামশাই, জ্যাঠিমা, বড়দা, বাবা, মা, আমি কেউ না। তবে মন খারাপ হয়েছিল সকলের। শোকের বাড়ি হয়ে উঠেছিল আমাদের বাড়ি।

পাড়া প্রতিবেশীরা কথাও শুনিয়েছিল তা নিয়ে। আজকাল এসব ঘটনা তো ডালভাত ব্যাপার। এত বাড়াবাড়ি করে নাকি কেউ? আঠারো বছর আগে সেই যে দিদি বেরিয়ে গেছে এখনও এ বাড়িতে প্রবেশের ছাড়পত্র মেলেনি তার।

একপক্ষ কিছুটা নরম হলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মধুরেণ সমাপয়েৎ গোছের হতে পারত। কিন্তু যেহেতু দুপক্ষই সমান গোঁয়ার, সমান জেদী, অতএব সমান্তরাল রেখায় নিজের নিজের কক্ষপথে আবর্তন করছে তারা। অদূর ভবিষ্যতে মিলিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই তাদের মধ্যে। কাজেই বিদেশীকে বিয়ে করলে তার পরিণতি যে খুব মধুর হবেনা তা সহজেই অনুমান করা যায়। লাঠ্যৌষধি খেয়ে এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হবে।

তবু মেখলার প্রসঙ্গ সব অবিশ্বাস, সব সংশয় মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল। এক দুর্নিবার ভাগ্যচক্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল। অদৃষ্টের রহস্যময় ঈশারা দেখতে পেয়ে কেমন ছটফট করছিল আমার মন। সাহস করে সেই ভবিষ্যৎবাণীর কথা বলতে পারিনি আমি বাড়িব কাউকে। রসিকতা করেও ওরকম কথা উচ্চারণ করার হিম্মত ছিল না আমার!

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায় শেষ করে চাকরিতে ঢুকেছি পরে। সরকার-পোষিত এক স্কুলে সহকারী শিক্ষিকা হয়ে। এর মধ্যে সম্বন্ধ দেখা হয়েছে আমার জন্য। কোনটাই লাগেনি। কখনও এ পক্ষের কখনও ও পক্ষের অপছন্দের জন্য এত বয়সেও কুমারী রয়ে গেছি আমি।

অবশেষে আগামী কাল আমার কৌমার্য সঁপে দিতে চলেছি বিদেশী এক যুবকের কাছে। জন্ম যার দক্ষিণ ফ্রান্সের এক শহরে। জন্ম তারিখের হিসাবে পাঁচ বছরের ছোট আমার থেকে। আর বিষাদলালিত সুকুমার মুখে যার অনবদ্য এক গভীরতার আভাস। প্রথম দর্শনেই আমাকে নাড়া দিয়েছিল সেটি।

তবু মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের সংস্কার প্রাচীরের মত আড়াল করে রেখেছিল আমার অনুভূতি। গত তিন বছরে একটু একটু করে ধ্বসে পড়েছে সেই প্রাচীর। পুরনো সংস্কার, ভয় সব তলিয়ে গেছে আজ গভীর অনুভূতির স্রোতে। তবে বন্যার মত হঠাৎ প্লাবনের উচ্ছ্বাসে নয়। বিলম্বিত কিন্তু ধ্রুব কোন প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন করে মহাসমুদ্র একদিন কঠিন ভূখণ্ডময় মহাদেশে পরিবর্তিত হয়, কিংবা কঠিন মৃত্তিকাগর্ভ একদিন মহাসমুদ্রের জলস্রোতকে ধারণ করে অনায়াসে—ঠিক তেমন করে অনিবার্য নিয়মে দিনে দিনে পলে পলে সূচিত হয়ে উঠছিল এক বিরাট পরিবর্তন আমার চেতনায়, আমার রক্তে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে।

আমার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে মিশেল একমেবাদ্বিতীয়ম্ পুরুষ নয়। আরও অনেক পুরুষের আকাঙ্ক্ষার রৌদ্রবৃষ্টি ধারণ করে পেটা লোহার মত শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল আমার মন। না চাইতে যা পাওয়া যায় তার জন্য দুর্লভ মূল্য দিতে চাইনি আমি। আবার যা আমার আকাঙ্ক্ষিত তাকেও হ্যাংলামি করে পেতে চাইনি। রক্ষণশীল পরিবারের শিক্ষার থেকেও অনেক বড় এক জগদ্দল পাথর চাপানো ছিল আমার নিজের মানসিকতার মধ্যে। সেই পাথর সরিয়ে অনায়াসে মসৃণ পথ ধরে কেউ এগিয়ে আসতে পারেনি আমার কাছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারে বংশগরিমাবোধ স্নেহাস্পদের আশা আকাঙ্ক্ষার পক্ষছেদন করতে কুণ্ঠিত হয় না। আমার দিদির ক্ষেত্রে তার নির্মম চেহারা চাক্ষুষ করেছি আমরা। একমাত্র জাতের বাধা ছাড়া আর কোনও দিকেই অনাকাঙ্ক্ষিত ছিলেন না আমার জামাইবাবু। তবু এই পরিবারে কেউ মেনে নেননি তাকে আজ পর্যন্ত।

আর আমাদের কথা স্বতন্ত্র। পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ সত্যের মত তার ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করা যায় না। দিদিকে প্রশ্রয় দেবার সাহস হয়নি তাই আমাদের কারুর। দিদির কাছেই বড়দা মানে আমার জ্যাঠতুতো দাদার সম্পর্কে একটা কথা শুনেছিলাম। বড়দা নাকি তার সহপাঠী এক বন্ধুর বোনকে পছন্দ করেছিল। পুরুত বামুনের বংশ বলে এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই বড়দার পছন্দ। আমাদের সকলের বড় বড়দা এখনও পর্যন্ত বিয়ে করেনি। জ্যাঠামশাই অনেক আগেই চেয়েছিলেন বিয়ে দিতে। বড়দাই রাজী হয়নি।

বড়দার সঙ্গে কোনদিন খোলাখুলি আলোচনা হয়নি এসব নিয়ে। আমাদের বাড়িতে তার রেওয়াজ নেই। আমার থেকে মাত্র দু'বছরের বড় দাদার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ খোলাখুলি নয়। একমাত্র দিদির সঙ্গেই তবু কিছুটা খোলাখুলি সম্পর্ক ছিল আমার। দিদির সঙ্গে শঙ্করদার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যখন তুলকালাম কাণ্ড চলছে বাড়িতে তখনই দিদির কাছে শুনেছিলাম বড়দার ঐ ঘটনার কথা। বড়দা নাকি দিদিকে বোঝাতে এসেছিল যে বাড়ির অমতে বিয়ে করলে তার পরিণতি খুব সুখের হবে না। দিদি ক্ষেপে উঠেছিল। বাড়িতে নির্যাতনের বহর কিছু কম ছিল না। তার ঠেলায় মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল দিদি। কড়া গলায় থামিয়ে দিয়েছিল বড়দাকে।

—জ্যাঠামশাই আর বাবা তো পাল্লা দিয়ে গালাগালি দিয়ে চলেছেন। এখন তুমিও সুরু করবে নাকি? তা এসব আমার গা-সহা হয়ে গেছে। অনুলোম কিংবা প্রতিলোম বিবাহের পরিণতি, বংশমর্যাদা, পিতামাতার আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপের অনিবার্য প্রভাব নিয়ে হাজারটা কথা শুনেছি। নতুন কিছু যদি বলার না থাকে তাহলে ক্ষান্ত হও দয়া করে।

বড়দার গলা করুণ হয়ে উঠেছিল।

—আমি যা বলতে এসেছি তা তুই জানিস না। সেকথা কেউ তোকে বলতেই পারে না। কারণ ব্যাপারটা আমার নিজের।

তখনও দিদি জানতনা বড়দার জীবনে ওরকম একটা বিয়োগান্ত কাহিনী তৈরি হয়েছে। জানবে কি করে? দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কাছে সে সম্পর্কে কিছু শুনলে তো? আর বড়দার আচার ব্যবহারে তার কোন প্রকাশও ধরা পড়েনি কারুর কাছে। তাই বড়দার মুখে এসব শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল দিদি।

সম্ভ্রম বজায় রাখার চেষ্টা করেও দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারেনি বড়দা। বলেছিল জ্যাঠামশাই শুধু অসম্মতিই জানাননি, তার সঙ্গে ভয়ও দেখিয়েছিলেন। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদবর্জিত বিয়ে জীবনে কত দুঃখ নিয়ে আসে তার প্রমাণ দিতে কয়েকটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। সেখানেই ক্ষান্ত হননি, থেমে থেমে স্পষ্ট করে আরও কিছু শুনিয়েছিলেন।

—ঠুনকো মোহকে প্রশ্রয় দিওনা। পরিবারের মর্যাদাকে সম্মান দিতে শেখ। আর একটা কথা বলি। লোভের বশে বড় সত্যকে অস্বীকার

করোনা কোনদিন। তার ফল খুব ভাল হয় না।

থেমে থেমে চাপা গলায় বলা সেইসব কথা অভিশাপের মত ধ্বনিত হচ্ছিল বড়দার কানে। দু' একদিন ভাববার সময় নিয়েছিল সে। পরে পারিবারিক সংস্কারের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছিল নিজের ইচ্ছা, দুর্বলতা, আকাঙ্ক্ষা।

দিদি মেনে নেয়নি। বলেছিল—'আমাকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নাও। এ বাড়িতে এতদিন ধরে বড়রা জবরদস্তি করে তাদের চিন্তাভাবনা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ভেবেছেন তারা বড় কর্তব্য পালন করছেন। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য দেননি। স্বার্থপরের মত কেবল নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আমি বোকার মত তার জন্য নিজেকে বলি দিতে রাজী নই।

দিদির স্বাধিকার প্রচেষ্টা আমাদের পরিবারে স্বেচ্ছাচার বলে নিন্দিত হয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিয়ে করেছে দিদি। বিয়ের আগে অনেক লাঞ্ছনা নির্যাতন ভোগ করেছে। আমি নিজে তা প্রত্যক্ষ করেছি। সীমাহীন আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে আমার দিনরাত। একদিকে দিদির কষ্ট, যন্ত্রণা, অন্যদিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপলক্ষেও দিদির সঙ্গে তুলনা করে গঞ্জনা দেওয়া হয়েছে আমাদের।

আমার মনে আছে, একাধিকবার দিদির গোয়ার্তুমি দেখে অসহ্য হয়ে গায়ে হাত দিয়েছেন বাবা। দিদির পাশে শুয়ে রাত্রে চাপা গলায় দিদির কান্না শুনেছি। দিদির বিয়ের আগে শেষ ছটা মাস আমাদের বাড়িতে যেন শনির দৃষ্টি লেগেছিল। বাবা জ্যাঠামশায়ের তর্জনগর্জন, মা জ্যাঠিমার খিটিমিটি, আমার সঙ্গে দাদার খিটিমিটি—তুলকালাম কাণ্ড চলত তখন বাড়িতে।

দিদি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য মন্ত্রবলে সব অশান্তি দূর হয়ে গেল। তখন সে এক অন্য রূপ বাড়ির। খাঁ খাঁ করা এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করত তখন বাড়িতে। দিদির সাহসের বহর দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন বাবা জ্যাঠামশাই। দুয়ে দুয়ে চারের যোগফল যেন হিসেবে মেলেনি তাদের। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তার পরিধি পর্যন্ত সীমিত হয়ে গিয়েছিল।

শাসনের দড়ি তবু শিথিল হয়নি এতটুকু। বাড়ির বাইরে কতক্ষণ সময় থাকতে পারব তার সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল কড়াভাবে।

বন্ধুরা এলে, বা তাদের চিঠিপত্র এলে নজরে নজরে রাখা হোত। আমরা বুঝতাম নজরবন্দী করে রাখা হচ্ছে আমাদের। বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে তার মাত্রাটা একটু বেড়েই যেত।

তবে শাসনের ধারাটা যেন পাল্টে গিয়েছিল। যেন দিদিকে দেখে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তর্জন-গর্জনে জেদের মাত্রা বাড়েই কেবল। ওটা কোন ভাল দাওয়াই নয়। আমি স্বকর্ণে বাবাকে সেরকম মন্তব্য করতে শুনেছি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। ঠিক মেনে না নিলেও তেমনভাবে অগ্রাহ্যও বুঝি করতে পারছিলেন না জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাইয়ের গমগমে গম্ভীর গলার গাম্ভীর্য যেন একটু টোল খেয়েছিল তার পর।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরিবর্তন যা হয়েছিল তা বহিরঙ্গের চেহারায়। ভেতরে ভেতরে সাবেকী রক্ষণশীলতার সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ অজেয় রয়ে গিয়েছিল। দিদির কষ্ট মনে ছিল বলে সাবধান সতর্ক ছিলাম আমি। মোহ, মায়া, দুর্বলতা সজোরে সরিয়ে রাখতে রাখতে নিজের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য বর্ম তৈরি করে ফেলেছিলাম আমি। আমার শিক্ষা, সঙ্কল্প, অভিজ্ঞতা, সংস্কারের বাঁধন থেকে বাইরে এসে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা কল্পনাই করতে পারিনি।

কিন্তু যে নিয়তির বিধানে মানুষের সব সতর্কতা ব্যর্থ হয় সেই নিয়তির বিধানেই যেন আমাকে বর্মচ্যুত করে দুবল করে ফেলল মিশেল। আমার পারিবারিক ইতিহাসের কথা যখন মনে করি—আমার জ্যাঠামশাইয়ের রাশভারী গাম্ভীর্য, বাবার মেজাজী দাপট, মা-জ্যাঠাইমাদের পরিবারসর্বস্ব সংস্কারসর্বস্ব চিন্তাভাবনায় তখন মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে যাই আমি।

মিশেলের দিকে তাকিয়ে কিংবা মিশেলের মুখ মনে করে বুকের পাঁজরে একতারা বেজে ওঠে। 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'। আমার এই বিস্ময়ের কথা এখন মিশেলেরও অজানা নেই। বহুবার তাকে বলেছি আমি আমার এই বিস্ময়ের কথা। দিনের পর দিন একটু একটু করে আমার কাঠিন্যের আবরণ খসে খসে পড়ছিল। আমার সঙ্কোচ, ভীরুতা, সংস্কার আর ভয়ের শত উপচারে তৈরি নৈবেদ্য প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ করছিল সে। বিনিময়ে তার বরাভয়ের দাক্ষিণ্য বিতরণ করে আমার মধ্যে অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করছিল।

অনায়াসে হয়নি এসব। একথা যখন ভাবি তখন বিস্ময়ে হতবাক

হয়ে যাই আমি। মানুষের সমস্ত সঙ্কল্প, বাসনা, চিন্তাভাবনাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে যে অমোঘ নিয়তি তার অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আবাহন জানায় তাকে আমার মত মূল্য দিয়ে কয়জনে জানতে পারে? বড় বাধা, ছোট বাধা, মানসিক বাধা, পারিবারিক বাধা, দেশের বাধা—হাজারটা বাধা পর্বতপ্রমাণ উঁচু হয়ে ভ্রূকুটি করেছে আমায়।

পাঁচ বছরের ছোট সে বয়সে। তার দেবদুর্লভ চেহারার পাশে নিজেকে যথেষ্ট ম্লান, নিষ্প্রাণ লাগে আমার। আমার রং ফর্সা নয়। তিরিশ উত্তীর্ণ বয়সে সেই রঙের জৌলুষ অনেকটাই অপসৃত। মুখশ্রী বা চেহারার গড়ন অসুন্দর নয় ঠিকই। তবে অসাধারণ সুন্দরও কিছু নয়। তবু মিশেল যেন বুঝতে চায় না। তার চোখের আলোয় নিজেকে দেখে অবাক হয়ে যাই। সে যখন দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচ ভাষায় তার অপার মুগ্ধতা ব্যক্ত করে তখন আমার কেমন ধাঁধা লাগে। রূপ জিনিষটা কতখানি বহিরঙ্গ আর কতখানি অন্তর্লীন তার হিসাব মেলাতে গিয়ে দিশেহারা লাগে।

তবু মাঝে মাঝে মিশেল হয়ে যাই আমি। মিশেলের চোখের মুগ্ধতা ধার করে ঘুরে ফিরে দেখি আমার মুখ, চোখ, গলা, বুক আর নিতম্বের খাঁজ। অর্ধনারীশ্বরের মত মিশেল আর মীনাক্ষী এক শরীর এক প্রাণ হয়ে যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি আমার চোখের মধ্যে মিশেল এসে দাঁড়িয়েছে কখন। নবাবিষ্কৃত মহাদেশের মত মীণাক্ষীর সৌন্দর্য আবিষ্কার করে মোহিত হয়ে যায় মীণাক্ষীর চোখে আবির্ভূত মিশেলের সত্তা। 'ইস্ট ইজ ইস্ট এ্যাণ্ড দ্যা ওয়েষ্ট ইজ ওয়েষ্ট। দ্যা টুইন শ্যাল নেভার মীট' মিথ্যা হয়ে যায়।

সুদূর ফ্রান্সের রূপবান বিষণ্ণ স্বভাবের যুবকটি যখন তার বিষণ্ণতা ভুলে গিয়ে ঘোষণা করে 'ভিনি ভিডি ভিসি' তখন এক বাঙালী মেয়ের বুকের কপাট খুলে যায়। জীবনের রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ের মুখোমুখী হয়ে সম্বিত হারিয়ে ফেলে সে। আর দক্ষ লুটেরার মত সেই বিদেশী যুবক অনায়াসে আত্মসাৎ করে নেয় তিলে তিলে গড়ে ওঠা তার সমস্ত পুঁজি। কাঙ্গালের ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়ে এক লুটেরা কাঙাল করে দিয়ে যায় পরম সতর্ক আর সাবধানী এক মেয়েকে।

অরুণাংশু কত বড় হস্তবিশারদ তা এতদিন ভেবে দেখার ফুরসত পাইনি। আজ মনে হচ্ছে যদি সে সত্যই আমার হাতের রেখায় এই ভবিতব্য দেখতে

পেয়ে থাকে তাহলে এত বছর পরে হলেও তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু তার ঠিকানাও যে রেখে দিইনি যত্ন করে। অবহেলাভরে শোনা সেই অবাঞ্ছিত ভবিতব্য নিয়ে ভাবতে চাইনি বলেই আজ সেই জ্যোতিষ বিজ্ঞানীকে সম্মান জানাবার সুযোগ পাচ্ছিনা। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে বারবার।

॥ দুই ॥

আসছে কাল রেজেষ্ট্রি করছি আমরা। মিশেলের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হয়ে গেছে আমার। ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নিয়ে যে পরিবর্তন আসছে আমার জীবনে তার জন্য সব রকম মানসিক প্রস্তুতি সেরে ফেলতে হবে আজকের মধ্যেই।

পরপর তিন দিনের ছুটি নিয়েছি আমি। তবে এ হলো সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। এই ছুটি দীর্ঘায়িত করতে হবে কিনা কিংবা বরাবরের মত চাকরি ছেড়ে দেব কিনা তা নির্ভর করছে ভবিষ্যতে কি রকম পরিস্থিতি দাঁড়াবে তার ওপর। মিশেলেব ভারতবর্ষে থাকার মেয়াদ শেষ হচ্ছে এ বছরের ডিসেম্বরে। সেপ্টেম্বর মাস চলছে এখন। আমি চেয়েছিলাম একেবারে শেষ মুহূর্তে সব কিছু করতে। অবাঞ্ছিত ঝামেলা এড়ানো যেত তাহলে।

আগামী কাল যে রেজেষ্ট্রি করছি তার জন্যও কম দোনামোনা করিনি আগে। অসীম ধৈর্য নিয়ে, মমতা নিয়ে মিশেল আমায় বুঝিয়েছে। আমার মত আজন্ম ভীরু এক ঘরকুনো বাঙালী মেয়ের মনে সাহস সঞ্চার করেছে। আমাকে যারা দীর্ঘদিন ধরে দেখেছে তাদের কাছে আমার এই পরিবর্তন অভাবিত ঘটনা। আর অন্যের কথা কেন? চার বছর আগে আমি নিজেই কি অনুমান করেছিলাম আমার এমন ভবিতব্যের কথা?

মাঝে মাঝেই খুব অদ্ভুত একটা চিন্তা আসে মনে। আমার মনের গভীর প্রত্যন্তে তীব্র কোন ইচ্ছাই কি চুম্বক শক্তিতে ধরে এনেছে এখানে মিশেলকে? কিংবা তার ইচ্ছার চুম্বক শক্তিই টেনে নিয়ে এসেছে আমাকে আলিয়ঁসে? তা যদি না হবে তাহলে দর্শনমাত্র গভীর সম্মোহনের ঢেউয়ে হারিয়ে গিয়েছিল কেন আমার চেতনা?

চার বছর আগের সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়লে সেদিনের সেই অপলক অনুভূতি আবার সঞ্চারিত হয় কিভাবে? কিংবা তা হয়তো নয়। আমার মন হয়ত পায়ে পায়ে ফিরে যায় সেই মুহূর্তে। বর্তমানের যে কালপ্রবাহ ভবিষ্যতের সমুদ্রপ্রবাহের দিকে দুরন্তগতিতে ছুটে চলেছে তাকে রুদ্ধগতি করে ভিন্নমুখী করে সরিয়ে নিয়ে আসে মন অতীতের জলাধারে। স্রষ্টা যেভাবে তার নিজের সৃষ্টি ঘুরে ফিরে দেখে জহুরীর মত বার বার কিংবা খুনের পর খুনী যেভাবে ঘুরে ফিরে আসে তার খুনের জায়গায় ঠিক সেভাবে আমিও মাঝে মাঝেই কালপ্রবাহের উজানে পাড়ি দিয়ে নোঙ্গর ফেলি বহুপরিচিত সেই চেনা জায়গায়। বারবার পাড়ি দিই আলিয়ঁসের বিশেষ সেই দিনটিতে। মিশেলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সেই সান্ধ্য রক্তিম মুহূর্তে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়া সাঙ্গ করে ফরাসী ভাষা শিখেছিলাম আমি এক বছর। নেহাৎই শখ করে। আমার কলেজ জীবনের সহপাঠিনী বিদিশার অনুরোধে। ফ্রান্সের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত এক পাত্রের সঙ্গে আনা হয়েছিল ওর সম্বন্ধ। বিয়ের পর ফ্রান্সে গিয়ে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্যই কাজ চালানোর মত ফরাসী ভাষা শিখতে গিয়েছিল ও। বন্ধুদের মধ্যে বিদিশার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার সবচেয়ে বেশি। বাড়ির তেমন মত না থাকা সত্ত্বেও অনুনয়-বিনয় করে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম ক্লাসে ওকে সঙ্গ দেবার জন্য। খুব বেশি লাভ হয়নি তাতে। কাজ চালানোর মত কিছু মালমশলা সংগ্রহ হয়েছিল মাত্র। পরে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নানা কারণে। তবে তার প্রধান কারণ ছিল বিদিশার বিয়ে হয়ে যাওয়া। ওর জন্যই শিখতে গিয়েছিলাম ফরাসী ভাষা। ও ছেড়ে দিল বলে আমিও যেন আর চালিয়ে যেতে উৎসাহ পেলাম না। পরে কালচক্রে ফরাসী ভাষার সঙ্গে যে কোন যোগাযোগ ছিল একদিন তাও যেন ভুলতে বসেছিলাম।

মাঝে মাঝে ফ্রান্স থেকে বিদিশার চিঠি পেতাম। তার মধ্যে দু'চারটে ছত্র ফরাসী লেখা থাকত। অভিধানের সাহায্যে কোন রকমে তার অর্থ উদ্ধার করতাম। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হতো না। ফেরত চিঠিতে বিদিশাকেই অনুরোধ করতাম ও যেন ওগুলির অর্থ লিখে দেয়। ফ্রান্সে থাকতে থাকতে কাজ চালানো মত ফরাসী শিখে গিয়েছিল ও। সেটা ওর চিঠিপত্রেই প্রকাশ পেত। আমার ক্ষেত্রে তার উল্টোটা হোল। ক্লাসে যাওয়া বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমারও ফরাসী শেখায় ইতি পড়লো।

চর্চার অভাব, উৎসাহের অভাব, যোগাযোগের অভাবে আমার ফরাসী ভাষা শিক্ষার অধ্যায় যখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে তখনই হঠাৎ একটা দুঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবার সুরু হোল আমার ফরাসী চর্চা।

বিদিশার স্বামীর সঙ্গে তার একটি ফরাসী ছাত্রীর ঘনিষ্ঠতা এমন একটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছল যে বিদিশার পক্ষে শেষ পর্যন্ত আর মানিয়ে চলা সম্ভব হলো না। মন কষাকষি, কথা কাটাকাটি, বচসা, বিবাদ কলহের শেষ ধাক্কায় স্বামীকে ছেড়ে চলে এল ও দেশে। বিদিশার কোন সন্তানাদি না থাকায় সে ব্যাপারে কোন ঝামেলা হলো না। দেশে ফিরে এসে বাপের বাড়িতেই উঠেছিল। পরে একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছে। বাড়তি আনন্দ আর সুবিধা খুঁজে নিতে সুরু করেছে আলিয়ঁসে ফরাসী ভাষার চর্চা আর শনি রবিবারে গানের স্কুলে গিয়ে গীটার শেখা।

বিদিশার অনুরোধেই প্রথম ফরাসী ভাষায় হাতেখড়ি হয়েছিল আমার। তার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার উৎসাহে ভাটা পড়েছিল। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ফরাসী চর্চা। কিন্তু ও যখন সব কিছু ছেড়ে ফিরে এল দেশে তখন ওর অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। ওর সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি হয়ে গেলাম আবার আলিয়ঁসে। নতুন করে কেঁচে গণ্ডুষ করতে হোল। কষ্টটা যেন আমারই বেশি। বিদিশার তবু কিছুটা চর্চা ছিল। কিন্তু সম্বল দুজনেরই একটি মাত্র সার্টিফিকেট। দুজনেই তাই ভর্তি হলাম এক ক্লাসে। বিদিশার তবু কিছুটা লক্ষ্যবস্তু ছিল। যে ফার্মে ও কাজ করত তাদের ফ্রান্সের এক কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল। ফরাসী ভাষার ডিগ্রী ওকে চাকরিতে কিছু বাড়তি সম্মান আর অর্থনৈতিক সুবিধা দেবে বলে শুনেছিল ও। সেকারণেই ওর সেই প্রয়াস।

কিন্তু প্রথম বারের মত সেবারেও আমার ক্ষেত্রে প্রয়োজনটা ছিল অনেক গৌণ ব্যাপার। বিদিশার অনুরোধ রক্ষা করতে, বিদিশাকে সঙ্গ দিতেই আসা আমার আলিয়ঁসে। আমার মনে আছে মা খুব রাগারাগি করেছিলেন। এখনও মনে পড়ে মায়ের তিরস্কার।

—তোর এখন সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে। এসব ধিঙ্গীপনা এখন না করলেই নয়? চাকরি করছিস আমাদের অমতে। নেহাৎ স্কুলে বলে তেমন করে বাধা দিইনি আমরা। কিন্তু এরপর সন্ধ্যেবেলায় ক্লাস সুরু করলে রক্ষা থাকবে তোর? আমাকেও গালাগালি খেতে হবে বাবুর কাছে তোর জন্য।

আমার মা বাবাকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করেন কেন জানি না। আমাদের বাড়িতে যে ধরনের পারিবারিক পরিবেশ রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্বোধন আমার কানে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের চেহারা নিয়ে আসে। দীর্ঘদিন ধরে শুনে শুনে এই সম্বোধনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা। তবু যে সেটা আমার কানে খট করে বাজে তার কারণ হয়ত একটাই। এ বাড়ির অভ্যাস, রীতিনীতির সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে চলার অক্ষমতা। তার জন্য আমার স্বভাব কতটা দায়ী আর শিক্ষা কতটা দায়ী জানি না। অবশ্য মিশেল বলে আমাদের স্বভাব তৈরি হয় শিক্ষা সান্নিধ্য পরিবেশের সমন্বয়ে।

মাঝে মাঝেই আমার কাছে এ ধরনের চিন্তা প্রকাশ করে মিশেল। কখনও ফরাসীতে কখনও ইংরাজীতে যখনই আমি আমার পারিবারিক চেহারা ফুটিয়ে তুলি মিশেলের কাছে কিংবা নানা বিষয়ে আমার অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করি তার কাছে তখনই সে এই ধরনের মতামত প্রকাশ করে।

মিশেল বলে—'এত হবেই মীনাক্‌শি। পরিবারের মধ্যে তো আবদ্ধ হয়ে নেই তুমি। বাইরের পরিবেশও প্রভাবিত করছে তোমার চিন্তা ভাবনা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তোমার শিক্ষা। কাজেই সব ব্যাপারে মানিয়ে চলতে অসুবিধা হবারই কথা। ওটা তোমার অক্ষমতা নয়।

যাই হোক্ মিশেলের কথা পরে হবে। তার কথা বলার জন্যই তো আমার নিজের কথা বলার প্রয়োজন হোল। তা না হলে মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ এক স্কুল শিক্ষিকার জীবনালেখ্য তুলে ধরার প্রয়োজন হোত নাকি? আমার জীবনের বাড়তি 'ডাইমেনশন' তো মিশেলেরই অবদান।

আরও আগের সূত্র ধরে বলতে হয় বিদিশা যদি তার ভাষা শিক্ষার সহ-পাঠী হিসাবে আমাকে না চাইত আর বাবা, জ্যাঠামশাই যদি আমার সে ইচ্ছায় প্রশ্রয় না দিতেন তাহলে হয়ত মিশেল অধ্যায় সুরু হতে পারত না।

নিজের জীবনের এই অধ্যায়টা নিয়ে যখনই ভাবি তখনই বিস্ময়ে অভিভূত হই। সমস্ত ঘটনাগুলো উপন্যাসের ছকে সাজানো কাহিনীর মত মনে হয়। এমন কি বিদিশার জীবনের বিয়োগান্ত ঘটনাটা পর্যন্ত। মনে হয় এক অদৃশ্য কাহিনীকার আমার আর মিশেলের পূর্বরাগের পটভূমিকাটি খুব ছকে ঢেলে নিপুণ করে সাজিয়েছেন।

বিদিশার সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা আমার। তার দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণা আমারও কিছু কম নয়। অথচ মিশেলকে পাওয়া আমার সেই দুর্ভাগ্যের সূত্র ধরেই। জীবনে পরম পাওয়ার মধ্যে এমন করেই বুঝি কাঁটার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। বিদিশার জীবনের অন্ধকার নিশাই যেন আমার জন্য নিয়ে এসেছিল রক্তিম বর্ণাঢ্য সূর্যের সৌন্দর্য।

মিশেলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সেই মুহূর্ত আমার জীবনে এক পরম আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় সেমেষ্টারে ভর্তি হবার পর প্রথম ক্লাসটি অনিবার্য কোন্ কারণে যেন করতে পারিনি। আর দ্বিতীয় দিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আলিয়ঁসে এসে পৌঁছতে। যথারীতি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ক্লাস। বিদিশার কাছে ক্লাসঘরের নম্বর জেনে নিয়েছিলাম আগেই।

বন্ধ দরজা ঠেলে ক্লাসে ঢুকতেই আমার চোখ হারিয়ে গেল দীঘল দুই চোখের বিষণ্ণ অপলক এক বাদামী ঔজ্জ্বল্যে। আর কেউ লক্ষ্য করেছিল কিনা জানি না। মুহূর্তের জন্য কেমন এক স্থবিরতা নেমে এসেছিল আমার শরীরে। আর আত্মবিস্মৃত এক মুগ্ধতা যেন পেয়ে বসেছিল আমাকে।

আজও সেই সন্ধ্যার কথা মনে করলে তীব্র আবেগজনিত এক শিহরণ সুরু হয় মনে। মনে পড়ে দেখামাত্র নিবিড় এক ঘোর আচ্ছন্ন করেছিল আমায়। তবে আনন্দঘন কোন উচ্ছলতা ছিল না তার মধ্যে। দুর্লভ কোন অভীষ্টের জন্য যে বিষণ্ণ মুগ্ধতা বোধ করে মানুষ—তেমনই এক বিষণ্ণ মুগ্ধতার ঢেউ পলকের জন্য হলেও প্রবাহিত হয়েছিল আমার মনে। সেই বিষণ্ণতা ছিল মিশেলের মধ্যেও। তার চোখের উজ্জ্বল বাদামী আভায়, তার তীক্ষ্ণ নাসিকায়, চিবুকের নিটোল খাঁজে কেমন এক ধ্যানমগ্ন বিষণ্ণতা ছিল। ব্যক্তিগত জীবনের বিষণ্ণ অভিজ্ঞতা অনবদ্য এক ভাস্কর্য দিয়েছিল তার মুখে, চোখে, শরীরে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্ব, অভিজ্ঞতা আর স্বপ্নের অমিল তার মুখে এনেছিল শাণিত এক তীক্ষ্ণতাও।

সেই মুহূর্তে অবশ্য এসব কিছুই ভাবিনি। ভেবেছি অনেক পরে। ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। মিশেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর বুঝেছি আমার সেই বিশ্লেষণে বড় রকমের কোন খুঁত ছিল না। সঠিক রাস্তা ধরেই চলেছিল সেটা। আরও বুঝেছি আমার মধ্যে অসুখী আর্ত আর দুঃখী একটা মানুষ মিশেলের মধ্যেও দেখতে পেয়েছিল অসুখী, দুঃখী আর আর্ত একটা মানুষ। আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করেছিল সেকারণে।

মিশেলের আগে অপর কোন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইনি বললে সত্যের অপলাপ হবে। পরিচিত মহলে দু'চারজন পুরুষকে আমার ভালো লেগেছে। এমনকি যারা আমাকে দেখতে এসেছিল তাদের মধ্যেও দু'একটি পুরুষকে খারাপ লাগেনি আমার। কিন্তু তার তীব্রতা, ব্যাপকতা বা স্থায়িত্ব বলার মত নয়। একাধিক কারণে তাদের কারুর সঙ্গেই স্থায়ী কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সম্বন্ধের ক্ষেত্রে দুই পরিবারের মতামত দায়ী হলেও অন্য ক্ষেত্রে আমার নিজের সংস্কার, ভীরুতা আর সঙ্কোচই আমাকে নির্লিপ্ত রেখেছিল। মিশেলের ক্ষেত্রেও অন্যথা হতো না।

মধ্যবিত্ত পরিবারে বাধানিষেধ আবেগের জোয়ারকে ক্রমাগত সংযত করতে থাকে বলে সচরাচর আবেগের তীব্রতা বাঁধ ভেঙে উপচে পড়তে পারে না। আবেগ আর আকাঙ্খা সংযমের প্রাচীরের আড়ালে পড়ে যায়। সেই প্রাচীরের অচলায়তন যদি ভূলুণ্ঠিত করা যায় তাহলে সব বাধা-নিষেধ সংস্কার খড়কুটোর মত ভেসে যায় কোথায় উত্তাল তোড়ে। মিশেল সেটি বুঝেছিল বলে তার অব্যর্থ অস্ত্রে সম্ভব করেছিল সেই অসম্ভব ঘটনা।

মাঝে মাঝে আমার একটি কথা মনে হয়। মিশেল কি প্রথম থেকেই টের পেয়েছিল আমার মধ্যে সেই বাধা? প্রথম থেকেই তাই তার শক্তি সুসংহত করে প্রস্তুত হচ্ছিল সব রকম পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য? এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা কথা আমি সেদিনই বুঝেছিলাম। প্রথম সাক্ষাতের গভীর অপলক সন্ধিক্ষণে। আমি একা নই। মিশেলও হয়েছিল আত্মবিস্মৃত। তার অপলক গভীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল সেটি।

মনে আছে ফরাসী কায়দায় তাকে শুভসন্ধ্যা জানিয়েছিলাম 'বঁ সোঁয়া' বলে। সেও তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল 'বঁ সোয়া' বলে। সামনের সারির সব আসন অধিকৃত ছিল বলে পেছনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে সামনের চেয়ার থেকে উঠে এসে বিদিশা বসে পড়েছিল আমার পাশে একটা ফাঁকা চেয়ারে। ফিসফিস করে বলেছিল—এত দেরি হলো যে?

অন্যের কান বাঁচিয়ে খুব আস্তে করে জবাব দিয়েছিলাম তার। —আর বলিস না। বাস পেতে এত দেরি হয়ে গেল!

ততক্ষণে পড়াতে শুরু করেছিল মিশেল। দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল আমার। বিদিশার যে অসুবিধা হচ্ছে না তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

পড়াতে পড়াতে যথারীতি সকলের দিকেই পালা করে তাকাচ্ছিল মিশেল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আমি যে বুঝতে পারছি না তা ধরা পড়ে যাচ্ছে মিশেলের কাছে। অক্ষমতার লজ্জা বড় বেশি করে বাজছিল আমার। আমি তাই সঙ্কল্প করেছিলাম খুব পরিশ্রম করে আমার সেই ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নেব পরে।

ছাত্রী হিসাবে বরাবর মাঝারি ধরনের আমি। শিক্ষকের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি ঠিকমত। অন্যরা যখন অনায়াসে জবাব দিয়ে যাচ্ছে আমি তখন আমার অক্ষমতার লজ্জায় গুটিয়ে রেখেছি নিজেকে। কিন্তু সেদিনের মত তীব্র হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত হইনি আগে। লজ্জা যেন শুধু আমার অক্ষমতার জন্য নয়—সেই অক্ষমতা মিশেলের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে বলেও যেন লজ্জার সীমা ছিল না আমার।

মিশেলের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে আজ তার কোন আভাস আমার মনশ্চক্ষে ধরা পড়েনি সেদিন। কিন্তু সেদিনের সেই সন্ধ্যায় আলিয়ঁসের ক্লাসরুমে বসে মনে হয়েছিল আমার মধ্যে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইতে যাচ্ছে। ক্লাসে সোচ্চার হবার ইচ্ছে, সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের ছাড়িয়ে যাবার ইচ্ছে আগে এমন তীব্রভাবে বোধ করিনি আমি। আমার যে ব্যক্তিত্ব নিঃশব্দ কষ্টে, যন্ত্রণায়, হতাশায় ধুঁকছিল তা হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে সজীব হয়ে উঠতে চাইল।

সেই ক্লাসে কয়েকটি ভাল ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা উৎসাহভরে প্রশ্ন করছিল, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। মাঝেমাঝে মিশেলের সঙ্গে হাস্যপরিহাসও চলছিল তাদের। দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে, চর্চার অভাবে তার কিছুই বুঝছিলাম না আমি। আমার কানে তাদের কণ্ঠস্বর, হাসির আওয়াজ বোবা এক বিভ্রম তৈরি করছিল। আমি বুঝছিলাম আমার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হতে চাইছে মিশেলের প্রতি। তার লম্বাটে শীর্ণ মুখের সৌকুমার্য থেকে চোখ সরাতে ইচ্ছা করছিল না আমার। জোর করে সরিয়ে আনতে হচ্ছিল আমার অবাধ্য চোখ। তাকে কেন্দ্র করে সেই সন্ধ্যায় যে মোহের বলয় তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল আমার দুই চোখ। আমার জীবনে সেও যেন আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা।

আগে কোন পুরুষতা সে যতই আকর্ষণীয় হউক না কেন তার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখার এমন দুরন্ত নেশা টের পাইনি। মিশেলের

থেকেও অনেক সুন্দর চেহারার পুরুষ আমার চোখে পড়েছে। সৌন্দর্যের প্রতি সব মানুষেরই যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে সেই আকর্ষণ তাদের ক্ষেত্রেও বোধ করেছি। কিন্তু তা এমন তীব্র নেশার ঘোরে উৎপাটিত করতে আসেনি আমার অস্তিত্ব।

সেই মুগ্ধতার ঘোর আমি মিশেলের মধ্যেও দেখেছিলাম। তার দৃষ্টিও ঘুরে ফিরে আমার মুখের উপরে নিবদ্ধ হচ্ছিল ক্রমাগত। কিন্তু আমার মত আত্মবিস্মৃত হয়নি সে। মিশেলের স্বভাবে বরাবর আমি দুটি পরস্পর-বিরোধী ভাবের সমন্বয় দেখেছি! মুগ্ধতার জোয়ারে তাকে কোনদিন ভেসে যেতে দেখিনি। সজাগ আত্মপ্রত্যয় বর্মের মত ঘিরে থাকত তাকে। আত্মবিস্মৃত হতে দিতনা। মুগ্ধতার মত্ততায় যে আত্মবিস্মৃতি ঘটে তা তার ক্ষেত্রে যেন ভাবাই যেতনা।

মনে আছে একবার সহাস্যে আমার দিকে তাকিয়ে কি একটা প্রশ্ন করেছিল সে। আমি অন্যমনস্ক থাকায় ঠিকমত শুনতে পাইনি। আরক্ত লজ্জায় লাল হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতে হয়েছিল আমাকে 'পারদঁ?'

আগের মতই স্মিত হেসে সে প্রশ্ন করেছিল দ্বিতীয়বার।

—এস্ ক্য ভু কঁপ্রোনে সো ক্য জো ডি?

—ন মসিঁয়, মে জো·····

আমার ফরাসী বিদ্যায় এর বেশি কিছু বলতে অক্ষম হয়েছিলাম সেদিন। আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। ক্লাসের মধ্যে সকলের সামনে এভাবে অপ্রস্তুত না করলেও পারত সে। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার অনেক পরে তার কাছে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলাম। নির্বিকার ভঙ্গীতে জবাব দিয়েছিল সে।

—ক্লাসে অন্য সকলের মত তুমিও একজন ছাত্রী। তুমি ভাল করে শুনছ কি না, বুঝছ কিনা সেটা দেখাও আমার কর্তব্য। তুমি যদি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে বসো শিখবে কি করে?

আমার রাগ হয়েছিল কথাটা শুনে। পাল্টা আক্রমণ করেছিলাম তাই মিশেলকে।

—ঠিক কথা। উচিত কাজই করেছ তুমি। কিন্তু মাঝে মাঝে যে নিজের টেবিল ছেড়ে আমার চেয়ারের খুব কাছে এসে দাঁড়াতে সেটার কারণটা একটু খোলসা করে বলবে আমায়?

একটুও বিব্রত বোধ করেনি মিশেল। হেসে সহজ ভঙ্গীতেই জবাব

দিয়েছিল সেই প্রশ্নের।

—অস্বীকার করছি না। মাঝেমাঝেই মনে হোত তুমি আমার থেকে অনেক দূরে রয়েছ। সেই দূরত্ব অসহ্য লাগত আমার। তোমার কাছে সরে এসে তোমার নৈকট্য পেতে চাইতাম। তবে তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ ওটাও আমার একটা অভ্যাস। ছাত্রছাত্রীদের কাছে না এসে ভাল করে পড়াতে পারিনা আমি।

মিশেলের কথার ভঙ্গী ছিল এরকমই। অকারণ দ্বিধাসংকোচের বালাই ছিল না তার। আর আমার দ্বিধাসংকোচ ঘুচাতেই কি কম চেষ্টা করতে হয়েছে ওকে? মনে পড়ে তবুও আমি হার মানতে চাইনি।

—আমি যদি তোমাকে সকলের সামনে অপ্রস্তুত করতাম তাহলে কি হতো?

—কি আবার হতো? তুমি কিই বা বলতে পারতে? একজন শিক্ষক যেভাবে খুশী ঘুরে ফিরে পড়াতে পারে। কোন ছাত্রী সে ব্যাপারে তাকে নির্দেশ দিতেই পারে না।

—শিক্ষক-ছাত্রীর সম্পর্ক নিয়ে তো খুব টনটনে জ্ঞান আছে দেখছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতানো কেন?

—আচ্ছা মীনাক্‌শি তুমি নিজেই বলো এসব কথার কোন মানে হয়? ছাত্রীর সঙ্গে কোন শিক্ষক ঘনিষ্ট হতে পারবেনা এমন কোন আইন যদি থাকত সত্যিসত্যিই তাহলেও নয় নিজেকে আসামী মনে করতে পারতাম। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করবে তো যে তোমার যত ক্ষতিই করিনা কেন ফরাসী ভাষাটা অন্ততঃ তুমি ভালই শিখেছ আমার জন্য। আমি যদি একেবারে ছেড়ে দিতাম তোমাকে তাহলে কি সম্ভব হতো সেটা?

—ফরাসী কেন ইংরেজী ভাষাটাও আমি তোমার জন্যই ভালভাবে রপ্ত করার চেষ্টা করেছি মিশেল। কিন্তু তার কারণ হলো প্রয়োজন। তুমি তো জান প্রয়োজনের চেয়ে বড় তাগিদ আর কিছু নেই। অন্য কিছুকে কারণ বলে মানতে রাজী নই আমি তাবলে।

সেই প্রথম দিনে পরবর্তী অধ্যায়ের ছবিটি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বে পরস্পরের মানসিক বিদ্যুৎ তরঙ্গের প্রভাবেই বোধ হয় অলক্ষিতে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল আমার সেদিন মিশেলের সঙ্গে। সেদিন ক্লাসের পর বাড়ি ফিরবার পথে বিদিশার সঙ্গে হাঁটতে

হাঁটতে আমার হঠাৎ মনে হোল একটা মোড় নিতে যাচ্ছে আমার জীবন। স্পষ্ট করে কিছু অনুভব না করলেও বিষাদমিশ্রিত এক অনির্বচনীয় সুখে ভরে উঠেছিল আমার মন। সুদূর ফ্রান্স থেকে আগত এক যুবককে দেখে কেন আমার মনে এত নাড়া লাগল তা আমি বিশ্লেষণ করতে পারছিলাম না কিছুতেই। তবু কেন যেন মনে হচ্ছিল বারবার অতঃপর এই যুবকটি আমাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না। ঝোড়ো হাওয়ার মত হঠাৎ আমার জীবনে আবির্ভূত হয়ে আমূলপ্রোথিত জীবনের শিকড় উৎপাটিত করতে চাইবে।

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বিদিশার অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে চমকে উঠি আমি।

—দেখিস মীনাক্ষী প্রেমে পড়ে যাসনা মঁসিয়োর।

—তার মানে?

—তার মানে আমার কেমন যেন মনে হোল ভদ্রলোক খুব পছন্দ করছেন তোকে।

ইচ্ছা করেই প্রশ্রয় দিইনা আমি বিদিশাকে। তাছাড়া ওর চিন্তাটাকে পরখ করেও দেখতে ইচ্ছা করে।

—কি করে বুঝলি উনি আমাকে পছন্দ করছেন? আজই তো সবে দেখলেন আমাকে। এর মধ্যে—

হাল্কা হতে চেষ্টা করে বিদিশা।

—আরে অত হিসাব টিসাব করে বলিনি। কেমন যেন মনে হোল তাই বলে ফেললাম। তবে একটা কথা মনে রাখিস। এই ফরাসী জাতটাকে একেবারে বিশ্বাস নেই। ব্রিটিশ বা জার্মানদের ওপর তবু ভরসা করা যায়। কিন্তু ফরাসীদের? নৈব নৈব চ। অত্যন্ত ফ্লার্ট হয় এরা। প্রেমে পড়েছ কি মরেছ। তোমাকে নাচিয়ে টাচিয়ে পরে সুড়ুৎ করে কেটে পড়বে একদিন।

হঠাৎ কেমন অসাবধানী হয়ে গেলাম আমি। ফরাসী জাতের প্রতি বিদিশার এই বিদ্বেষের একটা অত্যন্ত দুঃখজনক বাস্তব কারণ আছে জেনেও উষ্মা বোধ করি আমি।

—ফ্লার্ট কোন জাতের মধ্যে নেই বল তো বিদিশা? সব দেশেই ভাল খারাপ আছে। তবে রীতিনীতি আচার ব্যবহারের তারতম্যের জন্য দৃষ্টিভঙ্গীর হেরফের ঘটতেই পারে। সব জিনিষ ঠিকমত বিচার করা সম্ভব

হয় না। ওদের দেশে ছেলেমেয়েদের সহজ সম্পর্কটাও আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেক সময় দৃষ্টিকটু ঠেকে। কিন্তু তাই বলে গোটা জাতটাকে অপবাদ দিতে পারিনা আমরা!

বিদিশা রুষ্ট হয় আমার কথা শুনে।

—তুই কতটা চিনিস ফরাসীদের? আমি নিজে কয় বছর ছিলাম ফ্রান্সে। তোর চেয়ে অনেক কাছে থেকে দেখেছি আমি ফরাসীদের। ওদের উচ্ছ্বাস আছে, আবেগ আছে। কিন্তু গভীরতা নেই এক ফোঁটা। ব্রিটিশদের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু একবার যদি হয় তাহলে তুই মোটামুটি সেই বন্ধুত্বে আস্থা রাখতে পারিস। ফরাসীদের ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। লোকে বলতে লজ্জা নেই। সবই তো শুনেছিস তুই। সুব্রতর ছাত্রীটির সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। খুব বড় বড় কথা বলেছিল আগে। অথচ ছাখ কতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করল আমার সঙ্গে। আমি যেদিন বুঝতে পারলাম—

আমি বুঝতে পারছিলাম আমার আবেগের মূলে ছিল সত্য দেখা হওয়া মিশেলের প্রভাব। তা না হলে এসব নিয়ে মাথা ঘামানো আদৌ অভ্যাস নয় আমার। বিশেষ করে আমি যখন জানি বিদিশার জীবনে একটি ফরাসী মেয়ে কতখানি বিপর্যয় ঘটিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ফরাসীদের সম্পর্কে বিদিশার কটূক্তি যেন মিশেলকেও বিঁধছে। মিশেল আমাকে তার উকিল খাড়া করেনি। অল্পক্ষণ আগে পরিচয় হয়েছে আমার তার সঙ্গে। তবু অজ্ঞাত মনস্তাত্বিক কোন কারণে তার দেশের সম্পর্কে বিষোদ্গার ভাল লাগছিলনা আমার। কেবলই মনে হচ্ছিল অবিচার করছে, অন্যায় করছে বিদিশা। ওর মধ্যে থেকে এই জাতিবিদ্বেষ দূর করতে হবে।

আজ যখন সব কিছু বিশ্লেষণ করতে বসি তখন বুঝি এরকম করেই একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় জীবনে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মানুষও অনায়াসে প্রবেশপথ খুঁজে নেয় মনে। হৃদয়ের জংধরা সিংদরজা যখন এভাবে একটি মানুষের জন্য খুলে যায় তখন অনেক বাধা, অনেক অভ্যাস অনেক রীতিনীতিও বদলে যায় তার অভ্যর্থনার জন্য।

বিদিশার কষ্টটা দগ্‌দগে ঘায়ের মত অস্বস্তি আনছিল মনে। আমি আমার সাধ্যমত প্রলেপ দিতে চেষ্টা করছিলাম।

—বিশ্বাসঘাতকতা কি শুধু ওদের দেশেই আছে? আমাদের দেশে নেই? বিদিশা তোর স্বামীর সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু ব্যাপারটা তো একতরফা হতে পারে না। মেয়েটিকেই কেবল দোষারোপ করছি আমরা। আসল ঘটনা—

বিদিশা উত্তেজিত হয়েছিল।

—আসল ঘটনা তুই জানিসনা আমি জানি। কিন্তু সেসব নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। এমন সব 'লো-কাট্' পোষাক পরত যে কি বলব? অর্ধেক বুক খোলা থাকত। দিনের পর দিন ওসব দেখে পুরুষ মানুষের মাথা ঠিক থাকতে পারে কখনও? পুরুষকে উত্তেজিত করার সব রকম ফন্দী ফিকির জানে ওরা।

—ছ্যাখ বিদিশা ঘটনাটা এমন মর্মান্তিক যে সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করতেও খারাপ লাগছে। তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার—তোর স্বামী এখানে জড়িত। সত্যি কথাটা শুনতেও ভাল লাগবেনা তোর। কিন্তু কোন মেয়ের আধখোলা বুক দেখে যে পুরুষের মতিভ্রম হয়—হিতাহিত বোধ লোপ পেয়ে যায় তার দোষটা কম কোথায় বুঝতে পারছি না।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম কথাটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে বিদিশার। আমার নিজেরও কি কম খারাপ লাগছিল? কিন্তু সেদিন যে কী ভূতে পেয়েছিল আমায় আমি নিজেও যেন বুঝে উঠতে পারছিলামনা। সমস্ত ফরাসী জাতের মানমর্যাদার প্রশ্নটাই কি করে যেন বড় হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। ন্যায়-অন্যায়, বিচার-অবিচারের থেকেও বড় হয়ে উঠেছিল এই কথাটা যে বিদিশা খালি ফরাসীদের দোষ দেখছে। আমার যুক্তি অকাট্য দেখে অন্য সুরে কথা বলেছিল বিদিশা।

—তুই জানিসনা ওদের। সেক্স জিনিসটা সবচেয়ে বড় জিনিষ ওদের কাছে। তার জন্য অনেক কিছু জলাঞ্জলি দিতে পারে ওরা।

—সেরকম লোক কি শুধু ওদের মধ্যেই আছে? অন্য দেশে নেই? ওটা তো এক ধরনের মানসিকতার প্রশ্ন। তাছাড়া হেনরিয়েটার কথা মনে করে দেখ। মাইকেলের সঙ্গে সারাটা জীবন কত দুঃখ কষ্টে কেটেছে। তবু মাইকেলকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবেনি। হেনরিয়েটার মত অতখানি আত্মত্যাগের পরও স্বামীকে ওরকম ভালবাসতে তাকে সাহায্য করতে কতজন পারত বল? অথচ হেনরিয়েটা তো ফরাসী মেয়ে।

—কি হেনরিয়েটা হেনরিয়েটা করছিস তখন থেকে? তুই যে ফরাসী শিখেছিস তা বোঝার উপায় নেই। উচ্চারণটা জানিসনা তুই?

হঠাৎ একেবারে ভিন্ন সুরে আমাকে আক্রমণ করেছিল বিদিশা। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝিনি। অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম ওকে।

—কেন হেনরিয়েটাই তো মধুসূদনের স্ত্রীর নাম ছিল?

—হেনরিয়েটা নয়—আঁরিয়েত!

আমার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হইনি আমি। বরং বিদিশার এই প্রয়াসের মধ্যে তার মনটাকে স্পষ্ট ছবির মত দেখেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম ভেতরে ভেতরে ভীষণ দুর্বল বোধ করছে বিদিশা। যুক্তির পথ ছেড়ে তর্কের পথ ছেড়ে তাই এই পথে নেমেছে সে। ওকে আমার এত কষ্ট দেওয়ার অধিকার নেই।

বিদিশার হাত চেপে ধরে ভুল স্বীকার করেছিলাম।

—সত্যি আমার মনে থাকে না রে! আসলে আমার ফরাসী বিদ্যের দৌড় তো তুই জানিস!

॥ তিন ॥

মনে পড়ে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি তখন। আমার এত বছরের নিরুচ্চার জীবনে দুর্বার স্রোতের মত ধেয়ে এল এক তীব্র নেশা। ফরাসী ভাষা তো বটেই! তার সঙ্গে ইংরাজীও ভাল করে মক্স করতে সুরু করলাম। মিশেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার অনেক আগেই। অবচেতন মনের গুহাকন্দরে নিভৃত সংগোপনে পোষিত কোন আশা থেকে না দুর্লভ কোন স্বতঃলব্ধ পূর্বাভাস থেকে আমার সেই প্রচেষ্টা প্রেরণা পেয়েছিল বলতে পারিনা। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে আমি তার ব্যাখ্যা আজও খুঁজে পাই না।

প্রতিযোগিতার যে নেশা আমার কাছে এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল তা যে এমন তীব্রভাবে আমাকে পেয়ে বসবে তা আমি আগে কোনদিন ভাবতেই পারিনি। আমার পরিশ্রম করার ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গেল হঠাৎ। চাকরি বা আনুষঙ্গিক কাজের শেষে উদ্বৃত্ত যে সময় থাকত তার অনেকটাই ব্যয় করতাম ফরাসী ভাষা শেখার জন্য। বাবা-মা বিরক্ত হতেন। ঘরের দিক থেকে কোন অসুবিধা ছিল না। দিদির বিয়ের পর

আমাদের যৌথ ঘর পুরোপুরি আমার অধিকারে এসেছিল বহু আগেই কাজেই রাত জেগে পড়াশোনা করার দরুন কারুর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটতনা তবু রাগারাগি করতেন মা। পাশের ঘর থেকে ধমক দিতেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হোত মাঝে মাঝে। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতেন মা। ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দেখতাম শঙ্কিত চোখে দাঁড়িয়ে আছেন মা সামনে।

—ব্যাপার কি তোর? সাড়াশব্দ নেই? এত বেলা পর্যন্ত যে ঘুমোয় আমাকে বল দেখি? বাড়িতে সবাই উঠে পড়েছে! দাদার পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। আর তুই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস? আমি তো ভাবলাম কিছু অঘটন ঘটলো নাকি?

—অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি তো! সকালের দিকে ঘুমটা তাই জোর হয়ে গেছে।

মায়ের বিরক্তি কমেনি।

—কে তোকে রাত জেগে পড়াশোনা করতে বলেছে? বিদিশা তোর মাথায় কি ভূত যে চাপিয়েছে তা তুই-ই জানিস। ওর কথা আলাদা। ওর একটা অবলম্বনের দরকার। ওই সব নিয়ে ও যদি সময় কাটিয়ে দেয় তাহলে সেটা ওর পক্ষে একরকম মঙ্গলই হবে। কিন্তু তুই তা বলে সব সময়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে নাচবি কেন? একেই তো বিয়ে দিতে পাচ্ছি না একটা সম্বন্ধও লাগছে না। বয়স হয়ে যাচ্ছে। চেহারার যা ছিরি হচ্ছে দিন দিন। তারপর এরকম সব ভূত মাথায় চাপলে হাড়ের ওপর ডুগডুগি বাজানোর মত চেহারা হবে। বাবুও যে কেন ছেড়ে দিয়েছেন তোকে!

মাঝে মাঝে জ্যাঠাইমা এসেও যোগ দিতেন।

—ওসব ভালো লাগে তোর মীনা? অনেক পড়াশোনা করেছিস। চাকরি করছিস তার ওপর। আর কি করতে চাস? এখন দেখ যদি ভাল একটা সম্বন্ধ টম্বন্ধ পাস!

আমি হেসে উত্তর দিয়েছি।

—আরও অনেক কিছু করতে চাই জ্যাঠাইমা। অনেক কিছু। সব তোমাদের বলব না। আর সম্বন্ধের কথা আমাকে বলছ কেন? নিজের জন্য কেউ কোনদিন সম্বন্ধ দেখে নাকি আবার? ওটা তো তোমাদের কাজ। তোমরা যদি ভাল সম্বন্ধ না আনতে পার তাহলে সে দোষ কি

আমার ?

চার বছর ধরে আমি যে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা চালিয়ে যেতে পারব তা ভাবিনি প্রথমে। বাড়িতে অনাগ্রহ, আপত্তি ছিল। তার সঙ্গে নিয়ম করে চলছিল সম্বন্ধ দেখা। বরাবরের মত নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছি সেইসব বিরক্তিকর প্রথা। কিন্তু মিশেলের সঙ্গে পরিচয়ের মাস ছয়েক পর থেকেই আমার ভেতরের পরিবর্তনটা ধরা পড়লো আমার কাছে। মেয়ে দেখাটা যে একটা কুপ্রথা তা যেন মর্মে মর্মে বুঝলাম। আপত্তি জানালে লাভ হবে না জানতাম। তাই রেগে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করিনি। আর পুরোপুরি নিজেকে বুঝতেও সময় লেগেছিল বৈকি! পরে বুঝেছি আকর্ষণ সুরু হয়েছিল সেই প্রথম দিনটি থেকে। অতঃপর তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল নানা ভাবে।

সেই আকর্ষণ প্রথম থেকেই ছিল পারস্পরিক। আমি বুঝতে পারতাম আমাকে একটু বিশেষ চোখে দেখছে মিশেল। তবুও সংশয় কাটাতে পারতাম না। সে সংশয় যতটুকু ছিল মিশেলকে নিয়ে ঠিক ততটুকু ছিল নিজেকে নিয়েও। উপন্যাসে পড়া প্রেমের ধারণা নিয়ে বাস্তবে তৎসম্পর্কিত অনেক কিছুই অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। মিশেল পর্বের প্রথম পর্যায়ে আমার দিনরাত্রি অতিবাহিত হয়েছে সংশয়, অভিমান, ক্ষোভ, হতাশা আর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে। টালমাটাল সেই সব দিনেও ফরাসী ভাষার প্রতি আগ্রহ আমার কমেনি। মিশেলকে কেন্দ্র করে আমার আকর্ষণের পরিধি দিনে দিনে প্রসারিত হয়েছিল ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি। আমি যে ফরাসী ভাষা এখন সাধারণ ভারতীয়ের তুলনায় অনেক ভাল জানি তা সম্ভব হয়েছে সেকারণেই।

মিশেলও কম সাহায্য করেনি সে ব্যাপারে। এমনিতে সে ছিল মিতভাষী গম্ভীর প্রকৃতির। সচরাচর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গল্প করতে, হৈ চৈ করতে দেখা যেতনা তাকে অন্য শিক্ষকদের মত। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী ছিল সে। বিদিশাও লক্ষ্য করেছিল সেটা। আমার মনে আছে মিশেলের সঙ্গে পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনের কথা।

স্কুল থেকে একটু আগে ছুটি নিয়ে এসেছিলাম। বিদিশাই টেলিফোন করে বলেছিল আগে আসতে। লাইব্রেরিতে কি একটা দরকার ছিল ওর।

ওর 'বস্' ওকে কোন একটা ফরাসী ম্যাগাজিন থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে সেটা অনুবাদ করিয়ে নিতে বলেছিল। আমার হাতের লেখা ভাল বলে আমাকেই সেটা লিখতে বলেছিল বিদিশা।

অন্য একটা ম্যাগাজিন নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছিল ও নিজে। ক্লাস সুরু হতে মিনিট দশেক যখন বাকি তখন আমি লেখা থামালাম। গোটা গোটা অক্ষরে যত্ন করে লিখছিলাম এতক্ষণ। হাত টনটন করছিল আমার। স্কুলের খাতা দেখতে হয়েছিল অনেকগুলো। আমার কষ্ট হচ্ছে দেখে বিদিশা আর জোর করল না।

—ঠিক আছে। বাকিটুকু পরশু একটু আগে এসে লিখে দিস। কিন্তু কাকে দিয়ে অনুবাদ করাই বল ত? যদি এই কাজটা ঠিকমত করাতে পারি তাহলে বস্ খুশি হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখ পড়ল মিশেল ঢুকছে লাইব্রেরিতে। কোন কিছু না ভেবেই ঝট করে বুদ্ধি দিলাম।

—মঁসিয়োকে বলে দেখনা। হয়ত রাজী হয়ে যাবেন।

আমাদের টেবিলের সামনে বইয়ের আলমারীর দিকে এগিয়ে আসছিল মিশেল। সাদা স্যুটে ছিপছিপে চেহারার মিশেলকে অপূর্ব রূপবান দেখাচ্ছিল। আগের দিনের মত সেদিনও আমাকে সেই এক নেশা পেয়ে বসল। বিদিশার কথা বিস্মৃত হয়ে অপলকে চেয়ে দেখছিলাম তাকে। পরে আমাকে তা নিয়ে কথা শুনিয়েছিল বিদিশা।

—অত হাঁ করে দেখছিলি কেন মঁসিয়োকে? এদেশে কি সুন্দর চেহারার ছেলে নেই?

কিন্তু আমার সেই ভয়ঙ্কর নেশার মত্ততায় বিদিশার উপস্থিতি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। এখন সে কথা মনে করলে অবাক হয়ে যাই। সেদিন বিদিশার প্রশ্নের লাগসই জবাব মুখে আসেনি। এখন তার জবাব খুঁজে পাই আমি। মনে হয় রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতনের খোঁজ করছিল আমার চোখ ডুবুরীর মত। রূপের জন্য মত্ততা ছিল না সেটা। তার বিষাদ-মিশ্রিত গাম্ভীর্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করত। আমি যখন তাকে দেখতাম তখন তার নাক, চোখ, মুখের ডৌল লক্ষ্য করতাম না। বিষণ্ণতার যে গভীরে তার যাওয়া-আসা ছিল সেই গভীরের যতটুকু আভাস ধরা পড়ত তার চোখের অতল দৃষ্টিতে সেটাই

দেখতাম যেন আনমনা হয়ে। সেই গভীরের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছা করত। ইতঃপূর্বে তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি। বিদিশার রসিকতার জবাব খুঁজে পেতাম না তাই।

বেশ মনে পড়ে মিশেলই প্রথম সম্ভাষণ করেছিল। আমার মুখোমুখি উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছিল বিদিশা। ওকে বোধহয় লক্ষ্য করেনি মিশেল। আমার পাশে দাঁড়িয়ে শুভসন্ধ্যা জানাল ও আমাকে। নিছক ভদ্রতাসর্বস্ব মনে হয়নি ওর সেই সম্ভাষণ। আন্তরিক কোন অনুভূতি যেন ব্যক্ত হচ্ছিল তার ভঙ্গীতে, তার কণ্ঠস্বরে।

অনুবাদটা যদি করিয়ে নিতে হয় তাহলে তার জন্য অনুরোধ জানানোর সুযোগ হারাতে চাইলাম না আমি। বিদিশার কাছে বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করি আমার সেই ইচ্ছা।

—বিদিশা বলে দেখ না একবার। যদি কাজ হয়। ফরাসীতে বলা আমার পোষাবে না। ভদ্রলোক কিছুই বুঝবেন না।

আমার বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল মিশেলের। অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল ও আমাকে আর বিদিশাকে। তবে ও যে অনুমান করতে পারছিল আমাদের কিছু বলার আছে তা ওর ভাবভঙ্গীতে বোঝা যাচ্ছিল। আমার প্রস্তাবে অসম্মত হলো না বিদিশা। থেমে থেমে দ্বিধাগ্রস্তের মত জানাল ও ওর অনুরোধ ফরাসীতে।

—মঁসিয়ো সি ভ্যু পুরিয়ে মেইদে আ ট্রাডুইর ক্যাল্‌ক শো-জ।

—আভেক্ প্লেজির মাদাম ·····মঁত্রে মোয়া···

আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল মিশেল। গভীর অভিনিবেশ সহকারে ও যখন সেটা দেখছিল তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল নিজের অক্ষমতার জন্য। সেই সঙ্গে সূচিসূক্ষ্ম এক আনন্দও সঞ্চারিত হচ্ছিল মনে। বুঝতে পারছিলাম তার উৎস হচ্ছে মিশেলের সান্নিধ্য।

একটু পরেই উঠে দাঁড়াল মিশেল কাগজপত্রগুলো হাতে নিয়ে। পালা করে আমার আর বিদিশার দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসে।

—ন ভ্যাজাকিয়েতে পা। জো লো ট্রাডুইরে প্যুর ভ্যু।

এই কয় বছরে ফরাসী ভাষাটা আয়ত্ত হয়েছে আমার। স্মৃতিচারণ করতে বসে মিশেলের কথাগুলো তুলে ধরতে পারছি। কিন্তু তখন সেসব বোঝার সাধ্যও ছিল না আমার। একটু পরেই সুরু হওয়ার কথা আমাদের

ক্লাস। মিশেল চলে যেতে আস্তে করে বিদিশাকে প্রশ্ন করেছিলাম।

—কি বললেন রে তোকে মঁসিয়ো?

বাংলায় তর্জমা করে বোঝাল আমায় বিদিশা। কয় বছর ফ্রান্সে থেকে অনেক উন্নতি হয়েছিল ওর। আমাদের থেকে অনেক ভাল বুঝতে পারত ও ভাষাটা। প্রচেষ্টা সফল হওয়ার আনন্দে আমার কাছে নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিল।

—তোর জন্যই কাজটা হচ্ছে রে মীনাক্ষী। তুই সঙ্গে না থাকলে ভরসা পেতাম না বলতে।

—আমি ইচ্ছা করেই স্বীকার করিনি।

—তা কেন? তোর থেকে আমার সঙ্গে কি ওঁর বেশি দিনের পরিচয়? বরং ঠিকমত বিচার করলে তোর সঙ্গে ওঁর পরিচয় একদিন আগেই হয়েছে। প্রথম দিন ক্লাসে আসিনি আমি।

—আরে, এটা হচ্ছে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। পরিচয়ের দীর্ঘতা দিয়ে এসব মাপা যায় না। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে তোকে খুব পছন্দ করছেন মঁসিয়ো।

—নিছক মনগড়া ধারণা যতসব। কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যাবে না!

ইচ্ছা করেই তর্ক করেছিলাম। খুব একটা মধুর লাগছিল না সেই আলোচনা। বুকের গভীরে কেমন একটা অজানা আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠেছিল। আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সংস্কার প্রচলিত আছে। শিব নাকি যখন তখন 'তথাস্তু' কথাটা উচ্চারণ করেন। এরকম কোন মুহূর্তে 'তথাস্তু' বলে ফেললেই মুস্কিল। ঘটনাটা সত্যি হয়ে যাবে। আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রান্তিক সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি। সেখান থেকে সিদ্ধান্তের চূড়ায় ওঠা বড়ই বিপজ্জনক। আরোহণের বিকল্প যেখানে গভীর খাদ।

চার বছর আগে আমাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে খুব বেশি দূরে যাবার সাহস ছিল না আমার! ভিনদেশী ভিনধর্মী এক যুবকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেও সেটা নিজের কাছেই প্রকাশ করতে পারিনি তখন। আজ পিছনে তাকিয়ে সব কিছু বিশ্লেষণ করতে গেলে মনে হয় যুক্তির চেয়েও গভীর শক্তিশালী যে অন্তর্দৃষ্টি তারই প্রভাবে কি ধরা পড়েছিল ভবিষ্যতের এই ছবিটি? তা না হলে এত আলোড়ন-বিলোড়নের ঢেউ উঠেছিল কেন সেদিন?

দ্বিতীয় দিনের ক্লাসে মিশেল যেন আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল আমার কাছে। তার দৃষ্টি যেন আরও গভীর তৃষ্ণা নিয়ে বিমগ্নতার বাধা পেরিয়ে বিচরণ করতে চাইছিল আমার চোখে। পড়াতে পড়াতে যখনই তার দৃষ্টি ঘুরে ফিরে আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হচ্ছিল তখনই তার উজ্জ্বল বাদামী চোখের খরদাহ মেদুর এক মমতার ছোঁয়ায় সিক্ত হয়ে উঠছিল। পরিচিত পরিমণ্ডলের ভাষায় যাকে আলাপের পরিধি বলে তা তৈরি হয়েছিল অনেক পরে। দিনের পর দিন নানা ঘটনাপ্রবাহের সম্মিলিত ধারা এসে সৃষ্টি করেছিল অন্তরঙ্গতার এক বিশাল প্রবহমান সমুদ্র।

অনেক ঘটনা হারিয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে। আবার অনেক ঘটনা অনেক দৃশ্যের স্মৃতি সমান ঔজ্জ্বল্যে জ্বলজ্বল করছে আজও। তবু মিশেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার প্রথম পর্যায় সোনালী নৈঃশব্দের পটভূমিকায় অনেক বেশি সোচ্চার. বর্ণময় আর অর্থময়। ছবির মত মনে পড়ে যায় সেইসব দিনে মিশেলের দৃষ্টি, তার চলাফেরার ভঙ্গী, তার সস্মিত রমণীয় হাসি।

দ্বিতীয় দিনের একটি ঘটনা মনে পড়লে এখনও অস্বস্তি হয়। স্কুলের জন্য বড় একটা ব্যাগ ব্যবহার করতাম আমি। তার মধ্যে দরকারী জিনিষের সঙ্গে অদরকারী টুকিটাকি এটাসেটা অনেক কিছু থাকত। প্রয়োজনের মুহূর্তে আসল জিনিষটা খুঁজে বার করা মুস্কিল হতো তার জন্য। সেদিন ক্লাসে এসে ব্যাগ খুলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ফরাসী ভাষার জন্য নির্দিষ্ট খাতাটা পাচ্ছিলাম না। ওটা খুঁজতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে মিশেল যে আমাকে লক্ষ্য করছে সকৌতুকে তা টের পাইনি।

আমার ব্যাগে হাজার রকম খাতাপত্র বইয়ের মাঝখানে লোপাট হয়ে গিয়েছিল কিভাবে সেই খাতাটা। মিশেল পড়াতে সুরু করে দিয়েছিল। আমি তবু সেদিকে মনোনিবেশ করতে পারছিলাম না। রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়া খাতার চিন্তাটা একেবারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল আমায়। কয়েক মিনিট ধরে সারা ব্যাগ ওলোটপালোট করেও যখন খাতাটার হদিশ মিলল না তখন নিরুপায় হয়ে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হোল আমায়। খোঁজার চেষ্টা ত্যাগ করে ব্যাগ বন্ধ করে দিলাম। আর তখনই চোখ পড়ল আমার মিশেলের দিকে। সকৌতুকে লক্ষ্য করছে সে সবকিছু।

মুখে আমায় কিছুই বলেনি সে। কিন্তু তার সেই দৃষ্টি তার অনেক

নৈকট্যে এনে ছিল আমায়। আমার প্রতি তার মনোভাব দিনে দিনে যে নিবিড় মমত্ববোধের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে তার জন্মমুহূর্ত বলা যায় সেটি। তার সেই কৌতুকভরা নিবিড় অপলক চাহনি তার সঙ্গে আমার এক নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত করল।

আমার মনে হোল একদিন আগে যার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তার চোখে এ দৃষ্টির অর্থ একটাই হয়। শিক্ষকের উচ্চাসনে বসে ছাত্রীর দিকে তাকিয়ে নেই সে। রক্তের সম্পর্কের বাইরে মানবসম্পর্ক প্রসারের মূলে কোন অমোঘ নিয়ম বা নির্দেশ কাজ করে জানি না। কিন্তু প্রথম যে কথাটা মনে হয়েছিল সেই কথাটাই প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আমার অন্তরাত্মার গভীরে। কিছু একটা ওলোট-পালোট ঘটাতে চাইছে মিশেল আমার জীবনে। আর আমার যুক্তির কাছে সংস্কারের কাছে তা যতই অনভিপ্রেত হোক না কেন আমি তার অনুরণন থামাতে পারছিনা কোন মতেই।

সেদিন সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম আমি ক্লাসে। ভাগ্যিস মিশেল আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। করলে আমার অন্যমনস্কতা কিংবা অক্ষমতা ধরা পড়তো ক্লাসের সকলের কাছেই।

ক্লাসের শেষে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম আমি আর বিদিশা। হঠাৎ পেছনে মিশেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে চমকে গিয়েছিলাম আমরা দুজনেই।

—এস্ ক্যো ভুজাভে রোট্রুভে সো ক্যো ভুজাভে পেরদ্যু ?

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল বিদিশা। প্রশ্নের কারণ খুঁজে পাচ্ছিলনা ও। আমি আন্দাজে ধরে নিলাম মিশেলের জিজ্ঞাস্য। সেদিন ফরাসী ভাষায় পুরো জবাব দিতে পারিনি। জবাবে শুধু মাথা নেড়ে বলেছিলাম—'নঁ'।

এসব কথা যখন মনে পড়ে তখন বুঝি মিশেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরির পিছনে এই সব কিছুর অবদান বড় কম নয়। ছোট ছোট ঘটনা সাজিয়ে আমার আর তার সম্পর্কের ইমারত তৈরি করছিল এক অভিজ্ঞ কুশলী রাজমিস্ত্রী। মুহূর্তে মুহূর্তে দিনে দিনে রঙে প্রলেপে সাজানো রংদার করে তুলছিল সে সেটিকে।

আজ আর সেইসব ঘটনার কথা হুবহু মনে নেই। তাই মনে হয় চার

বছর ধরে যদি ডায়েরি লেখার মত করে লিখে রাখতাম সেইসব দিনের কথা তাহলে অনেক সুবিধা হতো। খুঁজে পেতে বার করে আনার প্রয়াস চালাতে হোত না। কিন্তু উত্তাল অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চলেছি তখন আমি। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, আনন্দ, হর্ষ আর বিষাদের সংমিশ্রণে ফুলে ফেঁপে ওঠা আমার জীবন পুরনো পরিধির কাঠামোয় আবদ্ধ থাকতে পারছেনা। দুকূলব্যাপী স্রোতের তোড়ে ভেসে চলেছি আমি। ডায়েরি লেখার মতো মানসিক স্থৈর্যের অবকাশ তখন কোথায় ?

॥ চার ॥

মিশেলের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারটা সুরু হয়েছিল আরও অনেক পরে। পরিচয়ের প্রথম পর্বে অনেক দিন ধরে শুধু ছোটখাট কিছু ঘটনা, টুকরো টুকরো কিছু কথাবার্তার মধ্যে সীমিত ছিল আমাদের অনুভূতি।

মিশেলের অনুভূতির উত্থানপতন কিংবা ঘাতপ্রতিঘাতের পুরো ছবি আমার কাছে দৃশ্যমান হবার কথা নয়। সে চেষ্টা আমি করবনা তাই। কিন্তু নিজের মনটাকে যখন মেলে ধরি তখন অবাক্ হয়ে দেখি সেইসব ঘটনা কথা বা দৃষ্টিক্ষেপই দিনে দিনে রংদার বুটিময় করে তুলছিল আমার মনটাকে। আমার অজান্তেই আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল তার চিন্তা।

আমার মনে আছে অনেক সময়ে জোর করে সরাতে চেয়েছি তার চিন্তা। সাময়িকভাবে হয়ত তা সম্ভব হয়েছে। শেষ পর্যন্ত উদাসীন থাকতে পারিনি। ঝড়ের তাণ্ডবের মুখে উৎপাটিত বটবৃক্ষের মত অসহায়-ভাবে ভূলুণ্ঠিত হতে হয়েছে আমাকে।

উপন্যাস পড়ে, সিনেমা দেখে কিংবা পরিচিত মহলে আলাপ আলোচনা শুনে প্রেমের যে চিত্রকল্প তৈরি হয়েছিল মনে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইতাম নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা।

মধ্যবিত্ত পরিবারে বাধানিষেধের মধ্যে প্রেম সম্পর্কে একটা রোম্যান্টিক অনুভূতি গড়ে ওঠে। আমাদের পরিবারে সেই প্রেম প্রশ্রয় পাবেনা জেনেও জীবন থেকে তাকে পুরোপুরি বিতাড়িত করতে সায় দেয়নি আমার মন। বড়দা বা দিদির ক্ষেত্রে সেই প্রেমের দুঃখময় পরিণতি দেখেও তার সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা অপসারিত হয়নি আমার মন থেকে।

বয়ঃসন্ধিকালে প্রেমকে কেন্দ্র করে কল্পনাবিলাসের খেলা খেলেছি। মিশেলের আগে যে সব পুরুষদের পছন্দ হয়েছিল তাদের কারুর সঙ্গেই যে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তার মুখ্য কারণ পারিবারিক সংস্কার গোঁড়ামি ইত্যাদি হলেও তার মূল কারণটি প্রোথিত ছিল আমার নিজের মনের গভীরেই। আজ মিশেলের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বনিয়াদ বিশ্লেষণ করে একথা যত সহজে বুঝতে পেরেছি আগে তত সহজে বুঝিনি!

তখন কোন পুরুষকে ভাল লাগলে মনে হোত তাকে কেন্দ্র করেই আবির্ভূত হচ্ছে প্রেম। পরে জীবনের বহতা স্রোতের মুখে একে একে তারা যখন খড়কুটোর মত ভেসে গেছে কোথায় তখন বুঝেছি তাদের কেন্দ্র করে যে অনুভূতি তৈরি হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী পলকা এক আবেগ। এক ঝলক বাতাসের মত উদয় হয়ে পলকের মধ্যে মিলিয়ে যেত তা কোন মহাশূন্যে।

ঘুরে ফিরে সেই এক চিন্তার গোলকধাঁধায় জড়িয়ে ফেলতাম নিজেকে। প্রেমের সংজ্ঞা কি? তার আসল স্বরূপ কি? আমার জীবনে কি উদ্ভাসিত হবেনা তা কোনদিন?

যখন ভেবেছি সেই পরম ঈপ্সিত অভিজ্ঞতা অধরা রয়ে যাবে আমার তখন তীব্র রোষে ফুলে উঠেছি। কখনও কখনও ভেবেছি কোন মূল্যের বিনিময়ে তা পাওয়া যাবে জানলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম। সার্থকতার সোপান ধরে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারত আমার জীবনের মূলকাণ্ডটি।

কিন্তু বারবার হতাশ হয়ে অবশেষে সমঝোতা করে নিয়েছি। ভেবেছি সকলের জীবন এক ছন্দে ছন্দিত হয়না। কল্পনার আকাশকুসুম বাস্তবের জলহাওয়ায় প্রস্ফুটিত হতে চায়না বলেই হয়ত তার জন্য অত ছটফটানি থাকে মানুষের।

মিশেলকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিন বুকের গভীরে এক ধাক্কা লেগেছিল ঠিকই। কিন্তু তার জের এভাবে চলবে বলে আদৌ অনুমান করতে পারিনি। যেদিন বুঝলাম সেদিন অনেক মূল্যে প্রবল নিশ্চিত-ভাবেই সেটা বুঝলাম।

দেখলাম প্রকৃত অর্থে যখন প্রেম আসে তখন তা সমস্ত সন্দেহ, সংশয় নিশ্চিহ্ন করতে করতে স্থায়ী আসন গাড়ে। কি কেন কোথা থেকে এ

সমস্ত প্রশ্ন চাপা পড়ে যায় উত্তাল অভিজ্ঞতার জোয়ারে। তা নিয়তি-নির্দিষ্ট হোক্ কিংবা কার্য-কারণ সূত্রে উদ্ভূত হোক্ সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না।

আমার ধারণা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হতে পারে। তবু নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রায়ই মনে হয় একটি কথা। সত্যি সত্যি যখন প্রেম আসে তখন তা আশ্চর্য এক শক্তি সঞ্চারিত করে মনে। অনেক বাধা, সংশয় তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়ে যায় তখন।

আমার অনেক ভীরুতা কেটেছে মিশেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার পর। অথচ তার জন্য জবরদস্তির প্রয়োজন হয়নি। স্বতোৎসারিত এক আশ্চর্য শক্তিবলেই যেন সম্ভব হয়েছে সেটি। তা না হলে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় অত বাধা অতিক্রম করেছি কি ভাবে?

প্রথম দিকে অবশ্য বিন্দুবিসর্গও জানত না বাড়ির লোক। সেদিক থেকে তাই অকারণ ঝুটঝামেলা পোহাতে হয়নি আমায়। তবে মনে মনে তা নিয়ে অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তা কি কিছু কম ছিল? ভেবেছিলাম অগতির গতি হবে দিদি। দিদির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম সে কারণেই। কিন্তু দিদির কাছেও প্রশ্রয় পেলাম না। অথচ দিদির বিরুদ্ধতা একরকম অভাবনীয় ছিল আমার কাছে।

ভেবেছিলাম দিদি নিজে যখন বিপ্লবের সূত্রপাত করেছে তখন সেই বিপ্লবের জয়যাত্রায় আমাকে সহযাত্রী হিসাবে পেয়ে খুশিই হবে। আশ্চর্য সব কিছু শুনে অপ্রসন্ন হয়েছিল দিদি। স্পষ্ট ভাষায় মনের বিরক্তি প্রকাশ করেছিল আমার সামনেই।

—তুইও শেষে প্রেম করলি মীনা? বাবা মায়ের কি দুর্ভাগ্য তাই ভাবছি। আমি তো ওদের অনেক জ্বালিয়েছি! অন্ততঃ তুইও যদি ওদের পছন্দমত···

কথাটা শেষ না করেই অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল দিদি।

—আচ্ছা মীনা। তোর জন্য তো সম্বন্ধ দেখা হচ্ছিল?

দিদি যে ওরকম একটি প্রশ্ন করবে তা সম্পূর্ণ অভাবিত ছিল। নিজে অনেক বিদ্রোহ করেছে, অশান্তি করেছে বিয়ের আগে। দিদির ভাষায় বাড়ির লোককে রীতিমত জ্বালিয়েছে। নিজেও কি কম নির্যাতন সহ্য করেছে? মারধর পর্যন্ত বাদ যায়নি!

আমি সব কিছুর সাক্ষী। সেই দিদি যে সমস্যাটার অন্য সব দিক্ বাদ দিয়ে শেষে এরকম একটি দিক নিয়ে পড়বে তা যদি বুঝতাম তাহলে হৃদয়ের ভার কমাতে ছুটে আসতামনা এভাবে।

অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না দিদির সঙ্গে। বাড়ির অমতে সাহস করিনি যোগাযোগ রাখতে। যদিও দিদির শ্বশুরবাড়ি খুব একটা দূরে নয়। হাঁটাপথে মিনিট দশ লাগে মাত্র। মাঝে মধ্যে পথে ঘাটে দেখা হয়েছে দিদি, শঙ্করদা কিংবা দিদির শ্বশুরবাড়ির কারুর সঙ্গে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা হয়েছে। তাও ভয়ে ভয়ে। যদি জ্যাঠামশাই, বাবা কিংবা দাদারা কেউ দেখে ফেলে!

দিদির কাছে শুনেছি দাদা নাকি দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি স্বভাবে ভীরু ঠিকই। কিন্তু দাদার মত নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারিনি কোন-দিন। তাই দুরুদুরু ভয় বুকে চেপে রেখেও দিদির সঙ্গে কথা বলেছি। কুশল প্রশ্ন করেছি।

কিন্তু যেদিন আমার সঙ্গে মিশেলের সম্পর্কের চেহারা আর অস্পষ্ট রইল না আর তাকে কেন্দ্র করে ভীষণ ঝড় ঘনিয়ে আসল বাড়িতে সেদিন মনে হয়েছিল আমার সমস্যা মোকাবিলার জন্য দিদি কিংবা শঙ্করদার সাহায্য আমার প্রয়োজন। তাছাড়া পরিবারের একজনকে অন্ততঃ পাশে পেলে বুকের পাথরভার হালকা হয় একটু।

শঙ্করদাকে নিজের থেকে কিছু বলিনি আমি। জানতাম দিদিই করবে সেটা। কিন্তু দিদির কাছে সবকিছু বলতে গিয়ে ধাক্কাটা খেলাম জোর। ও ভেবে নিল হতাশা বা নৈরাশ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে আমার বিদ্রোহ। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি কিংবা পারিবারিক সংস্কার ভেঙ্গে স্বাধীন প্রেমের মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টাকে ধরে নিল প্রচণ্ড হতাশার দরুন মরীয়া এক ধরণের একরোখামি বলে।

দিদির কথা শুনে বুঝতে দেরি হোলনা যে মিশেলের প্রতি আমার আকর্ষণকে গভীরভাবে তলিয়ে দেখছেনা ও। রোদনভরা ভালবাসার গভীরতা ও উপলব্ধি করতে পারছেনা দেখে দারুণ কষ্টে গুমরে উঠছিল মন। আশা করেছিলাম নিজের অভিজ্ঞতার নিরীখে আমার ব্যাপারটা বুঝে নেবে ও। দিদির প্রশ্ন শুনে তাই তীব্র হতাশার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ আর অভিমানও জমা হয়েছিল।

—আচ্ছা দিদি তুমি নিজে তো প্রেম করে বিয়ে করেছ। তা সত্ত্বেও এমন অদ্ভুত ধারণা হচ্ছে কেন তোমার যে আমার জন্য ঠিকমত পাত্র জোটেনি বলেই এই ঘটনাটা ঘটেছে?

একটু অপ্রস্তুত হয়েছিল দিদি। সেটা ওর ভাবভঙ্গীতেই প্রকাশ পেয়েছিল! কিন্তু তা বলে চুপ করে থাকেনি।

—আমার কথা ছাড় মীনা। অল্প বয়সে তোর শঙ্করদার প্রতি কেমন একটা দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল। ভূতগ্রস্তের মত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কোন ওঝারই সাধ্য ছিল না আমার ঘাড় থেকে সেই ভূত নামায়। কিন্তু তার সঙ্গে তোর তুলনা? তুই ছেলেমানুষ নোস! তাছাড়া স্কুলে পড়াচ্ছিস। বিচার বিবেচনা লোপ পাওয়া কি ঠিক? আর ছেলেটি ভারতীয় হলে তবু একটা কথা ছিল। ফ্রান্স থেকে এসেছে কয়েক বছরের জন্য। ওর সম্পর্কে কতটুকু জানিস তুই? আমি তো ভাবতেই পারছি না আমাদের বাড়ির মেয়ে এরকম একটি ছেলের প্রেমে পড়তে পারে!

দিদির কথা শুনে খুব রাগ হয়েছিল। তবু মুখে তা প্রকাশ করিনি। শান্তভাবে বোঝাতে চেয়েছি সব কিছু।

—কথাটা তুমি বেঠিক বলোনি দিদি। আমার নিজেরও খুব আশ্চর্য লাগে। কি করে যে এসব ঘটলো আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু ওর সম্পর্কে কিছু জানিনা বলে ভাবছ কেন তুমি? ও আমাকে ওর সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়েছে। ওর পরিবারের কথা, ওর ইচ্ছে অনিচ্ছে ওর আগ্রহ অনুরাগ নেশা সব কিছু আমার জানা হয়ে গেছে।

মনে আছে সব কিছু ছেড়ে হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে পড়েছিল দিদি।

—বয়স কত ছেলেটির?

অজান্তে আমার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছিল দিদি। আমি নিজেই নিজের কাছে সহজ হতে পারি না এ ব্যাপারে। প্রথম দর্শনে আমার মনে হয়েছিল মিশেল আমার থেকে অনেকটাই ছোট হবে বয়সে।

ঘনিষ্ঠতার পরে জেনেছি আমার ধারণা ভুল নয়। বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট মিশেল। সেটা জানার পর বেশ কিছুদিন একটা অস্বস্তির ভার চেপে বসেছিল মনে। মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের

এক মেয়ের কাছে একটা বিশাল বাধা বলে মনে হয়েছিল তখন সেটা। মাঝখানে অনেকদিন মিশেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেসব প্রসঙ্গে পরে আসব।

দিদির প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে পারতাম। অনায়াসে বলতে পারতাম মিশেলের বয়স কত জানিনা আমি। কিন্তু আমার প্রেম আমাকে সাহসী করে তুলেছিল। সমস্ত দ্বিধাসংকোচ ঝেড়ে দিদিকে বলেছিলাম আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট মিশেল। শুনে কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল দিদি।

—সে কি? এত ছোট তোর থেকে ও বয়সে?

—তাতে কি? আমাদের দেশে এটা একটু কেমন লাগে। কিন্তু ওদের দেশে এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে। আর তুমিই বলো অত হিসেব করে, অঙ্ক কষে কি প্রেম হয়?

পরে মিশেলের কাছে শোনা কথারই পুনরাবৃত্তি করেছি আত্মপক্ষ সমর্থনে। মিশেল যেভাবে একের পর এক নজীর তুলে আমার মনে ব্যাপারটা সইয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল সেভাবে নজীর তুলে সহজ করে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম ব্যাপারটা দিদির কাছে। পৃথিবীর অন্যতম সুখী দম্পতি হিসাবে ব্রাউনির কবি দম্পতীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম। বলেছিলাম এলিজাবেথের সঙ্গে রবার্ট ব্রাউনিং-এর বয়সের ফারাক দশ বছর হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিবাহিত জীবন অসুখী হয়নি।

শুধু মিশেলের কথারই পুনরাবৃত্তি করিনি সেদিন। নিজেও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে নজীর তুলে দেখিয়েছিলাম যে স্ত্রীকে স্বামীর থেকে বয়সে ছোট হতে হবেই এমন কোন বাধ্যবাধকতা সত্যিই নেই। দাম্পত্য জীবনে সুখলাভের কোন অন্তরায় নয় বয়স বলে ব্যাপারটা।

বলেছিলাম প্রেমের ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট নজীর আছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায়। শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে রাধা বয়সে বড় ছিলেন। তবু সেই প্রেমকে শ্রদ্ধাভরে মেনে নিতে বাধেনি ভারতবর্ষের মানুষের।

সেখানেই ক্ষান্ত হইনি। পরিচিত দু'একজনের উদাহরণ তুলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে বয়স নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করি আমরা। তার স্বপক্ষে অকাট্য কোন যুক্তি হয়ত কাজ করেনা কার্যতঃ।

সেদিন দিদির কাছে ব্যাপারটা যত হালকা করে দেখাতে চেয়েছিলাম

ততটা হালকা করে আমি নিজেও কিন্তু নিজের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না। আমার নিজেরই অনেক সময় লেগেছিল সেটা মেনে নিতে।

তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম সেদিন। দিদিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি নিজেও যেন আমার মনের অনেক জট ছাড়াচ্ছিলাম একটু একটু করে। অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মত। মনের ভার লাঘবের স্বীকৃত একটা পন্থা ছিল সেটা।

শুধু তাই নয়। শীতকালে স্নান করতে গিয়ে শীতের ভীতি কাটাবার জন্য গলা দিয়ে নানারকম আওয়াজ বার করে অনেকে। তাতে নাকি সুফল হয় যথেষ্ট। আমিও যেন অনুরূপভাবে বাছা বাছা নজীর তুলে নিজের ভিতরে সাহস, শক্তি জাগিয়ে তুলছিলাম। দিদির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বোঝাতে চাইছিলাম আমি।

ধৈর্য ধরে শুনেছিল দিদি ঠিকই। কিন্তু ঠিক যেন প্রতীত হয়নি। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ। পরে ছোট্ট করে জানিয়েছিল নিজের প্রতিক্রিয়া।

—তুই সব কিছুতেই ছাড়িয়ে গেছিস আমাকে। একেবারে আরং ছাড়া। প্রতিবাদ করিনি আমি। কথাটা বেঠিক বলেনি দিদি। আমি যা করতে চলেছি তা সর্বতো অর্থে কল্পনাতীত। গতানুগতিক ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে ছুটে চলেছি আমি। দিদির পক্ষেও হঠাৎ সবকিছু হজম করা মুস্কিল। কিন্তু একটুক্ষণ বিরতির পর যে কথাটা বলল দিদি তা এত অপ্রত্যাশিত ছিল যে ভয়ানকভাবে চমকে উঠলাম আমি।

—মীনা তুই ভাল করে ভেবে ছাখ্। এভাবে সব কিছু নস্যাৎ করার ফল কি খুব ভাল হবে বলে মনে করিস? বাড়ির সকলের মনে কষ্ট দিয়ে কত বড় একটা ঝুঁকি নিতে চলেছিস! আমার ভীষণ ভয় করছে।

—হঠাৎ কিছু করছিনা দিদি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। কিন্তু এখন আর অন্যরকম ভাবতে পারছি না। আশ্চর্য তুমি যে এভাবে নিবৃত্ত করতে চাইবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অথচ তুমি নিজে একদিন কতবড় বিদ্রোহ করেছ। বাড়ির সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংস্কারের গণ্ডী ভেঙেছ। আর আমার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছ না। আবার বলছি দিদি। ভারী অদ্ভুত লাগছে।

—আমি কি সেটা বুঝছি না মীনা? কিন্তু আমার মনের ওপর দিয়ে কম ঝড় তো বয়ে গেল না! আমি এখন অনেক বেশি তলিয়ে দেখি বলেই হয়ত আগের মত জোর করে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা ভাবতে পারি না। মা-বাবার কষ্টটা এখন যেন সত্যি সত্যিই বুঝতে পারি।

—তাই যদি হবে তাহলে তুমি এখনও এত গোঁ ধরে আছ কেন? একবার তো পা দিতে পারতে বাড়িতে।

—লাভ হতো না রে! অভ্যর্থনা কেমন জুটতো ভেবে ছাখ? তাড়া খেয়ে ফিরে আসতে হোত। তবে অনেকবার আমি কিন্তু ভেবেছি যে একবার যাব। মাকে বাবাকে জ্যাঠামশাই জ্যাঠিমাকে বলবো 'তোমরা মাপ করে দাও। আমি তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি। আর তার জন্য নিজেও কম কষ্ট পাচ্ছি না। তোমাদের আশীর্বাদ পাইনি বলে অনেক কিছু অপ্রাপ্য রয়ে গেল জীবনে!' কিন্তু কি জানিস শেষ পর্যন্ত সাহস খুঁজে পাইনি। আর তোর শঙ্করদার গোঁ-ও কিছু কম নয়। আমি চাইলেও ও আমায় যেতে দিতনা হয়ত।

—আমি কিছুতেই তোমাকে তোমার আগের তুমির সঙ্গে মেলাতে পারছি না দিদি। এই কয় বছরে এত দুবল হয়ে গেছ তুমি? ভাবছি যে তুমি এত লড়াই করলে, নির্যাতন সহ্য করলে সেই তুমি এমনভাবে বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করছ? এসব কিসের জন্য দিদি? কি পাওনি তুমি? তোমার শ্বশুরবাড়িতে কি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না? নাকি শঙ্করদার সঙ্গে আগের মত বনিবনা হচ্ছে না?

—সেসব কিচ্ছু না। তোর শঙ্করদার এমন কিছু পরিবর্তন হয়নি যে তার জন্য হা হুতাশ করতে হবে আমায়! আর শ্বশুরবাড়ির কারুর বিরুদ্ধেই কোন অভিযোগ খুঁজে পাইনা আমি। কিন্তু তুই তো জানিস দু' দুবার আমার দুটো বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেল পেটে! অথচ ডাক্তাররা কোন দোষ খুঁজে পায়নি তার জন্য।

এতক্ষণে প্রাঞ্জল হয় ব্যাপারটা। এই ঘটনাটা নিয়ে দিদি বা শঙ্করদার দুঃখ আছে জানতাম। কিন্তু সেই ঘটনাকে যে কোন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এভাবে ব্যাখ্যা করবে দিদি তা আমার ধারণাতীত ছিল।

তাছাড়া যে সন্তান ভূমিষ্ঠই হয়নি তার কথা মনে পড়া কখনই সম্ভব নয় আমার পক্ষে। দিদির আফশোষের, দুঃখের, হতাশার কারণ তাই বুঝতে

পারিনি। আমার খুব খারাপ লাগছিল দিদির কাছে বসে থাকতে। দিদির কষ্টটা বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ে সমানে ঠোকরাচ্ছিল আমাকে। তার সঙ্গে সংক্রামক ব্যাধির মত ভয়ের এক অস্বস্তি। মানুষের মনে সংস্কারের প্রভাব এত গভীর যে তা শত সংস্কারেও নিশ্চিহ্ন হয় না। হঠাৎ তা যে কোন উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ করে।

দিদিকে দেখে বার বার সেকথাটাই মনে হচ্ছিল আমার। আরও মনে হচ্ছিল দিদির ভয় আর আশঙ্কার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতেই হবে আমাকে। না হলে আমার সঙ্কল্পও বুঝি দুর্বল হয়ে পড়বে। সাহস চাইতে এসেছিলাম আমি দিদির কাছে। শক্তি, দৃঢ়তা, ঋজুতা। পরিবর্তে নিয়ে গিয়েছিলাম ক্লান্তি, হতাশা আর অবসাদ।

ভবিষ্যতের একটা ছবি মনশ্চক্ষে বারবার উঁকি দিচ্ছিল। ধূ ধূ করা মরুভূমি জ্বলছে সামনে। গাছপালাহীন রুক্ষ ধূসর পথের শেষ নেই যেন। তবু লক্ষ্য আমার মরুদ্যানের দিকে। সমস্ত স্নিগ্ধতার সম্ভার নিয়ে মিশেল রয়েছে সেখানে। সব বাধা পেরিয়ে পৌঁছে যেতে হবে সেখানে যেমন করে সম্ভব। চকিতে দ্রুত ভয়ের শিরশিরানি টের পেয়েছিলাম। ওয়েসিসের স্বপ্ন মরীচিকার মত মিথ্যা হয়ে মিলিয়ে যাবে না ত?

আমার মনে আছে যত ভয়ই পাইনা কেন—সেই ভয় আমার মনে জেদের জোরও এনে দিয়েছিল যেন। অন্যের কাছে মিশেলকে তুলে ধরতে গিয়ে নিজের কাছেই তাকে তুলে ধরলাম যেন ভাল করে। ভীরুতার বিপজ্জনক শেষ ধাপ পেরিয়ে আশ্চর্য কোন মনস্তাত্ত্বিক নিয়মে পৌঁছে গিয়েছিলাম মনোহর এক চাতালে। ভয়, ভীরুতা সঙ্কোচের কোন মালিন্য নেই সেখানে।।

মিশেলের কথা বলতে গিয়ে পূর্বপর ক্রম বজায় রাখতে পারছি না আমি। স্মৃতি বড় পিচ্ছিল প্রক্রিয়া। পূর্বপর ধাপ মেনে এগিয়ে যাওয়া প্রায়শই সম্ভব হয় না। পা হড়কে অনেক নীচে পড়ে গিয়েও প্রয়োজনে আবার ফিরে আসতে হয় নীচের থেকে অনেক উপরে কিংবা পরের থেকে পূর্বে।

দিদির সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমি অনেক পরে। তার আগে অনেক উত্থান পতনের পালা শেষ করেছিলাম। সেইসব অনেক দৃশ্য, অনেক ঘটনা হঠাৎ বন্যার মত তোড়ে ধেয়ে আসছে আমার স্মৃতিতে। সুশৃঙ্খল, সুষম

বিন্যাসে সুসংহত করতে পারছিনা তাদের। কিন্তু মূককে বাচাল করেন যিনি, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘনে উৎসাহিত করেন যিনি সেই অদৃষ্ট দেবতার খেয়ালে নিজের আটপৌরে জীবনের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত ঢুকে পড়া এক চমকপ্রদ অধ্যায়ের দ্বারোদঘাটন করে চলেছি আমি নিজের মনে। অপার বিস্ময় নিয়ে বিচরণ করছি আলোকিত কক্ষে, নতুন মত্ততা নিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছি চেনা সেই গবাক্ষের কাছে। পুরনো চেনা কত ঘটনা বা দৃশ্য নতুন আবিষ্কারের নেশায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে মহার্ঘ, দুর্মূল্য সম্পদে।

॥ পাঁচ ॥

মিশেলের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে ঘনিষ্ঠতার পর যেমন অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তেমন অনেক সমস্যার সমাধানও সম্ভব হয়েছে। যা ছিল অস্ফুট, যা আমার বিনিদ্র রাতের চিন্তা গ্রাস করত তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক রহস্য বা রোমাঞ্চেরও যবনিকা ঘটেছে। ব্যবহারিক বোঝাপড়া সুরু হওয়ার সেই পর্বে মানসিক দ্বিধা দোদুল্যমান অস্থিরতা দূর হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়েছিল রহস্যময় মধুরতা, নির্ভার উদ্বেলিত অনেক আনন্দ।

প্রকৃত অর্থে মিশেলের আগে অপর কোন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি আমার। পরিণত বয়সেও ধরে রেখেছিলাম তাই কৈশোরের চেতনা। কিছু বোঝা, না-বোঝা থরোথরো সেই অনুভূতির অধ্যায় এখনও আমার কাছে এক পবিত্র সম্পদ। স্মৃতিচারণের ভেলায় ভেসে বেড়াতে ইচ্ছা করে অপার্থিব রমণীয় সেই কালের দরিয়ায়।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি নিজস্ব ধারণা আছে। আলাপে, স্পর্শে যে নৈকট্য তৈরি হয় তার মধ্যে একটা প্রখরতা থাকে, স্পষ্টতা থাকে। কিন্তু তার পূর্ববর্তী পর্যায়ে যে আবেশ, যে রুদ্ধশ্বাস আবেগের অস্থিরতা থাকে তার অভিজ্ঞতার বুঝি তুলনা নেই।

একবার আমি অসুস্থতার জন্য পরপর কয়েকদিন ক্লাসে যেতে পারিনি। 'ফ্লু' হয়েছিল আমার। প্রথম দুতিনদিন জ্বরের প্রকোপে কোন ভাবনা চিন্তার অবকাশ ছিল না। পরে জ্বরের তাপমাত্রা কমলে স্বাভাবিক

নিয়মেই মনে পড়ল স্কুলের কথা, ফরাসী ক্লাসের কথা আর তার সঙ্গে মিশেলের কথা, বিদিশার কথা।

কি পড়াচ্ছে মিশেল? বিদিশা আসলে জানা যেত পাঠপর্বের কথা। ওকে অবশ্য টেলিফোন করে অসুস্থতার কথা জানানো যায়। কিন্তু টেলিফোন আছে বাইরের ঘরে। ক্লাসের কথা জিজ্ঞাসা করা যাবেনা। এমনিতেই আমার ফরাসী ক্লাস করা বাড়ির কেউ সুনজরে দেখেনা। মাঝে মাঝেই বাড়ি ফিরতে দেরি হলে তা নিয়ে গালমন্দ শুনতে হয় জ্যাঠা-মশাই. বাবা কিংবা মায়ের কাছে। তার ওপরে অসুস্থ অবস্থায় যদি কেউ আমাকে ক্লাসের কথা আলোচনা করতে শোনে তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। কিছু একটা সন্দেহ করে জবরদস্তি করে বন্ধ করে দেবে ক্লাসে যাওয়া।

কথাটা ভেবেই হাসি পেয়ে গেল আমার। অপরাধী মন সব সময়েই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকে বোধ হয়। তা নাহলে এ সব উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসে কেন? শুয়ে শুয়ে এ সব আকাশ পাতাল ভাবছি এমন সময় বিদিশা এসে হাজির। টেলিপ্যাথি ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কতখানি জানিনা। কিন্তু মাঝে মাঝেই এ ধরনের যোগাযোগের অন্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

এসেই হৈ রৈ করতে সুরু করলো বিদিশা।

—যা ভেবেছি তাই। আবার অসুখ বাধিয়ে বসেছিস? এবার ভাল করে ডাক্তার দেখা বুঝেছিস? সায়েব জিজ্ঞাসা করছিল তোর কথা। আমি অনুমানে বলেছি হয়ত অসুখ করেছে। শুনে মুখখানা ম্লান হয়ে গেল।

কোন সায়েবের কথা বলছে বিদিশা তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তবুও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে চাই আমি।

—কোন সায়েব জিজ্ঞাসা করছিল আমার কথা?

—কোন সায়েব আবার? মিশেল সাহেব। তুই আসছিস না দেখে মন দিয়ে পড়াতেই পারছে না। তবে ক্লাসে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। গতকাল লাইব্রেরিতে বই নিতে গিয়েছিলাম। তখনই জিজ্ঞাসা করল—'আপনার বন্ধু মাদমোয়াজেল আসছে না কেন? কি হয়েছে তার?'

—সত্যি?

বিস্ময়ে আনন্দে হঠাৎ আত্মবিস্মৃতি হয় আমার। আচমকা চড়ে যায়

গলার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কানেই সেই উল্লাসধ্বনি খট করে বাজে।

—শুধু শুধু বানিয়ে বলে লাভ কি আমার? আর সত্যি কথা বলতে কি আজ যে এসেছি তাও খানিকটা ঐ সাহেবেরই তাগিদে। আমি যখন বলেছি হয়ত অসুখ করেছে তখন অবাক চোখে তাকিয়ে বলল—'আপনারা বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না? খুব আশ্চর্য তো।'

আমার লজ্জা করছিল। এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারত মিশেল। তবু সেই লজ্জাকে ছাপিয়ে অসুস্থ শরীরেও তীব্র এক আনন্দের শিহরণ বইছিলো। বুঝতে পারছিলাম একটুও বাড়িয়ে বলছে না বিদিশা। তবু যেন অবিশ্বাস্য এক বিস্ময় অভিভূত করে দিচ্ছিল আমাকে। কত দিনেরই বা পরিচয় আমার তার সঙ্গে? আর খুব একটা উজ্জ্বল ছাত্রীও নই আমি। আমার অনুপস্থিতিতে ম্লান হয়ে যাবার কথা নয় ক্লাস। তাহলে মিশেলের এই ব্যাকুলতার অর্থ কি দাঁড়ায়? সে কি আমায়···?

নিজেকে প্রশ্রয় দিইনি। শক্ত হাতে কুলুপ এঁটে দিয়েছি কল্পনার দরজায়। জ্বরতপ্ত শরীরে বাড়তি উত্তেজনার ঝক্কিও বড় কম নয়।

—তুই এসেছিস ভাল হয়েছে। তোর কথাই ভাবছিলাম। কি পড়া হোল এই কয় দিন?

যা যা পড়া হয়েছে তা আমাকে জানায় বিদিশা।

পরে একটু হেসে রসিকতা করে আমার সঙ্গে।

—তোর আবার চিন্তা কি? সেরে ওঠ আগে। মঁসিয়োই যত্ন করে বুঝিয়ে দেবেন তোকে। শুধু তোর নিজের মুখে একবার বলার অপেক্ষা!

—তোর কি হয়েছে বিদিশা? কোথাও কিছু নেই। ইনিয়ে বিনিয়ে মনগড়া সব ধারণা নিয়ে বাজে বকছিস তখন থেকে। আমাকে কোনদিন দেখেছিস ক্লাসের বাইরে মঁসিয়োর সঙ্গে কথা বলতে? না কি ক্লাসের মধ্যেই অন্যরকম কিছু দেখেছিস কোনদিন?

ইচ্ছা করেই কপট রাগ দেখাই আমি। আসলে আমি চাইছিলাম বিদিশাকে বুঝতে। বিদিশার মনটাকে মেলে দেখতে। ও কিভাবে সবকিছু দেখছে, বিশ্লেষণ করছে তা অনুধাবন করতে। আর ও যা বলছে তার মূলে নিছক রসিকতার মাত্রা কতটা আছে আর পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণের গুরুত্ব কতটা আছে তাও বুঝি পরিমাপ করতে চাইছিলাম।

আমার দুর্বল শরীরে তা একরকম চাপ সৃষ্টি করছিল। পরিষ্কার খোলা মগজে চিন্তাভাবনা করতেও যেন অসুবিধা হচ্ছিল। তবু দুনিবার এক তাগিদে নিজেকেই ক্রমাগত পীড়ন করছিলাম আমি।

—কি আশ্চর্য তা কেন? আমি সেরকম কিছু বলতে চাইছিনা। কিন্তু মঁসিয়ো যে তোকে খুবই পছন্দ করছেন সেটা বেশ বোঝা যায়। তবে একটা কথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি মীনাক্ষী। নিজের ভাল যদি চাস তাহলে একদম পাত্তা দিবিনা। অত্যন্ত লঘুচিত্তের হয় এরা। যেমন তাড়াতাড়ি প্রেমে পড়ে তেমন তাড়াতাড়িই আবার প্রেম ঝেড়ে ফেলতেও পারে। কোনটার জন্যই খুব সময়ের দরকার হয়না। মঁসিয়োর সম্পর্কে আলাদা করে কিছু বলছি না। এটা ওদের জাতের দোষ। যে কয়বছর ফ্রান্সে ছিলাম কম জনকে দেখিনি তো! আমার যা হবার হয়েছে। আমি চাইনা আর কেউ আমার মত কষ্ট পায়!

বিদিশার বুক থেকে উদ্গত দীর্ঘশ্বাসের শব্দে কেমন ভয় করতে থাকে আমার। থেমে থেমে বলা ওর সতর্কবাণী অভিশাপের মত ভয়াবহ শোনায়। ছায়ার মত ঘিরে আছে ওকে ওর জীবনের দুর্ভাগ্য। আলোয় আঁধারে কখনো হ্রস্ব কখনো বা দীর্ঘ হয়ে। অবিচ্ছিন্ন চিরসঙ্গী সেই ছায়ার অস্তিত্ব অন্যদের মনেও কেমন আশঙ্কা সৃষ্টি করে।

তবু ওকে মনে হোল ধর্ষকামী বলে।

জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ল হিলহিলে রাগ। মনে হোল অবচেতন মনে কি ও চাইছে ওর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটুক অন্যের জীবনে? ওর ধারণা কতটা সত্য তা প্রতিপন্ন হোক বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে? একটু চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করলাম পরক্ষণে। ভাবলাম আমি নিজেও কি এসব দুর্বলতার ঊর্ধ্বে? বন্ধুর জীবনের দুর্ভাগ্য নিয়ে কতখানি পীড়িত আমি? যে মানুষকে সর্বশরীরে জ্বালাযন্ত্রণা সইতে হচ্ছে সে কি করে সর্বংসহা থাকতে পারে? তার সেই যন্ত্রণার কিছু প্রকাশ যদি ঘটেই তাহলে অবুঝের মত রাগ করা কি সাজে আমার?

আচমকা অদ্ভুত এক প্রশ্ন করে বিদিশা। প্রশ্নটা এত অপ্রত্যাশিত যে হতভম্ব হয়ে যাই।

—আচ্ছা মীনাক্ষী! মঁসিয়ো বেরঁতা যদি কোনদিন তোকে বিয়ের প্রস্তাব দেন রাজী হবি তুই?

—এ কি সব প্রশ্ন করছিস তুই বিদিশা? এ রকম কথা তো স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারিনা। অনর্থক উল্টোপাল্টা ভেবে মরছিস তুই। যার কোনই বাস্তব ভিত্তি নেই।

—আমার কিন্তু সত্যিই মনে হচ্ছে মঁসিয়ো বেরঁলা খুব পছন্দ করছেন তোকে। হয়ত কোনদিন সত্যি সত্যি তোকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেন।

—তোর মাথায় একটা ভূত চেপেছে বিদিশা। সেটা ছাড়ানো দরকার। ফরাসীরা সকলেই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হবে এমন কোন কথা নেই। ওদের দেশেও ঝট করে কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়না। তার আগে বোঝাপড়ার একটা পর্ব থাকে।

—দূর! আমি কি বলছি উনি তোকে কালই প্রস্তাব দেবেন? তা নয়। সে সময় হলেই দেবেন। তবে আমার মন বলছে মঁসিয়োর সঙ্গে তোর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

—আসলে তোর এখন ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাবার অবস্থা। তাই এসব হিজিবিজি চিন্তা আসছে মাথায়।

কথাটা বলেই আফশোস হয় আমার। বিদিশার ক্ষতকে খুঁচিয়ে তোলা আমার ইচ্ছা নয়। অধিকাংশ সময়েই এড়িয়ে যাই আমি সে প্রসঙ্গ। তবু বেরিয়ে গেল কথাটা অসাবধানে। আসলে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে থাকে অতীত। তার বিজড়িত আলিঙ্গন শিথিল করা বড় সহজ কাজ নয়।

আমি ভেবেছিলাম বিদিশার মনে লাগবে কথাটা। তাই অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম বেশ সহজভাবেই নিতে পারল ও কথাটা।

—ঠিক বলেছিস মীনাক্ষী। সত্যিই ভীষণ ডরপুক হয়ে গেছি আমি। বৃষ্টি হলেই বন্যার কথা ভাবি। আর ধোঁয়া দেখলেই আগুন লেগেছে বলে আতঙ্কে বুক ধড়ফড় করে আমার।

বিদিশাকে থামিয়ে দিই আমি।

—ওসব কথা থাক। রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের মেয়ে আমি। অনেক আগেই বিয়ে হয়ে যেত। এত বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া থাকার কথা নয় কোনমতেই। শুধু ঠিকমতো জোড়া লাগেনি বলেই বিয়েটা হয়নি। কিন্তু নাটক করার সাধ্য বা সাহস কোনটাই নেই। এসব জিনিষ

একতরফা হয় না জানিস। কাজেই আমার দিক দিয়ে চিন্তা করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। আর মঁসিয়োকেও আমার খুব লঘু চপলমতি বলে মনে হয় না। ফ্লার্ট করার জন্য ফ্লার্ট করার টাইপ আলাদা।

—এত নিশ্চিন্ত হয়ে কিছু বলিস না মীনাক্ষী। আমাদের সঙ্গে ওদের মানসিকতার অনেক তফাত্। ওরা এসব জিনিষ অত সিরিয়াসলি নেয়না।

—আমাদের অনেক গোঁড়ামী বা রক্ষণশীলতা ওদের না থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসাবে কোন কোন জিনিষ অবশ্যই সিরিয়াসলি নেবে। তাই নয় কি?

—আমি সব দিকের কথা জানিনা। কিন্তু প্রেম, বিয়ে এসব ব্যাপার-গুলো ওদের কাছে অনেক হালকা সাময়িক কতগুলি ব্যাপার।

একটু আগে ভেবেছিলাম এসব নিয়ে তর্ক করব না বিদিশার সঙ্গে। একটা আগ্রাসী মানসিক ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ও। সেটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। যথাসময়ে কেটে যাবে সেই আচ্ছন্ন আঁধার। বদ্ধমূল ধারণার গণ্ডীর বাইরে প্রসারিত হবে ওর চিন্তাভাবনা।

কিন্তু মুখে আমি যতই অস্বীকার করিনা কেন মনে মনে মিশেলকে নিয়ে কেমন একটা দায়বোধ গজিয়ে উঠেছিল। সেই প্রথম দিন থেকে। প্রেম কিংবা বিয়ে নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা সত্যই ছিল না আমার তখন। তবু পরোক্ষে হলেও মিশেলের সম্পর্কে কোনরকম কটাক্ষ যেন সহ্য হতোনা আমার।

বেশ মনে আছে বিদিশা কেমন অবাক হয়ে যেত আমার মধ্যে সেই তর্কের স্পৃহা দেখে। এতদিনের চেনা মীনাক্ষী যে ভেঙেচুরে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে তার আভাস যেন টের পাচ্ছিল ও ধীরে ধীরে একটু একটু করে।

সেই সব কথা মনে পড়লে এখন হাসি পায়। বিদিশার একদেশদর্শী ফরাসী বিদ্বেষ প্রতিহত করার সে কি সযত্ন প্রয়াস আমার! ফরাসীদের স্বপক্ষে যখনই কোন তথ্য পেয়েছি যত্ন করে সংরক্ষণ করেছি মনের মধ্যে। প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকে অস্ত্রের মত ব্যবহার করে প্রত্যাঘাত হেনেছি বিদিশাকে।

মিশেলকে কেন্দ্র করে আমরা দুই দীর্ঘদিনের বন্ধু এক কৌতুককর লড়াইয়ে মেতে উঠেছিলাম। অবশ্য তখন সেটা কৌতুকের পর্যায়ে ছিল না। গোপনে গোপনে দুজনেই দুজনের নিঃশব্দ রক্তপাত ঘটিয়েছি।

আমি কিন্তু বুঝিনি আমার জন্য প্রসারিত হচ্ছে এক আশ্চর্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য। এক ফরাসী যুবক তার হৃদয় সাম্রাজ্যের অধিকার সমর্পণ করতে চাইছে আমার কাছে। প্রতিদানে চাইছে আমার খাটো মাপের জীবনের মধ্যে একটু স্থান করে নিতে।

আজ অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন বুঝি পরিচয়ের সেই প্রথম মুহূর্তেই সুরু হয়েছিল মিশেলের বিজয় অভিযান। অবুঝ গোঁড়ামিতে আমি জোর করে সেটা বুঝতে চাইনি।

আরও বুঝি ফরাসীদের অনুকূলে তথ্য সংগ্রহের খেলার মধ্যে স্পষ্ট রূপ নিচ্ছিল আমার আবেগ. আকাঙ্খা, আশা। বিদিশাকে কিংবা দিদিকে বোঝাতে গিয়ে নতুন করে বলবৃদ্ধি হয়েছে আমার।

সেদিনও বিদিশার মন্তব্য শুনে নিশ্চুপ থাকিনি আমি। পাল্টা প্রশ্ন তুলেছি।

—তুই আমাকে 'লেডু কাসিঁও সঁতিমঁতাল'-এর একটা ইংরাজী অনুবাদ পড়তে দিয়েছিলি মনে পড়ে বিদিশা?

প্রশ্নের মর্ম বুঝতে পারেনা বিদিশা। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কোন জবাব দেয় না।

—সেখানে যে প্রেমের কথা আছে সেটা কিন্তু লঘু হালকা প্রেম নয়। ফ্রেডেরিকের মাদাম আরন্যুর প্রতি ভালবাসা প্রেমের ইতিহাসে এক মহার্ঘ সংযোজন। তাছাড়া স্টাঁডালের 'লো রুশ এ লো নোয়ার' উপন্যাসেও আঠার বছরের জুলিয়েঁার ত্রিশ বছরের মাদামের দ্য রেনালের প্রতি এরকম গভীর প্রেমের ইঙ্গিতে আছে। ফরাসী সাহিত্যে গল্প উপন্যাসে কবিতায় এমন অজস্র প্রেমের ঘটনা পাওয়া যাবে। সেগুলি কি শুধুই কল্পনাসর্বস্ব? আর যদিও বা কল্পনাসর্বস্ব হয় তাহলেও যে জাতের পক্ষে ওরকম গভীর প্রেমের কল্পনা করা সম্ভব তাকে লঘু চপলমতি আখ্যা দেওয়া কি খুব যুক্তিযুক্ত?

আমার সেই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেয়নি সেদিন বিদিশা। একটু বাঁকা হেসে বাঁকা কটাক্ষের আশ্রয় নিয়েছিল ও।

—ফরাসীদের হয়ে তুই এত ওকালতি করছিস কেন বলত? ব্যাপারটা একেবারে অকারণ মনে হচ্ছে না!

লজ্জা পেয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম সেই প্রসঙ্গ।

—ফরাসীদের কথা থাক্। আমাদের নিজেদের কথা হোক্ এবার।

মাসিমা মেশোমশায় কেমন আছেন? অনেকদিন যাইনি তোদের লেক টেরেসের বাড়ি। স্বাতীর বিয়ের কথা কতদূর এগোল? খুব দেখতে ইচ্ছা করে সকলকে।

—আসলেই তো পারিস। মুখের কথা যত!

—নারে। সময় হয়ে ওঠেনা। স্কুল ছুটির পর গেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। বাড়িতে সুরু হবে ঝুটঝামেলা। আর ছুটির দিনে যে যাব তারও উপায় নেই। হাজারটা কাজ এসে তাড়া করে তখন।

বিদিশা চলে গেলে পরও আমার মাথা থেকে উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি। জ্বরতপ্ত শরীরে বাড়তি উত্তেজনা ক্ষতি করতে পারে জেনেও মন থেকে সরাতে পারছিলাম না মিশেলের চিন্তা। সেতারের ঝঙ্কারের মত বেজে চলেছিল ক্রমাগত বিদিশার কথাগুলো। মিশেল আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছে। আমার অনুপস্থিতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমার খোঁজখবর নেয়নি বলে পরোক্ষে তিরস্কার করেছে বিদিশাকে।

বিদিশার প্রশ্নটাও বিকল হয়ে যাওয়া গ্রামোফোনের কলির মত বারবার কানে বাজছিল আমার। 'আচ্ছা মীনাক্ষী! মঁসিয়ো বেরঁতা যদি তোকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, রাজী হবি তুই?' সেই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ যে কতখানি সুখাবহ তা আমি যতক্ষণ বিদিশা এখানে উপস্থিত ছিল ততক্ষণ ঠিকমত বুঝে উঠতে পারিনি। পরে তীব্র সুখে আনন্দে বিবশ হয়ে পড়ছিল আমার শরীর, মন। অতবড় দুঃসাহসের কথা যে বলেছে তার জিহ্বা উৎপাটন করা উচিত। অথচ আমার অবশবিবশ মনে উল্লাস ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া হলোনা তার জন্য।

সুস্থ হয়ে ওঠার পর যেদিন আলিঁয়সে উপস্থিত হলাম সেদিন মিশেলের ভাবান্তর দেখে সংশয় যেন ঘুচলো আরও খানিকটা। ক্লাস সুরু হওয়ার খানিকটা আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। তখনও এসে উপস্থিত হয়নি বিদিশা।

লাইব্রেরিতে ঢুকে দু' একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাছিলাম। মুখ্যতঃ বিদিশার জন্য অপেক্ষা করছিলাম বলা যায়। সকালেই ফোনে কথা হয়েছিল ওর সঙ্গে। যে আগে পৌঁছবে সে লাইব্রেরিতে এসে অপেক্ষা করবে।

বিদিশার আগে মিশেলই এসে উপস্থিত হয়েছিল লাইব্রেরিতে। আর

কী আশ্চর্য! দরজা দিয়ে ঢোকামাত্র তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো আমার। আমাকে দেখামাত্র বিদ্যুৎ ঝলকের মত আলো খেলে গেল ওর মুখে চোখে। পরিষ্কার চোখে পড়ল সেটা। হয়ত বিদিশার কাছে সবকিছু না জানলে সেটা ধরা পড়তনা আমার চোখে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। সেই মুহূর্তে আমার করণীয় কি তা ঠিক করতে পারিনি। মিশেল দ্রুত এগিয়ে এল আমার কাছে।

—কমো তালেভ্যু মাদ্‌মোয়াজেল? ভ্যুজেতিয়ে মালাদ্।

কোন রকমে 'জো ভে বিঁয়া ম্যাঁত্‌নো' বলে মুখরক্ষা করি। তার বেশি ফরাসী বলার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমার ফরাসী বিদ্যের দৌড় এর মধ্যে ভাল করে বুঝে গিয়েছিল মিশেল। আর কিছু না বলে আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ও। একটু পরে উঠে শেলফ থেকে একটা বই নিয়ে এসে পাতা উল্টে কি যেন দেখতে লাগল। আমি ঠিক জানিনা কেন যেন মনে হচ্ছিল সেই মুহূর্তে ওর ঐ বই নিয়ে কোন কাজ ছিল না। আমি যদি ফরাসী ভাষায় কথা চালিয়ে যেতাম তাহলে বই নিয়ে এভাবে সময় নষ্ট করত না। অবশ্য ইংরাজীতেও বলতে পারত। কিন্তু আমার ইংরাজী বিদ্যার দৌড় নিয়েও হয়ত সমান সংশয় রয়েছে ওর।

মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে গেল এসব চিন্তা আমার মনে। কয়েক দিনের রোগভোগের পর আমার অন্তর্নিহিত শক্তি যেন বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাহ্যিক ঘটনা ও দৃশ্যের অন্তরালে মূল সত্যকে উপলব্ধি করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা জন্মেছিল যেন। সারদা মা একবার রোগভোগকে তপস্যার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমারও মনে হচ্ছিল তপস্যালব্ধ দুর্লভ ক্ষমতাবলে অনেক কিছু দেখতে পারছি, বুঝতে পারছি।

মিশেলের নিকট সান্নিধ্যে বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছিল। শারীরিক অনুভূতির ঊর্ধে এক অবিমিশ্র নৈকট্যবোধ। কিন্তু সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। একটু পরেই তীব্র বিষাদ আর দুঃখে ছেয়ে গেল আমার মন। মহাভারতের কর্ণের মত দৈবায়ত্তং হি কুলে জন্মং মদায়ত্তং হি পৌরুষম্' বলতে কয়জন পারে? জন্মসূত্রে যে গণ্ডীর মধ্যে জীবন যাপন করার কথা তার বাইরে এসে দাঁড়ালে অনেক খেসারত দিতে হবে। অতখানি হিম্মৎ নেই আমার।

বিদিশা এসে পৌঁছলনা বলে রাগ হচ্ছিল। আর অস্বস্তি। সেটা

কাটাবার জন্য আমিও একটা ম্যাগাজিন খুলে ছবি দেখতে লাগলাম। একটু পরেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে চোখ তুলে দেখি এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মিশেল। অপলক অতল গভীর দুই চোখে তীব্র এক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে। আমি যে সেটা লক্ষ্য করেছি তাও যেন খেয়াল নেই তার। দুরারোহ পর্বতশিখর বা অতল সমুদ্রের অভিমুখে অনুসন্ধিৎসু এক অভিযাত্রীর মত দৃষ্টি তার চোখে। অস্থির দুরন্ত তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে আছে যেন সে সামনে মেলে ধরা কোন মানচিত্রের দিকে। সেই মুহূর্তে এত সব তুলনার কথা মনে আসেনি আমার। অনেক পরে স্মৃতিচারণের পর্যায়ে বিশ্লেষণের দরুন সেসব কথা মনে এসেছে।

তার সতৃষ্ণ অতল দৃষ্টির ঝলকে টালমাটাল দিশেহারা লাগছিল নিজেকে। আমার খুব ভয় করছিল। যদি কারুর চোখে পড়ে তাহলে এর কি অর্থোদ্ধার করবে সে? কিন্তু লাইব্রেরিতে সেই মুহূর্তে তেমন কেউ ছিল না। দু' একজন যারা ছিল তারা নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। দ্রুত চোখে সমস্ত ঘর জরীপ করে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি আমি।

ঘটনা কিছু ঘটেনি সেদিন। একটু পরেই ক্লাস সুরু হয়েছিল নির্দিষ্ট ঘরে। যথারীতি ঘুরে ঘুরে পড়াচ্ছিল মিশেল। তবে অন্যদিনের তুলনায় অনেক ঘন ঘন আমাকে দেখছিল সে। বারবার আমার নৈকট্য চাইছিল সে। আমি আমার মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল সংস্কার নিয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলাম সারাক্ষণ। আমার খোলসের মধ্যে ভারতীয় মানবাত্মা ফ্রান্সকে স্বীকার করে নিতে পারছিল না। সংশয়ে, ভয়ে, সন্দেহে সংস্কারে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চাইছিল সে।

আমি জানিনা ক্লাসের অপর কেউ তা লক্ষ্য করেছিল কিনা? কিংবা করলেও তার প্রকৃত অর্থ বুঝেছিল কিনা? বিদিশা উপস্থিত থাকলে হয়ত কিছু অনুমান করতে পারত। কিন্তু সেদিন সে উপস্থিত ছিল না ক্লাসে। অনেক লজ্জা আর অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম তাই।

ঘনিষ্ঠতার পর একদিন মিশেলকে প্রশ্ন করেছিলাম এ সম্পর্কে।

—আচ্ছা মিশেল সেদিন তোমাকে অতখানি অস্থির আর অশান্ত লাগছিল কেন?

গভীর বিষাদভরা চোখে আমার দিতে তাকিয়ে ততোধিক বিষণ্ণ গলায় জবাব দিয়েছিল সে।

—আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম মীনাক্‌শি। আমার মনে হচ্ছিল যদি তোমাকেও হারাই? রোগভোগের পর তোমাকে খুব ম্লান দেখাচ্ছিল। আমার দেখে খুব খারাপ লাগছিল। ভয়টা খালি বেড়েই চলেছিল।

—কিসের জন্য ভয় পেয়েছিলে? আর তখন তো আমার সঙ্গে তোমার বোঝাপড়াই হয়নি।

—তুমি আসছনা দেখে প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল অসুখের কথা। পরে তোমার বন্ধু মাদাম বোসকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম আমার অনুমান ঠিক। তোমার অসুখের সময় নিজের মনটাকে অনেকটা বুঝতে পেরেছিলাম। খুব শূন্য, ফাঁকা ফাঁকা লাগত মনটা। আর ভয়ের কারণটা আমার ব্যক্তিগত। তোমাকে তো বলেছি যে দুটি মেয়েকে ভালবাসতাম তাদের কাউকেই আমি ধরে রাখতে পারিনি। অকাল মৃত্যুতে দূরে সরে গেছে তারা দুজনেই আমার কাছে থেকে। তার পরেও আমার এক কাজিনকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু তাকে আমার মনোভাব জানাবারও সুযোগ পাইনি। তার আগেই সে বিয়ে করেছিল তার এক পরিচিত ব্যক্তিকে।

মিশেলকে দেখে বুঝছিলাম তার সেই দুঃখ, কষ্ট, অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা আবার যেন নতুন করে অনুভব করছে সে। প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য।

—আচ্ছা মিশেল আমার সঙ্গে তো কোন বোঝাপড়াই হয়নি তখন তাইনা? তাহলে তোমার অত মন খারাপ হয়েছিল কেন?

শান্ত হাসিতে অনবদ্য দেখিয়েছিল মিশেলের ধারালো বিষাদকাতর সুন্দর মুখটি!

—ভারতবর্ষের মেয়ে তুমি। বাইরের ঘটনাটাই সব কিছু হবে কেন তোমার কাছে মীনাক্‌শি? তোমরা হৃদয়ের কথা বলো। আত্মার কথা বলো। বোঝাপড়া ব্যাপারটা কি শুধু মুখের কথার ওপর নির্ভর করে?

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিনি আমি। মোক্ষম জবাব পেয়ে গিয়েছিলাম বলে। কিন্তু কৌতূহল হয়েছিল জানতে ভারতবর্ষের আত্মা নিয়ে গবেষণার উৎসাহ কবে থেকে হয়েছে মিশেলের? আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে? না তারও আগে থেকে? লজ্জায়, সংকোচে সে প্রশ্ন করতে পারিনি। কিন্তু আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় উপচে পড়েছে আমার মন। বারবার মনে হয়েছে

একটি কথা। জীবন বোধহয় পুরোপুরি বঞ্চিত করেনা কাউকেই।

আকৈশোর এক শুদ্ধ প্রেমের তৃষ্ণায় ছটফট করেছি আমি। সেই তৃষ্ণা নিবৃত্তির কোন উপায় খুঁজে পাইনি এতদিন। শেষে সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা সকলের জন্য নয় বলে মেনেও নিয়েছি নিজের ভবিতব্যকে। অথচ বেলা-শেষে নয়ন ধাঁধিয়ে একি অজস্র পুষ্পের সমাহারে ভরে উঠল আমার জীবন?

॥ ছয় ॥

চৈতন্য যদি হয় এক অবিরাম প্রবাহ, স্মৃতি তাহলে সেই প্রবাহের একটি ধারা। কালের উজানে ঋজু ভঙ্গীতে তাকে চালনা করা সম্ভব হয় না। জলের ধর্মে এঁকেবেঁকে প্রবহমান সে। মিশেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপনের ইতিহাস স্মরণ করতে গিয়ে আমি তার বঙ্কিম প্রবণতা বারে বারে টের পাচ্ছি। এঁকেবেঁকে নিজস্ব প্রবণতায় প্রবাহিত হচ্ছে সে। নিয়ন্ত্রণের রশি টেনে তাকে শাসন করা যাচ্ছেনা। অগ্রপশ্চাৎ মুখ্য গৌণ কিংবা পূর্বপর মাত্রা বজায় রাখা যাচ্ছে না।

বারবার মনে হচ্ছে ডায়েরি লেখার অভ্যাস থাকলে ভাল হতো। অনেক ঘটনা মনে করতে গিয়ে এই যে কেমন খেই হারিয়ে ফেলছি সেটি হতোনা তাহলে। কিংবা সেই সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত আবেগের দরুন পরের কোন প্রসঙ্গে অবগাহন করত না মন। তবু সংশয় থেকেই যায়। ক্রমানুসারী কালের ছাঁকনিতে নিঃসৃত হলে হয়ত সেগুলির কালপর্ব অবিকৃত থাকত। কিন্তু অবিকৃত থাকত কি তাদের প্রেক্ষাপট, তাদের মহিমাবিভব কিংবা তাদের সামগ্রিক ব্যঞ্জনার দিক?

এ কথাটা যখন ভাবি তখন থমকে যাই। মনে হয় চেষ্টাকৃত প্রয়াসে নয়—স্বচ্ছন্দ সাবলীল অনায়াস স্মৃতিচারণার মধ্যে আস্বাদন করি কাল-প্রবাহে সতত প্রবহমান বিগত দিনের সেইসব বিষাদ-আনন্দঘন উত্তাল বিজড়িত অভিজ্ঞতা।

তবে আমার আরোগ্যলাভের পর লাইব্রেরি ঘরে মিশেলের সেই সতৃষ্ণ নিবিড় চাহনীর মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক পরিচয়পর্বের সংশয়কুটিল অধ্যায়ের যবনিকাপাত হয়েছিল। সুরু হয়েছিল পরবর্তী অধ্যায়।

অনুমান, আশঙ্কা দ্বিধা থরোথরো সেই অধ্যায় আক্ষরিক অর্থেই

উত্তাল। ঝড়ের মত উড়িয়ে নিয়েছে তা আমাকে। কেন্দ্রচ্যুত মূলোৎপাটিত অবস্থায় একেবারে টাল-মাটাল তখন আমি। অসুখের আগের অধ্যায় তুলনায় অনেক নিঃশব্দ, নিরুচ্চার। একেবারে নিস্তরঙ্গ না হলেও সেই তরঙ্গ আছাড়িপিছাড়ি করেনি চেতনার বেলাভূমিতে।

সেই লাইব্রেরি ঘরে আনন্দের মধ্যে নিজের অক্ষমতার জন্য তীব্র এক কষ্টও বহন করছিলাম আমি মনে। সেদিন থেকে ফরাসী ভাষার চর্চা দ্বিগুণ উৎসাহে বাড়িয়ে দিলাম। তার ফলও পেলাম হাতে। আর আমি দেখেছিলাম আমার উন্নতিতে আমার থেকেও যেন বেশি খুশি হচ্ছে মিশেল।

আলাপের নৈকট্য তো বটেই, তদুপরি ঘনিষ্ঠতার সোপান তৈরি করতে যাচ্ছে তা। হয়ত সেকারণেই অত্যন্ত উল্লসিত দেখতাম মিশেলকে। তার মুখের স্বাভাবিক বিষণ্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই উল্লাসের আভাস উজ্জ্বলতর দেখাত। স্বভাববিরোধী সেই আবেগ প্রকটিত হতে চাইত তার মুখে, চোখে, কণ্ঠস্বরে। আর তার সেই আনন্দ আমার উৎসাহ বাড়িয়ে দিত অনেকখানি।

আমি কোনদিনই খুব পড়ুয়া ছিলাম না। গল্পের বই পড়ার অভ্যাস আবাল্যের হলেও পাঠ্যবই সম্পর্কে একটা তীব্র অনীহা ছিল বরাবরই। পরীক্ষার ফল তাই বরাবর হয়েছে মাঝারী রকমের। আমার মধ্যে যে সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে ছিল তা টের পাইনি আগে। আত্মসচেতনতা এল এতদিন পর।

নিজের ক্ষমতা, নিজের যোগ্যতা আবিষ্কার করলাম জীবনের অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এসে। নিজেরই নাভির গন্ধে উতলা কস্তুরীমৃগের মত উচাটন অবস্থা তখন আমার। শুধু কি ফরাসী ভাষা? ফরাসী সাহিত্য ও দর্শনের প্রতিও আগ্রহ জন্মাতে লাগল ধীরে ধীরে। প্রথমে বিদিশাকে তর্কে হারিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তার মূলে হলেও ধীরে ধীরে তা নেশার মত টানতে লাগল আমায়।

ফরাসীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমাকে কেউ উকিল ধরেনি। কিন্তু বিদিশার তীব্র ফরাসী বিদ্বেষ বা প্রবল প্রচণ্ড জাতক্রোধ প্রতিহত করার প্রয়াসে যে চর্চা সুরু হয়েছিল তা নতুন আলোকবর্তিকা তুলে ধরল চোখের সামনে।

ইতিহাসের ছাত্রী হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছিলাম।

রুশো ভল্‌তেয়ারের নামোল্লেখ পেয়েছি নানা প্রসঙ্গে। কিন্তু তাদের সাহিত্য-কর্ম বা চিন্তাভাবনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের তাগিদ বোধ করিনি। ফরাসী-দের জাতীয় ইতিহাস কিংবা বিশ্ব ইতিহাসে তার প্রভাব নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ইতিহাস, তাদের আশা আকাঙ্খা যন্ত্রণা বেদনার ছবিটি স্পষ্ট ছিল না। রুশো ভলতেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে স্টাঁদাল, ফ্লবেয়ার, জোলা, প্রুষ্ট, জিদ আর ফ্রাঁসোয়া মরিয়াকের সাহিত্যকর্মের ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গেও পরিচয় হলো।

যে শাশ্বত মানবাত্মার প্রকাশ ফ্রান্সে বিরাজমান তাকে আপন স্বরূপে চিনে নিতে সে কি অবিরাম প্রয়াস চলেছিল আমার জীবনে! দেশকাল-ভেদে তার পরিবর্তিত রূপ আবিষ্কারের মোহ ও নেশা এমনভাবে পেয়ে বসল আমাকে যে নিয়মরক্ষামত স্কুলের চাকরিটি টিকিয়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তাম মহাসমুদ্রের তীরে উপলখণ্ডের সন্ধানে।

চার বছর ধরে অবিরাম সেই চেষ্টার জন্যই আজ মিশেলের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি ফরাসী শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে। বিসমার্ক বলেছিলেন তার সাফল্যের মূলে সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে তার প্রিয়তমা পত্নীর। আমারও মনে হয় মিশেলের সঙ্গে পরিচয় না হলে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না জন্মালে আমার জীবনে এই ব্যাপ্তি আসত না।

ভাষা, সাহিত্য আর সংস্কৃতির প্রতি আমার এই অনুরাগ বা আগ্রহের সূচনা তো মিশেল পর্ব থেকেই। আমার চেতনাকে সম্প্রসারিত করে সর্বতো অর্থে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছিল সে আমার জীবন। শুধুমাত্র আবেগ আর উচ্ছ্বাসের ফুলঝুরিতে হারিয়ে যায়নি যে আমার প্রেম সেজন্য সহস্রবার কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা করে মিশেলকে। দ্বিতীয় জন্ম হলো যেন আমার।

এই চার বছর ধরে একভাবে তার কাছে পড়িনি আমি। সেমেস্টার বদলের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকবদল হয়েছে মিশেলের পরোক্ষ প্রভাব অব্যাহত থেকে গেছে তবু। লাইব্রেরিতে, ক্যান্টিনে কিংবা যে কোন উপলক্ষে তার সাহচর্য আমাকে উৎসাহ দিয়েছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

আমার এই দ্বিতীয় জন্মের দরুন ভোলবদল দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। মুখচোরা লাজুক স্বভাবের যে মীনাক্ষী সেনের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ছিল একেবারে অভাবনীয়, আজ তার দৃপ্ত সাবলীল ব্যক্তিত্ব দেখে

হকচকিয়ে যায় অনেকেই। মিশেলও একদিন রসিকতা করেছিল তা নিয়ে।

—তুমি অনেক বদলে গেছ আগের থেকে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি আমি কি এই মেয়েটিকেই চিনতাম?

নীরব হাস্যে মেনে নিয়েছিলাম তার বিস্ময়। আমি নিজেও যে বারবার নিজেকে বলি—'তুমি অনেক বদলে গেছ মীনাক্ষী সেন।'

এই অধ্যায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ের তুলনায় অনেক বেশি উত্তাল ঘটনাবহুল। অসংখ্য ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত এই অধ্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে পারেনি। একাধিক উপলক্ষে আমার প্রতি মিশেলের মনোযোগ ও পক্ষপাতিত্ব টের পেয়ে গেছে অনেকেই। ছাত্রছাত্রী শিক্ষক নির্বিশেষে। আলিয়ঁসে মুখরোচক সরস আলোচনা সুরু হয়ে গেছে তা নিয়ে।

কিন্তু উটপাখীর মত মুখ নীচু করে চলেছিলাম বলে সে সবের কোন খবর জানতাম না। প্রথম তার আভাস পেলাম এক সন্ধ্যায় ক্যান্টিনে বসে। সেদিন আমাদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে কেউ কোন মন্তব্য করেনি। কিন্তু অন্য একটি ঘটনা নিয়ে সরস আলোচনার মুহূর্তে প্রথম যেন ঘোর ভাঙ্গল আমার।

আমাদের দুজনের পৃথিবীর বাইরে যে কৌতূহলী আর সমালোচনামুখর পৃথিবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করছে অনেক কিছু তা হঠাৎ বুঝতে পেরে গেলাম। আপনাতে আপনি বিভোর আনন্দের ঘোর কেটে গেল একরকম সেদিন থেকে। মিশেল পর্বের এই দ্বিতীয় অধ্যায় তাই মিশ্র অনুভূতির অধ্যায়, দ্বন্দ্বসংকুল ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অধ্যায়।

তৃতীয় সেমেস্টারের উর্বশী মহাপাত্র নামে একটি মেয়ের সঙ্গে মঁসিয়ো লোগ্রোঁর উদ্দাম প্রেমপর্ব চলছিল। প্রকাশ্যেই দুঃসাহসিক ঘনিষ্ঠতা দেখাত দুজনে। আমার চোখেও পড়েছে দুজনে সিঁড়ি দিয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে উঠে আসছে ওপরে পরস্পরের দেহসান্নিধ্যে মত্ত মাতালের মত।

ভারতীয় পোষাক কম দেখা যেত উর্বশীর শরীরে। চেহারা সুন্দর ছিল না তার। কিন্তু নারী শরীরের রমণীয় আঁকাবাঁকা কতখানি প্রকট হলে তা লোভনীয় হয়ে ওঠে পুরুষের চোখে তা জানা ছিল উর্বশীর। জীন্‌সে ঊর্ধাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের তরঙ্গায়িত সৌন্দর্য যেন বাঁধন মানতে চাইতনা তার।

মঁসিয়ো লোগ্রোঁও কিছু কম দেহসচেতন ছিলেননা। আঁটো প্যান্টে নিজের পুরুষালী সৌষ্ঠব প্রকট করতে কোনরকম দ্বিধা ছিল না তার।

দুজনে যখন হাত ধরাধরি করে কাঁধে কাঁধ দিয়ে ওপরে উঠে আসত আমার মনে হোত কামের সাকার শরীরী রূপ সচল হয়ে উঠে আসছে চোখের সামনে। কানে এসেছে সিনেমা হলে, গাড়িতে বা যে কোন অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বিসদৃশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকতে দেখা গেছে ওদের।

আমাদের সেমেস্টারের পরাশর জৈনের প্রতিবেশী ছিল মঁসিয়ো লোগ্রোঁ। ক্যান্টিনে বসে ওর মুখে শুনলাম ও নাকি একদিন কি একটা দরকারে খুব ভোরবেলায় মঁসিয়ো লোগ্রোঁর বাড়ি গিয়েছিল। সেই অত সকালেই উর্বশীকে দেখেছিল ও মঁসিয়োর বাড়িতে। ঘটনার কথা উল্লেখ করে ও মন্তব্য করেছিল যে উর্বশী খুব সম্ভব রাত্রিবাস করেছিল সেখানে।

অনেকেই বসেছিল ক্যান্টিনে। চা কফি সিগারেট নিয়ে। তাদের দু'একজন আপত্তি করেছিলো কথাটা শুনে। বলেছিলো অতখানি সম্ভব নয়। তপন জর্জ্জ বলে একটা ছেলে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেছিল পরাশরকে। বলেছিলো কোন একটা সিনেমা হলে 'নাইট শো'-তে পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখতে দেখেছে ও দুজনকে। সিনেমা শেষে বাকি রাতটা যে উর্বশী মঁসিয়োর শয্যায় কাটিয়ে দেবে সে তো একরকম অবধারিত।

আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না ওসব ঘটনার। তবু বিদিশার সঙ্গে কফি খেতে খেতে অজ্ঞাত কারণে কেবলই শিউরে উঠছিল আমার মন। বিচিত্র এক গ্লানিবোধে মলিন হয়ে উঠছিল আমার অন্তরাত্মা। মঁসিয়ো লোগ্রোঁর সঙ্গে উর্বশীর লাগামছেঁড়া ঘনিষ্ঠতা আমরাও চাক্ষুষ করেছি। কিন্তু যে ঘটনা অপ্রত্যক্ষ কল্পনায় সেটা অনুমান করে প্রকাশ্যে তা নিয়ে চুটিয়ে সরস আলোচনা করাটা আমার কাছে অন্যায়, অশোভন আর রুচি-বর্জিত বলে মনে হচ্ছিল। 'বেনেফিট অফ ডাউট' কথাটাও যে মানতে চায় না এইসব যুবক তা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল।

ছেলেদের আলোচনা ঐ পর্যায়েই থেমে থাকেনি। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছিলাম আমরা ক্যান্টিনে। বিদিশার মাথা ধরেছিল বলে কফি খেতে এসেছিল ও। পরে একজন দুজন করে আরও কয়েকজন এসে জুটেছিল সেখানে। বিদিশার কাছে কফি পানের আবেদনও জানিয়েছিল কেউ কেউ। ফলে কফির আসরে অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল আমাদের। আর কফির কাপ হাতে নিয়ে যে ভালমন্দ সরস নীরস আলাপ আলোচনা চলেছিল তার থেকে দূরে সরে থাকার উপায় ছিল

না। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক আলোচনাই কানে যাচ্ছিল আমাদের। জনা তিনেক মেয়েও ছিল আমাদের সঙ্গে। যথারীতি আমাদের রেয়াৎ না করে অবাধে চালাচ্ছিল ছেলেরা তাদের আলোচনা।

পরিতোষ তালুকদার জৈনের কথা শেষ হতে না হতেই ফোড়ন কেটেছিল।

—এইসব নিম্‌ফোম্যানিয়াক্ মেয়েদের জন্য ভারতবর্ষের ভাবমূর্তি মার খেয়ে যায়। আর লোগ্রোঁর পছন্দেরও বলিহারী! উর্বশীর তো খালি শরীরটাই আছে। গায়ের রং, মুখশ্রী কোনটাই কিছু আহামরি নয়! মঁসিয়ো আর সুন্দর মেয়ে পেল না?

শীতল যাদব প্রতিবাদ করেছিল।

—কি আশ্চর্য! মঁসিয়ো লোগ্রোঁ কি তোমার চোখে দেখবেন নাকি? উনি তো শরীরটাই চাইছেন! শরীরের সুখ চাইছেন। চাইলেই কি আর সকলের কাছে সেটা পাবেন? উর্বশীর মত সহজলভ্য মেয়েরাই আসবে ওর পা চাটতে!

আমাদের ক্লাসের মিত্রা শিকদার তার বিরক্তি প্রকাশ করল এতক্ষণে।

—এ তোমাদের বড় অন্যায়। তখন থেকে যা মন চায় বলে যাচ্ছ। পা চাটার কথা আসছে কেন?

শীতল যাদব বিদ্রূপ করেছিল।

—পা চাটা বলব না তো কি বলব? ওভাবে মঁসিয়োর সঙ্গে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। গায়ে গা ঠেকিয়ে সিনেমা দেখছে। হয়ত বা রাত্রিবাসও করছে। একে আর কি বলব বলতে পার?

—কিন্তু এত সব খবর পাচ্ছ কোথায় তোমরা? ওর পেছনে কি গোয়েন্দা লাগিয়েছ না নিজেরাই ওর পেছনে ধাওয়া করছ?

মুখে হাসি থাকলেও গলার স্বর তীক্ষ্ণ শুনিয়েছিল মিত্রার। পরিতোষ শীতলের পক্ষ নিয়েছিল।

—কেন তোমরা দেখছ না কিছু? আর গোয়েন্দা লাগাতে হবে কেন? ঘটনাস্থল কোলকাতা সহর। আমাদের চলাফেরার পথে চোখের সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা।

মিত্রা সম্মিলিত আক্রমণের ধাক্কায় চুপ করে গেল। বিদিশা এতক্ষণ কিছু বলেনি। নীরবে শুনে যাচ্ছিল। এখন সেও মুখ খুলল।

—দোষ যা কিছু সব দেখছ নিজের দেশের মেয়ের মধ্যে! কেন ঐ সাহেবের কোন দোষ নেই? উর্বশীকে নিমফোম্যানিয়াক্ বলছ। ঐ সাহেবকে কি বলবে? স্যাটিরিয়াসিক? সাহেব কেন উর্বশীর চেয়ে সুন্দর মেয়ে যোগাড় করল না সেইটাই তোমাদের কাছে আফশোষের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল? মনের দিক থেকে তোমরাই বা সাহেবের পা-চাটা কম কিসে?

সমস্বরে প্রতিবাদ করে ছেলেরা।

—কি সব মারাত্মক কথা বলছেন আমাদের সম্পর্কে?

সবাইকে চুপ করতে বলে শীতল যাদব। পরে বিদিশার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকায়!

—আপনি তো গত শনিবার 'ফ্রেশারস্ ওয়েলকাম'-এ এসেছিলেন। লক্ষ্য করেছিলেন উর্বশী কি করেছিল?

—কি করেছিল?

অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে বিদিশা নয়, মিত্রা।

—আমরা হঠাৎ দেখি লোগ্রাঁর পা টেনে নিয়েছে উর্বশী তার কোলের ওপর। জুতো নিশ্চয় আগেই খুলে রেখেছিল লোথোঁ। ঝুঁকে পড়ে কি যেন বার করার চেষ্টা করছে। মনে হয় কিছু ফুটে থাকবে পায়ে। ভাবুন একবার ব্যাপারটা। ঘরভর্তি লোকের সামনে নির্লজ্জের মত এমন পদসেবা করতে পারে যে মেয়ে তাকে পা-চাটা বলবনা তো কি বলব?

অবাক হয়ে গেলাম আমরা। আমাদের চোখে পড়েনি সেই দৃশ্য। কথাটা শুনে আমার মনে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত এক প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। দেহসচেতন নির্লজ্জ স্বভাবের উর্বশীর মধ্যে ভালবাসার এই দীনতার কথা ভাবাই যায় না। হিসাবে গরমিল দেখছি যেন!

আমরা চুপ করে যেতে ছেলেরা ভাবল আমাদের বুঝি সমুচিতভাবে মুখবন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওদের দৃষ্টিতে সেরকম মনোভাবই ব্যক্ত হতে দেখলাম যেন। অতঃপর ঐ আলোচনা ঐখানেই বন্ধ হয়ে যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু বিজয়ের আনন্দেই হয়ত একটা খোঁচা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলনা শীতল যাদব।

—অবশ্য শুধু উর্বশী মহাপাত্রকেই বা দোষ দেব কেন? আপনারা অনেকেই বোঝেননা যে ওরা আপনাদের নাচায়। ঐ নাচানোই সার। এখানে ফূর্তি টূর্তি করে পরে ধোয়া তুলসী পাতাটি হয়ে ফিরে যাবে দেশে।

মনে করছেন উর্বশীকে বিয়ে করবে লোগ্রো? কখনই না।

বিদিশা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

—ঐসব কথার মানে? উর্বশীর কি হবে তা উর্বশীই বুঝবে। তোমাদের বা আমাদের তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু আর কে নাচল সাহেবদের সঙ্গে?

আমার ভালো লাগছিল না। সীমাহীন গ্লানি, অস্বস্তি আর আশঙ্কা নিয়ে ছটফট করছিলাম আমি। রীতিমত হৃৎকম্প হচ্ছিল আমার। মিশেলের সঙ্গে সুন্দর পবিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে যে আনন্দ বহন করছিলাম তা যেন মুহূর্তের মধ্যে কালিমালিপ্ত হয়ে গেল। আত্মসংবরণ করতে পারছিলাম না। ভয়ে, লজ্জায় গ্লানিতে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম যেন।

কস্তুরী মৃগের মত নিজের অন্তরসৌরভে আমোদিত ছিলাম। আমার সেই নির্ভেজাল সুন্দর আবেগ নিয়ে এতই মত্ত ছিলাম যে অপরের চোখে তার কি চেহারা দাঁড়াবে তা ভেবেই দেখিনি। সেদিন সন্ধ্যেবেলা ক্যান্টিনের সেই কফির আসরে যবনিকা ঘটল আত্মমগ্ন মুগ্ধতার। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো যেন। বুঝলাম বাইরের পৃথিবী সজাগ তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। সুযোগ পেলেই নখদন্ত শানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর।

এখনও পর্যন্ত বহিরঙ্গ ঘটনার বিচারে লক্ষ্যনীয় কিছু ঘটেনি। তাই আশা করা যায় মুখরোচক আলোচনার খোরাক সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি আমাদের নিয়ে। কিন্তু একেবারে কিছুই অনুমান করেনি তা হয়ত বলা যায় না। শীতল যাদবের কথার মধ্যে যে খোঁচা আছে সেটা আমাকে ক্রমাগত বিঁধছিল। ও কাদের কথা বলতে চেয়েছে বোঝা গেলনা। কিন্তু আমি আর মিশেল কি একেবারেই ওদের নজরের বাইরে?

বিদিশার প্রতিক্রিয়া দেখে আমার তাই ভয় বেড়ে গেল। প্রত্যুত্তরে মুখকাটা ঠোঁটকাটা শীতল যাদব বা পরিতোষ জৈন কি বলবে ভেবে দুরু দুরু করতে লাগল বুক। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্বিগুন হয়ে উঠল যেন।

শেষ পর্যন্ত আলোচনাটা কিন্তু আর গড়াতে পারল না। হয়ত শীতল বা পরিতোষ কিছু বলত কিন্তু তার আগেই ক্যান্টিনে এসে ঢুকল একটি ছিপছিপে চেহারার অল্পবয়সী সুন্দর মেয়ে। একটা কাম্পাকোলার ফরমাশ দিয়ে বসে পড়ে সে একটা চেয়ারে। সামনে একটা কাগজ খুলে কি যেন

পড়তে থাকে।

আমার কানে গেল মধু আয়ার ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করছে জৈনকে।

—পরিতোষ! এই মেয়েটিই কি শীলা চতুর্বেদী? এর সঙ্গেই প্রেম চলছে মঁসিয়ো রিভোয়ারের?

পরিতোষ কি বলল শুনতে পেলাম না। তার আগেই উঠে পড়ল বিদিশা।

—চল মীনাক্ষী। ক্লাস সুরু হয়ে যাবে।

ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এসে কৌতূহল প্রকাশ করি আমি বিদিশার কাছে।

—ডিরেক্টারের সঙ্গে এই মেয়েটির প্রেম চলছে বলে মধু যা বলল তা কি সত্যি? কিন্তু ডিরেক্টারের তো স্ত্রীপুত্র কন্যা রয়েছে?

গভীর তিক্ততা প্রকাশ পায় বিদিশার কণ্ঠস্বরে।

—তাতে কি? ওসবে ওদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু মেয়েটার কি রুচি বল তো? মঁসিয়ো রিভোয়ার ওর বাপের বয়সী। মঁসিয়োর মেয়ে শীলার থেকেও বয়সে বড় হবে বলে মনে হয়।

আমি চুপ করে শুনে যাই। বিদিশা হয়ত সেটা আশা করেনি। ওর তিক্ততা বাঁধভাঙ্গা জলের তোড়ে ধাবিত হয় আমার দিকে।

—যাচ্ছেতাই কাণ্ড চলছে আলিঁয়সে। শিক্ষকের মর্যাদা বলে আর কিছু রইল না। ছাত্রীর সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সিনেমা দেখছে! এতটা ওরা ফ্রান্সেও পারত না। ছেলেদের শুধু দোষ দিয়ে কি হবে? এসব করলে দোষ নেই। বললেই যত দোষ?

সেদিনের সেই আলোচনায় গরলের ঝাঁজ পেয়েছিলাম। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল তা। আগুনের মত লেলিহান শিখায় আমার ভেতরে পুড়ছিল সযত্নপোষিত অনেক রোম্যান্টিক ধারণা। প্রেমের যে প্রতিমা-সৌন্দর্য কল্পনায় ছিল, অন্যের চোখে বাস্তবে তার খড়মাটির চেহারাটা কেমন দেখায় তার কোন ধারণা ছিল না।

সেদিন বারে বারে মনে হয়েছিল গ্লানি, লজ্জা, ভয়ের বেড়ি থেকে মুক্ত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আর প্রেমের পথে যদি এসব অপরিহার্য বাধা হয় তাহলে সেই প্রেম আমি চাই না এতখানি মূল্যে। নির্ভার মুক্ত জীবনের স্বাদ যদি প্রাসাদে এসে হারিয়ে ফেলি তাহলে সেই প্রাসাদে প্রয়োজন নেই আমার।

॥ সাত ॥

প্রথম সেমেস্টারের পর দ্বিতীয় সেমেস্টারও পড়েছিলাম আমি মিশেলের কাছে। সন্ধ্যেবেলা যে সময়টা বেছে নিয়েছিলাম আমরা ক্লাসের জন্য সেই সময়ের জন্য সেই ক্লাসের শিক্ষক নির্দিষ্ট ছিল মিশেল। আমি আর বিদিশা দুজনেই চাকরি করি। সকালবেলায় ক্লাস করার প্রশ্নই ওঠেনা। বিদিশা তাঁর সুবিধামত দিন বা সময় বেছে নিয়েছিল। বন্ধুর অনুরোধে আর তার সান্নিধ্যলোভে আমিও তার অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু মিশেল পর্বের ব্যাপারে প্রথম থেকেই উদ্যোগী ছিলাম না আমি।

প্রথম সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত থেকেই তাকে পছন্দ করতে সুরু করেছিলাম। কিন্তু বাড়তি কোন মনোভাবকে প্রশ্রয় দিইনি তা বলে। মিশেলের সঙ্গে আজ আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার দায় আমার একেবারেই ছিলনা প্রথমে। ব্যাপারটা যখন একটু একটু করে দানা বাঁধছিল তখন বরং শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম আমি। নানাভাবে চেষ্টা করছিলাম তাকে প্রতিহত করতে।

তবে দ্বিতীয় সেমেস্টার সুরু হবার আগেই পারস্পরিক দুর্বলতা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবু ক্লাস নির্বাচনের ব্যাপারে 'যথা নিযুক্তো-হস্মি তথা করোমি' ধরণের একটা মনোভাব আচ্ছন্ন করেছিল যেন আমাকে। ভবিতব্যের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে কৌতূহলী দর্শকের মত একটু দূরে সরে এসে দেখতে চেয়েছিলাম তার পরিণতি।

যখন দেখলাম সেবারও মিশেলই আমাদের শিক্ষক থাকছে তখন মনে হোল ভবিতব্য যেন মৃদু ঝাঁকুনিতে সচেতন করিয়ে দিতে চাইল তার নির্দেশ সম্পর্কে। এখন যখন সব কিছু বিশ্লেষণ করতে বসি তখন অবৈজ্ঞানিক একটা কথা বার বার মনে হয়। নিয়তি আমার জন্য যা নির্দিষ্ট করেছিল তাকে এড়ানো বুঝি সাধ্য ছিল না আমার।

সেই নিয়তি তার ইচ্ছামত সমস্ত রকম পরিস্থিতি এমনভাবে বিন্যস্ত করেছিল যে দুয়ে দুয়ে চারের মত নির্ভুল যোগফলে মিলে গিয়েছিল অঙ্কটা। শুধুমাত্র ক্লাসঘরে আবদ্ধ থাকলে হয়ত অনেক কিছু ঘটতনা। কিন্তু নতুন যে ডিরেক্টার এসেছিলেন তার উৎসাহে ফরাসী চর্চার নতুন কতগুলো দিকের সূচনা হোলো। স্থাপিত হোলো থিয়েটার গ্রুপ।

যোগ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের তালিমে উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বিখ্যাত ফরাসী নাটকগুলির নিয়মিতভাবে মহড়া চলতে লাগল। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে জনসমক্ষে প্রদর্শিত হতে লাগল সেগুলি। তার সঙ্গে আবৃত্তি, সাহিত্য রচনা, ফরাসী সঙ্গীতের শিক্ষাদান ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়াসের ফলশ্রুতি দেখা গেল অচিরেই। পাঠ্যসীমার মধ্যে ফরাসী চর্চাকে আবদ্ধ না রেখে তাকে এভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে দেওয়ায় নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো যেন। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সখ্য ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠল।

মিশেল ছিল ঐসব ব্যাপারে অত্যুৎসাহী। অক্লান্ত প্রয়াসে তালিম দিত সে ছাত্রছাত্রীদের। প্রয়োজনবোধে শিক্ষকদেরও। এরকম উপলক্ষেই আমার প্রতি তার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল লোকচক্ষে।

স্কুল কলেজে আমি কোনদিন অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিনি। অভিনয় করা দূরে থাক্ নাটক পড়তেও আমার ভাল লাগতনা তেমন। থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে জড়িত থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিলনা আমার। একরকম জোর করেই আমাকে যুক্ত করে দিল মিশেল সেই সবের সঙ্গে। তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। অথচ আমার চেহারা, ফরাসী উচ্চারণ, ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি কোনটাই উল্লেখযোগ্য মানের ছিল না।

রাসিনের একাধিক নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করলাম আমি। 'বেরেনিস'-এ বেরেনিসের ভূমিকায়, ফেড্রাতে ফেড্রার ভূমিকায়। মিশেল স্বয়ং আমার বিপরীতে মুখ্য পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করল। মিশেলের তালিম পেয়ে ভাল অভিনয় করেছিলাম আমি। অনেকেই প্রশংসা করেছিল। আর মিশেলের অভিনয়প্রতিভার তো তুলনাই ছিল না।

অনেক পরে মিশেল আমাকে বলেছিল যে আমি ওর বিপরীতে অভিনয় করেছিলাম বলে অনেক বেশি উৎসাহ নিয়ে অভিনয় করেছিল ও। আমার নিজেরও মনে হোত সেকথা।

অভিনয়ের প্রয়োজনে যখন সে আমায় স্পর্শ করত তখন তার উষ্ণ আবেগ আমার শরীরেও সঞ্চারিত করত নিবিড় এক উত্তাপ। অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠত আমার শরীর, মন, চেতনা।

মিশেলের কথা জানি না। কিন্তু আমার নিজের খুব অসুবিধা হতো আত্মসংযম বজায় রেখে অভিনয় চালিয়ে যেতে। অভিনয়ের জন্য কতখানি আত্মসংযমের প্রয়োজন হয় তা এমন করে বুঝিনি আগে। ব্যক্তিগত

অনুভূতিকে যে একটা নির্দিষ্ট মাপে ও মাত্রায় ওভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় তা জানা ছিল না।

আমার দিকে তাকিয়ে আবেগকম্পিত স্বরে মিশেল যখন ব্যক্ত করত তার অনুভূতি তখন আমার অভিনয় করার কথা মনে থাকত না। আমার চেতনার গভীরে ভালবাসার যে বুভুক্ষা ছিল তা উদ্দীপিত হতে চাইত। জোর করে তাকে দাবিয়ে রেখে নকল সুরে নকল ভাষায় অনুসরণ করতে হোত অভিনয়ের রীতি কৌশল।

আমি যে পারিবারিক আবহাওয়ায় বড় হয়েছি সেখানে অভিনয়কে উচ্চ-মানের শিল্প বলে মনে করা হোত না। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্পর্কে উৎসাহ বা কৌতূহল দেখানো ছিল গুরুতর অপরাধ। আমি যখন অনেক বলে কয়ে মাকে জ্যাঠাইমাকে রাজী করিয়েছিলাম তখন সবকিছু খোলসা করে বলিনি।

জ্যাঠামশাই আর বাবার কাছে অনুমতি চাওয়ার সাহস হয়নি। তাদের তাই অজানা ছিল আমার সেই প্রচেষ্টার কথা। পেশাদার অভিনয় নয় এটা আর—শখের অভিনয়ে কোন দোষ নেই, লোকে কিছুই বলবে না এসব নানা যুক্তি দেখিয়ে নিমরাজী করিয়েছিলাম মাকে, জ্যাঠাইমাকে। আমার বাড়ি থেকে উৎসাহের অভাবে কেউ সে অভিনয় দেখতে আসেনি। আমার বিপরীতে মিশেলকে অভিনয় করতে দেখলে অনেক কিছু ভেবে নিত আমার বাড়ির লোক। আর অভিনয় করা কেন আলিঁয়সে এসে ফরাসী ক্লাস করাও আমার বন্ধ হয়ে যেত কবে।

আমার বাড়ির কেউ না জানুক—আমরা ধরা পড়ে গিয়েছিলাম আলিঁয়সের ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের চোখে। হয়ত মিশেল নিজে সাবধানী বা কৌশলী হলে ব্যাপারটা অতটা স্পষ্ট হোত না। কিন্তু দিনে দিনে সে যেন খানিকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। গ্রাহ্য করছিল না অনেক কিছুই। তবে শোভনতার গণ্ডি সে ছাড়িয়ে যায়নি কোনদিন। পরে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম এ সম্পর্কে।

স্বভাবতই অবিচলিত গাম্ভীর্য বজায় রেখে জবাব দিয়েছিল সে।

—তোমার সঙ্গে আমি শুধু অভিনয়ই করিনি মীনাক্‌শি। আমার মনের ইচ্ছা আর আবেগকেও তৃপ্ত করেছি সঙ্গে সঙ্গে। ঐসব চরিত্রের কথা আমারও কথা ছিল। বাড়তি ইচ্ছা আর আবেগ অবশ্য ছেঁটে বাদ দিতে

হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল ওটাই একমাত্র পন্থা। তুমি এত চাপা স্বভাবের না হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। কিন্তু আমি যখন দেখলাম কিছুতেই তুমি তোমার খোলসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে না তখন আমাকে বেপরোয়া হতে হোল। অন্যরা কে কি ভাববে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোমাকে নির্বাচিত করেছি নাটকের মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী হিসাবে। আমার ধারণা আমাদের সম্পর্কের অনেক অস্পষ্টতা কেটে গেছে সেভাবেই।

আমি প্রতিবাদ করেছি।

—তা হয়ত কেটেছে কিছুটা। কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্যখানে। অন্যের চোখেও ধরা পড়ে গেছি আমরা তখন থেকে। অনেক কানাঘুঁষো হয়েছে তা নিয়ে। আমার খুব ভাল লাগেনি সেসব কথা। কেমন যেন গ্লানিবোধ করেছি। আমার নিজেরও মনে হয়েছে আমাকে তোমার বিপরীতে মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী হিসাবে নির্বাচন করে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছ তুমি।

মিশেল কিন্তু নস্যাৎ করে দিয়েছে আমার সব অভিযোগ বিপরীত যুক্তি দেখিয়ে।

—যা সত্যি তা কি ধরা না পড়ে? আর আমি তো চাইনি সেটা গোপন করে রাখতে। আমার মনে কোনরকম গ্লানিবোধ ছিল না তার জন্য। হয়ত তোমার ব্যাখ্যা অন্যরকম। আর পক্ষপাতিত্বের কথা যা বলছ তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু আমাদের এখানে শখের অভিনয় হয়েছে। অর্থ বা খ্যাতির প্রশ্ন জড়িত থাকলে হয়ত সে অভিযোগ খাটত। তা যখন ছিল না তখন কারুর প্রতি কোনরকম অন্যায় করেছি বলে মনে করিনা আমি। আমার বিবেক একেবারে পরিষ্কার সে বিষয়ে।

একটু পরে হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেছে।

—এমন কাউকে দেখেছ কি যে তোমার ভূমিকায় অভিনয় করতে চেয়েছে? আর তার সুযোগ পায়নি বলে হতাশ হয়ে আমার বিরুদ্ধে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছে?

আমিও হেসেছি।

—তা দেখিনি। কিন্তু আমার কাছে এসে তারা অভিযোগ জানাবে নাকি? আমিও তো আসামী একজন! তবে কাউকে কাউকে দেখে বা তাদের আলোচনা শুনে আমার বেশ মনে হয়েছে তারা খুব ভাল চোখে

দেখেনি এটা।

—আচ্ছা মীনাক্‌শি বলো তো তাদের সঙ্গে যদি অভিনয় করতাম তাহলে কি ফুটিয়ে তুলতাম ঠিকমত আমার অভিনীত চরিত্র? দর্শকরা বঞ্চিত হোতো!

—তা সত্যি। দর্শকদের কথা ভেবেই সবকিছু করেছ তুমি! কত বড় দর্শকদরদী শিল্পী!

সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে নেই। শুধু মনে আছে কোন প্রসঙ্গেই এঁটে উঠতাম না তার সঙ্গে। অনেক সময়েই তার সঙ্গে মতভেদ হতো আমার। কিন্তু আলোচনায় তার সঙ্গে পেরে ওঠা দায় ছিল।

আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আমার মত তার মনে কোন গ্লানিবোধ ছিল না। আমার মত দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোদুল্যমান হতে দেখিনি তাই তাকে কোনদিন। অতখানি ঋজুতা সে কি করে অর্জন করেছিল ভেবে পেতামনা আমি। ভেবে পেতাম না সেটি তার ফরাসী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার না তার নিজস্ব ধ্যানধারণার ফলশ্রুতি।

এই সময়টা উথালপাথাল কষ্টে কেটেছে আমার। মিশেলের ব্যবহারে ঔৎসুক্যে কিংবা তৃতীয় পক্ষের পরোক্ষ ইঙ্গিতে তার মনোভাব অনুমান করতাম। কিন্তু যেভাবে সংশয় অপসারিত হয় তার কোন সম্ভাবনা দেখছিলাম না। শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে থাকার যে কী যন্ত্রণা তা জীবনে সেই প্রথম টের পেয়েছিলাম।

অভিনয়ে পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ নৈকট্যে আসতাম। অভিনয়শেষে আবার সেই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হোত। আর অভিনয়ের কষ্টও তো কম ছিল না। আমার মনে হোত ধর্ষকামী কোন মানুষের মত আমাকে একটু একটু করে কষ্ট দিচ্ছে সে। অভিনয়ের সুযোগে আমার মধ্যে তীব্র আবেগ সঞ্চারিত করছে। আবার অভিনয়শেষে শিক্ষকের দূরত্বে সরে গিয়ে আমার মর্মবেদনা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

তত্তদিনে নিজের মনের দুর্বলতা আর অস্পষ্ট ছিল না আমার কাছে। কিন্তু যার জন্য আমার সেই নির্লজ্জ দুর্বলতা তাকে যেন ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কাছে সেই কষ্ট প্রকাশ করে যে মনের ভার লাঘব করব তারও উপায় ছিল না। বিদিশা এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষ। মন খুলে তাকে এসব কথা বলা যাবে না। হয়ত আমার

হিতকামনায় সচেষ্ট হয়ে বাড়িতে জানিয়ে দেবে। তার ফলাফল কী হবে তা ভাবতেও হৃৎকম্প হোত।

নিজের মধ্যে নিজের কষ্ট বহন করে গুমরে গুমরে মরেছি। একদিকে সংশয়, অন্যদিকে তার বিষময় পরিণতির চিন্তা ইঁদুরের মত কুরে কুরে খাচ্ছিল আমার সুখ, শান্তি, আনন্দ।

দুটি বিপরীত অনুভূতির টানাপোড়েন চলছিল আমার মধ্যে। ক্লাসঘরে মিশেলের সান্নিধ্যে বা তার কথাবার্তা শুনে যে তীব্র ভীষণ আনন্দ উপচে পড়ত মনে তা ক্লাসঘরের বাইরে কিংবা আমার নির্জন শয্যার অন্ধকারের মধ্যে চরম অবসাদের মধ্যে শেষ হতো। অন্ধকার ঘরে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতাম মোহের এই বন্ধন জড়ানো কেন? নিজেই জবাব দিতাম 'দ্রুত ছিন্ন করো এই শৃঙ্খল। স্বাধীন মুক্ত মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে হাসো, খেলো, বাঁচো।'

মনে মনে সংকল্প নিতে বাধা ছিলনা। কিন্তু সেই সঙ্কল্প ভঙ্গ হতেও আবার দেরি হতোনা। মিশেলকে দেখলেই, তার কণ্ঠস্বর কানে গেলেই বিচিত্র এক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সুরু হতো মনে। আনন্দে, উল্লাসে, হর্ষে, শিহরণে অস্থির হয়ে উঠত মন। উন্মুখ প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিদিন উপস্থিত হতাম আমি আলিঁয়সে।

ভোরবেলায় শয্যাত্যাগের সময়ই মনে হোত কিছু একটা ঘটবে। আমার গতানুগতিক জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে যা। সেই প্রত্যাশা থরথর করে কাঁপত। আমাকে কাঁপাতও আবার তা সারাদিন ধরে। সন্ধ্যাবেলায় আলিঁয়সের সিঁড়িতে পা দিয়ে তা বিস্ফোরণের শক্তিতে ফেটে পড়তে চাইত।

ক্লাসে গিয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে যেত আবার সেটা। তারপর রুটিনের ছকেবাঁধা কাঠামোর মধ্যে বিকিরীত হতে হতে ওজন হারিয়ে ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে নিস্তেজ নির্জ্জীব হয়ে যেত। নতুন কিছু ঘটতনা।

তবু মিশেলের দৃষ্টি, তার নৈকট্য, তার কণ্ঠস্বরের রেশ কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যেত না। ভূতগ্রস্তের মত তার প্রবল প্রচণ্ড চাপ বহন করে ফিরে আসতাম বাড়ি। প্রত্যাশার পরিমাপে তার ওজন হয়ে যেত ঠুনকো গৌণ। চরম এক বিষাদ ঘনিয়ে আসত অবধারিত নিয়মে।

কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও দিনে দিনে যে মোহের বলয় তৈরি হয়েছিল

তা আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল একটু একটু করে। মিশেলের সঙ্গে অভিনয়ের স্মৃতি আমাকে ততোধিক উত্যক্ত করত। শুধু যেন অভিনয় বলে মনে হোতনা তা। অথচ দিনের পর দিন আসছে যাচ্ছে। গতানুগতিক জীবন চলেছে আগের মত নিস্তরঙ্গ ঘটনাহীন অবস্থায়।

কিন্তু আকর্ষণ বিকর্ষণের সে কি উত্তাল প্রবাহে ভেসে যাওয়া আমার! আকর্ষণের তীব্র ভীষণ উন্মাদনা নিঃশেষ হবার নয়। অপর পক্ষের সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারে তা যেন দ্বিগুণ রোষে উদ্গত হতে চাইত!

সঙ্গে সঙ্গে তার পরিণতির কথা চিন্তা করে শিউরে উঠত মন। দিদির ওপর নির্যাতনের স্মৃতি এত সহজে অবলুপ্ত হবার নয়! আমার অদৃষ্টে ততোধিক দুঃখ তোলা আছে নিশ্চয়! সেকথা ভাবলেই কুয়াশার মত মিলিয়ে যেত আকর্ষণ। ঝলকে ঝলকে বিষ উদ্গিরণ করত বিষধর সর্পের মত কুটিল এক বিতৃষ্ণা।

এমন একজনও ছিলনা যার কাছে নামাতে পারতাম সেই বিষের বোঝা। না আমার পরিবারে। না আমার বন্ধুবান্ধবের পরিধিতে। একমাত্র বিদিশাকেই বলা যেত। অপরের কাছে বলতে গেলে ঝঞ্ঝাট হতো। শত প্রশ্ন শত কৌতূহল নিবৃত্তির দায় বহন করতে হোত। শত রসনা মুখর হয়ে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলত।

এই সময়টা কালের পরিমাপে যতনা দীর্ঘ ততোধিক দীর্ঘ মনে হয়েছিল মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতের তীব্রতায়। মন জানাজানির যে চিরাচরিত পন্থা আছে তা থেকে তখনও ছিলাম আমরা শত হস্ত যোজন দূরে। মিশেল আমাকে মুখ ফুটে একটিও অনুরাগের কথা বলেনি। কিন্তু তবু বাইরের পৃথিবী অনেক কিছু অনুমান করে নিল।

পরপর কয়েকটা নাটকে মঁসিয়ো বেরতাঁর বিপরীতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করে অনেকের বিরূপভাজন হয়ে পড়েছিলাম আমি। বিদিশার কাছে শুনেছি অনেকেই সেটা নিয়ে নানারকমের বিরূপ মন্তব্য করেছে। আমাদের দুজনের মধ্যে গোপন কোন সরস সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফেলেছে। মিশেলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের দোষ খুঁজে পেয়েছে।

স্বকর্ণে তেমন কিছু শুনিনি বলে তার ঝাঁজ আমাকে ততটা লাগে নি। আগে উর্বশী মহাপাত্র কিংবা শীলা চতুর্বেদীকে নিয়ে ওরা যখন কুৎসামূলক আলোচনা করেছিল তখন মানসিক দিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলাম না বলে তেমন

তীব্র অশান্তি টের পাইনি। আর আমার নিজের মনেও উর্বশীদের নিয়ে কিছুটা বিরূপতা ছিল বৈকি! কিন্তু নিজের সম্পর্কে যেদিন ওদের ক্ষুরধার রসনা নির্মম হয়ে উঠতে দেখলাম সেদিন যেন চাবুকের মার খেলাম।

আলিঁয়সে ফিল্ম প্রদর্শনীর মরসুম চলছিল তখন। কিছুদিন আগে পরলোকগত এক বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তৎপরিচালিত বিখ্যাত বিখ্যাত ফিল্মগুলি দেখানো হচ্ছিল আলিঁয়সের প্রেক্ষাগৃহে। বিদিশার অত্যন্ত প্রিয় সেই পরিচালক। পরপর কয়েকদিন আমরা একসঙ্গে কয়েকটি ছবি দেখেছি।

সেদিনও সেরকম উপলক্ষে আলিঁয়সে উপস্থিত হয়ে দেখি ও এসে পৌঁছয়নি তখনও। কি একটা পর্ব উপলক্ষে স্কুল ছুটি ছিল আমার। যথাসময়ের বেশ খানিকটা আগেই এসে পৌঁছেছিলাম আলিঁয়সে।

প্রেক্ষাগৃহের সামনে করিডরে বসার ব্যবস্থা ছিল। একটি সোফায় বসে অপেক্ষা করছিলাম আমি বিদিশার জন্য। ইত্যবসরে আমাদের সেমেস্টারের কয়েকজনের সঙ্গে পরিতোষ জৈন, শীতল যাদব, স্বপ্না সোমেরা এসে উপস্থিত হলো সেখানে। ওদের অনেকেই ছিল নিয়মিত দর্শক। এর আগেও যখনই ফিল্ম দেখতে উপস্থিত হয়েছি তখনও ওদের কাউকে কাউকে উপস্থিত থাকতে দেখেছি। বেশির ভাগ সময়ই দল বেঁধে আসত ওরা।

আলিঁয়সে ফরাসী ভাষার ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন আছে। সাংস্কৃতিক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেই সংস্থার পক্ষ থেকে। এছাড়াও পিক্‌নিক, নৌকাবিহার ইত্যাদি আমোদপ্রমোদমূলক নানা ব্যবস্থার আয়োজনও করা হয়ে থাকে মাঝে মাঝেই। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপন মূল উদ্দেশ্য এই সংগঠনের। এই সংস্থার কর্ণধারদের অনেককেই নামে না চিনলেও চেহারায় চিনি।

যে কোন সময়েই কাউকে না কাউকে দেখা যাবেই আলিঁয়সের মধ্যে বা তার আশেপাশে কোথায়ও। শীতল যাদব, পরাশর জৈনরা কোন না কোন ভাবে জড়িত এই সংস্থার সঙ্গে। শিক্ষক থেকে সুরু করে ক্যাশিয়ার, পিয়ন ও অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গেও এদের দহরম মহরম দেখবার মত। একে অপরকে দেখলেই বঁসোয়া বঁজুর নয়ত সা ভা বলে কুশল প্রশ্ন সারত। ভালমন্দ মিলিয়ে কিছুটা পারিবারিক সম্পর্কের মত বাঁধা ছিল এরা পস্পরের সঙ্গে। পরিবারের কোন বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানেও নিমন্ত্রিত হতো

আলিঁয়সের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী বা পিয়নেরা। তবে একটা বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই সম্পর্ক।

আমি বা বিদিশা কেউই এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। তবে কোন কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি মাত্র। কিংবা চেনা পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হলে সৌজন্যমূলক কুশল প্রশ্নের আদান-প্রদান করেছি।

আলিঁয়সের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সীমিত ছিল এসবের মধ্যেই। শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কিংবা তাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার মানসিকতা আমার বা বিদিশার কারুরই ছিল না। আমাদের সম্পর্কটা ছিল অনেকটা ওপর ওপর। খুব গভীরে পৌঁছয়নি তা। সেজন্যই আলিঁয়সকে কেন্দ্র করে যে বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটত তার কোন খবরাখবর রাখতামনা আমরা। তবে মাঝে মাঝে ক্যান্টিনে পিটারের কাছে চা, কফি বা কোল্ড ড্রিঙ্কের জন্য হাজির হলে কানে আসত আমাদের ভালমন্দ অনেক খবর। অন্য কোন উপলক্ষেও কানে এসে পৌঁছত কোন বিশেষ ঘটনা বা খবরের কথা।

তবে ক্যান্টিনে অনেক সময়েই চুটিয়ে আড্ডা মারত ছেলেরা। কখনও কখনও দু' একটি মেয়ে এসেও যোগ দিত সরগরম সেই আসরে। চা কফি বা, কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে মৌজ করে বসে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কোন চিত্র প্রদর্শনী বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা চালাত ছেলেরা। ক্লাস সুরু হওয়ার আগে কিংবা ক্লাস চলাকালেই ফাঁকি দিয়ে।

মুখরোচক চাটনীর মত তার সঙ্গে আলোচনা চলত কোন মন্ত্রীর সঙ্গে বিখ্যাত কোন মহিলার সম্পর্ক কিংবা আলিঁয়সেরই প্রাক্তন বা বর্তমান কোন শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রীর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে। এইসব ছেলেদের অনেকে আবার দীর্ঘদিন ধরে আলিঁয়সের সঙ্গে যুক্ত। অনেকের পাঠপর্ব শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। তবুও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছে বলে আড্ডার লোভে কিংবা অন্য প্রয়োজনে এসে উপস্থিত হয় এঁরা নিয়মিতভাবে সেই আসরে।

শিক্ষকদের বাড়িতে যাতায়াত আছে এদের অনেকেরই। কোন শিক্ষকের বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ণের জন্য কত ভাল মদ্যের সংগ্রহ আছে তা ওদের নখদর্পণে। কে কবে চুটিয়ে তা আস্বাদ করেছে কত রাত পর্যন্ত সে সব বলতে আনন্দ বোধ করে কেউ কেউ।

আমরা যারা নবাগত তাদের কাছে বিচিত্র সব কাহিনী সাজিয়ে

পরিবেশন করত এঁরা। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শোনা না শোনা অনেক ঘটনা জানা হয়ে যেত। ছয় বছর আগে কোন এক মঁসিয়ো শার্লোর সঙ্গে কোন কায়দাবাজ উর্মিলা খাস্তগীরের বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের পর ফ্রান্সে গিয়ে এক বছরের মধ্যে আবার তাদের ডিভোর্সও হয়ে গিয়েছিল সে কাহিনী আমরা অনেকেই জানতাম। কোন এক মহাদেব সোম অফিসের কাজে ফ্রান্সে গিয়েছিল। প্যারিসের রাজপথে উর্মিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার।

কথাপ্রসঙ্গে মঁসিয়ো শার্লোর কথা জিজ্ঞাসা করে বোকা বনে গিয়েছিল নাকি সে। গ্রাম্য মেয়ের মত দাঁত কিড়মিড় করে কায়দাবাজ জীন্‌স্‌ পরা উর্মিলা বলেছিল—'দ্যাট ব্লাডি বাষ্টার্ড। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই এখন। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের।'

অথচ সেই উর্মিলা যখন শার্লোর কাছে ক্লাস করত তখন তাকে পটানোর জন্য নাকি কম চেষ্টা করেনি। যত রকমে দেহকে প্রকট করা যায় তেমন সব আঁটো পোশাক পরে কারণে অকারণে শার্লোর প্রায় বক্ষলগ্ন হয়ে থাকত। মহাদেব সোম সহপাঠী ছিল উর্মিলার। ও শুনেছে উর্মিলা নাকি মাঝে মাঝেই মঁসিয়ো শার্লোর রিচি রোডের বাড়িতে রাত্রিবাস করত। ওরকম একটি ঘটনার পর উর্মিলার বাবা এসে ডিরেক্টারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তার পরে পরেই বিয়ে হয়েছিল ওদের। বিয়ের আগে যে উর্মিলার কাছে শার্লো ছিল চোখের মণি, কথায় কথায় শার্লোর উল্লেখ করত যে 'হি ইজ্‌ সো সুইট', 'ওঃ আই অ্যাম ডাইং ফর দ্যাট্‌ সুইট্‌ চ্যাপ্‌' সে যখন বিয়ের পর 'দ্যাট ড্যাম্‌ড, ব্লাডি বাষ্টার্ড' বলে শার্লোর উল্লেখ করল তখন সেটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল মহাদেবের।

কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর আরও অনেক ঘটনা কানে আসত এরকম সব আসরে। একবার একটা পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছিল চন্দননগরে কোন এক বাগান বাড়িতে। সেখানে জনৈক মিঃ মুখার্জীর কথা শুনেছিলাম আমরা। ভদ্রলোক শুধু শিক্ষকই ছিলেন না। আলিঁয়সের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের তত্ত্বাবধানও করতেন। শোনা গিয়েছিল বিরাট অঙ্কের টাকা তছরুপ করে পদত্যাগ করেছিলেন ভদ্রলোক।

এসব ঘটনা বা কেচ্ছা কতদূর সত্য তা যাচাই করার উপায় ছিলনা। আমাদের কানে আসত। শুনে যেতাম আমরা। আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হতো। আমার চেনা জগতের বাইরে যে আজব দুনিয়া

রয়েছে তার ছবিটা কেমন হকচকিয়ে দিত। শুধু তাই নয়। আমার মনে হোত ফ্রান্সের সংস্কৃতিকে জানবার জন্য যারা এখানে বসে ভীড় করেছে তারা অসার বিশ্রী কতগুলো কেচ্ছার কথা এভাবে চুটিয়ে আলোচনা করে কি আনন্দ পায় ?

অধিকাংশই সমাজের তথাকথিত উঁচুতলা থেকে এসেছে। উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। কাজেই এঁদের মধ্যে যারা এইসব নিয়ে আলোচনা করত তাদের কথা ভেবে আমার ভারী আশ্চর্য লাগত।

অবশ্য সম্প্রতি তার সঙ্গে একটা বিশেষ কারণ যুক্ত হয়েছিল। আমার নিজের দুর্বলতার জন্য আমি নিজেই যেন সঙ্কোচে গুটিয়ে থাকতাম। উঠতে বসতে কেমন ভয় আর অস্বস্তি পেয়ে বসত আমাকে। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক সময় সংশয়ও দেখা দিত। মিথ্যার পরিমাপ নিয়ে ভাবতে বসতাম। আমাকে নিয়েও ওরা কি ধরনের আলোচনা করবে ভেবে বুক দুরুদুরু করত

আমাকে দেখে হৈ হৈ করে এগিয়ে এল ওরা।

—কি ব্যাপার ? প্রতীক্ষারতা কার জন্য ?

আমাদের সেমেস্টারের নিরঞ্জন হালদার প্রশ্ন করে।

আমি জবাব দেওয়ার আগেই তড়িঘড়ি জবাব আসে শীতল যাদবের কাছে থেকে।

—মঁসিয়ো বেরঁতার জন্য নিশ্চয়! কিন্তু মাদমোয়াজেল! মঁসিয়ো বেরঁতাকে এখন কুক্ষীগত করে রেখেছে আমাদের উর্বশী মহাপাত্র। দেখে এলাম মঁসিয়োর ঘরে এখন আড্ডা দিচ্ছে সে।

—সে কি ? মঁসিয়ো লোগ্রোঁর কি হোল ?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সুরেশ জৈন। আমার মত সেও অবাক হয়ে যায় কথাটা শুনে।

—সে কি তোমরা জাননা ? মঁসিয়ো লোগ্রোঁর সঙ্গে এখন আর উর্বশীর বোধহয় তেমন বনিবনা হচ্ছে না।

—এ খবর উদ্ধার করলে কার কাছে থেকে ?

ততোধিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সুরেশ শীতলকে।

—উদ্ধার করতে হবে কেন ? নিজের চোখেই দেখছি। আজকাল আর দুজনকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছেনা।

—কী আশ্চর্য! মাস খানিক আগেই লিণ্ডসে স্ট্রীটে দুজনকে গাড়ি থেকে নেমে একটা দোকানের দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছিলাম। গায়ে গা ঠেকিয়ে হাঁটছিল দুজনে।

পরিতোষ বলে কথাটা।

—তার পরে মনে হয় গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। কারণ ইদানীং আর দুজনকে একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছে না কেউ।

—তাই দেখেই অনুমান করে নিলে ওদের মধ্যে বনিবনা নেই?

আরেকটি ছেলে বলে।

—'ধূমাৎ অগ্নি বলে' একটা কথা কাছে জান তো?

চুপচাপ বসে ওদের কথা শুনছিলাম। এসব আলোচনায় কোনদিনই পারদর্শী নই আমি। তাছাড়া ছেলেদের সঙ্গে প্রেম, ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেও সঙ্কোচ হয় আমার। আমি যেরকম পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়েছি সেখানে বরাবর একটা অলিখিত সীমারেখা মেনে চলতে হয়েছে। বাবা, জ্যাঠামশাই কিংবা দাদাদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই খোলাখুলি আলোচনা করতে অভ্যস্ত নই আমরা। এখনও পর্যন্ত সে ব্যাপারে আড়ষ্টতা কমেনি আমার।

আমাদের বাড়িতে দিদি প্রথম এই সীমারেখা লঙ্ঘন করেছিল। তবে সেটা মরীয়া হয়ে। সব কিছু জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর। অন্য কোন উপায় না দেখে।

ছেলেদের আলোচনায় অংশগ্রহণ না করলেও তীব্র এক কষ্টে ছটফট করছিলাম আমি! নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য বজায় রাখতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম কি নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছে উর্বশীর সঙ্গে লোগ্রোঁর? আর মিশেলের রুচিই বা এতটা নিম্নগামী হল কি করে? দেহসর্বস্ব একটা মেয়েকে আমল দিচ্ছে কেন সে?

অবুঝ রোষে বারবার মিশেলের উদ্দেশ্যে বলছিলাম আমি—'বিশ্বাস-ঘাতক। ফ্লার্ট! কপটাচারী!' সূক্ষ্ম একটা অপমানের জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছিল একটু একটু করে। মনে হচ্ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে ওরা এসব কথা শোনাচ্ছে। মিশেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনুমান করে নিয়েছে ওরা। ওরা বলতে চাইছে আমাকে এখন হটিয়ে দিয়ে উর্বশীকে নিয়ে পড়েছে মিশেল।

বিদিশার ওপরও রাগ হচ্ছিল। আমাকে আসতে বলে নিজেই গরহাজির হোলো। 'ফিল্ম শো' শিগগিরই সুরু হবে। আর মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকে যাব ঠিক করি।

আমার কোন কিছু ভাল লাগছিল না। ছেলেরা এটাসেটা কত কিছু বলছিল। আমার কানে তার কোন কিছুই আসছিল না। সকলকেই অসহ্য লাগছিল। পুরুষ জাতির লঘুতা ও চপলতার নিদর্শন দেখে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছিল মন। হঠাৎ মিশেলের নামোল্লেখে চমকে উঠি।

—উর্বশী হয়ত লোগ্রোঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে ভাব জমাবার চেষ্টা করছে মিশেলের সঙ্গে। তবে বেশিদিন চলবে না এ জিনিষ। উর্বশীর মত মেয়েকে মঁসিয়ো বেরঁতার বেশিদিন ভাল লাগবে না।

—আরে ওরা কি আর সত্যি সত্যি প্রেমে পড়ে নাকি? দায় পড়ে গেছে ওদের প্রেমে পড়তে। বোকা মেয়েগুলোকে নাচায় ওরা।

জৈন বলে কথাটা।

—তা ঠিক। মেয়েগুলোও নাচে কেমন দেখেছ তো? বড় ছোট সবাই। ছোট ছোট মেয়েদের তবু ক্ষমা করা যায়। কিন্তু যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে এমন মেয়েগুলোও যখন ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধেই ধেই করে তখন আর সহ্য হয় না।

উদ্দেশ্যপূর্ণ মনে হয় তাপস সিংহের কথাটা। আমি উঠে পড়ি ত্বরিতে। এরপর হয়ত স্পষ্ট করে আরও কত কি বলবে। সম্মুখ সমরে টেঁকা দায় হবে। তার চেয়ে আগেভাগেই স্থানত্যাগ করা শ্রেয়।

তাপস সিংহ আমাদের সেমেস্টারের ছাত্র। প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে খুব আলাপ করতে চাইত। দু'একবার বাইরে গিয়ে চা খাবার আমন্ত্রণও জানিয়েছে। ব্যস্ততার অছিলায় আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি। লক্ষ্য করেছি যখনই আমার সঙ্গে কথা বলে মিশেল কেমন বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দেখে তখন আমাদের দুজনকে।

বিদিশার কাছেও শুনেছি মিশেলের বিপরীতে মুখ্য নারীচরিত্রে পরপর অভিনয় করেছি দেখে কটু মন্তব্য করেছে ও। বলেছে একজনকেই বারবার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেওয়াটা দৃষ্টিকটু হচ্ছে। অনেকেই নাকি নানারকম কথা বলছে তা নিয়ে। বিদিশা জবাবে বলেছিল অনেকে কি বলছে তা নিয়ে ওর মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু ও নিজে কি বলতে

চাইছে, সেটা বলুক। বিদিশার ঝাঁঝালো জবাব শুনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও। পরে আর সে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেনি।

আমার মনে হোল গায়ের ঝাল মিটাতে চাইছে ও এই সুযোগে। অগ্রাহ্য করাটাই এখন মোক্ষম পথ। বিদিশা উপস্থিত থাকলে লাগসই জবাব দিত। ওর জিহ্বায় বাগ্‌দেবীর সদা অধিষ্ঠান।

প্রেক্ষাগৃহের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েছি এমন সময় আমার চোখে পড়ে মিশেল দাঁড়িয়ে আছে ওপাশের দরজার কাছে। উর্বশীর সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরে গেল ওর। অপমানের জ্বালা নিয়েও দুঃখের বোঝা নিয়েও সেই হাসিতে কোন মালিন্য বা কপটতা খুঁজে পেলাম না।

তবু ওর হাসির প্রত্যুত্তর দিতে ইচ্ছা হোল না। একটু এগিয়ে গিয়ে সোজা ওপাশের দরজা দিয়ে পেছনের আসনের দিকে এগিয়ে যাই।

তীরের মত বিদ্ধ করে সেইসময় ওদের মন্তব্য।

—ওর সঙ্গে মিশেলের একটা ব্যাপার চলছিল না?—একজন প্রশ্ন করে।

—তাইতো জানতাম। এখন তো দেখছি উর্বশী লোগ্রেঁাকে ছেড়ে ওর পিছনে ধাওয়া করেছে।

—উর্বশীকে মিশেল পাত্তা দেবে না। ও অন্য ধাতু দিয়ে গড়া।

—ওদের ব্যাপার তো! কিছু বলা যায় না। কখন কাকে ধরে আর কাকে ছাড়ে সবই হেঁয়ালি মনে হয় আমাদের। আর মাদমোয়াজেল সেনকেই বা পছন্দ হোল কি করে? চেহারা কিছু সুন্দর নয়! বয়সেও মঁসিয়োর চেয়ে বেশ খানিকটা বড়ই হবে!

জবাবে কে কি বলল কানে গেল না। আমার কানে জ্বলন্ত সীসা ঢেলে দিল যেন ওরা। দুর্বিষহ বিষের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঢুকে গেলাম আমি অডিটোরিয়ামে। কথাগুলো ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে না অনিচ্ছাকৃতভাবে জোরে বলে ফেলেছে বুঝলাম না। তবে যেভাবেই বলুক খুবই পরিতাপের বিষয়। বাহ্যতঃ এখনও পর্যন্ত এমন কিছু করিনি যাতে ওদের এই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে পারি।

এখনও পর্যন্ত নিয়মমাফিক সম্পর্কের বাইরে যাইনি আমরা। ক্লাসঘরে, লাইব্রেরিতে কিংবা নাটকের জন্য যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত এই সম্পর্কের সীমা। এই চৌহদ্দির মধ্যে আবেগ উচ্ছ্বাস

যন্ত্রণাবিজড়িত মানসিক ঘাত প্রতিঘাতের খবর বাইরের পৃথিবীর কারুর জানার কথা নয়।

আমার মনে হর্ষ-বিষাদ উল্লাস-যন্ত্রণার যতই কেননা তরঙ্গভঙ্গ হোক বাহ্যতঃ আমি এমন কোন আচরণ করিনি যা অপরের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে আগের মতই নিস্তরঙ্গ শান্ত নিরুত্তাপ জীবন যাপন করে চলেছি। মিশেল অবশ্য তার পক্ষপাতিত্ব কিছুটা ব্যক্ত করে ফেলেছে। বিশেষ করে নাটকে আমাকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করে।

তবু পাশ্চাত্যের যে আবহাওয়ায় মিশেলের জন্মকর্ম, শিক্ষা, তার পরিপ্রেক্ষিতে সে কোন দৃষ্টিকটু আচরণ করেছে একথা বলা যাবে না কোনমতেই। তা সত্ত্বেও এই সব শিক্ষিত ছেলেরা সরস কেচ্ছা তৈরি করতে চাইছে দেখে ঘৃণায়, কষ্টে, গ্লানিতে ভেঙ্গে পড়ছিলাম যেন।

তবু মিশেলের ওপরও রাগ হচ্ছিল আমার। মনে হচ্ছিল বিনা অপরাধে এই যে আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে তার মূল কারণ তো মিশেল নিজেই! সকলের সামনেও আমাকে দেখে সে যে ব্যগ্র সম্ভাষণ জানায় সেটাও অনেকের চোখে খুব নির্দোষ না ঠেকতে পারে।

ইদানীং ক্লাসঘরে পরিভ্রমণরত অবস্থায়ও সে যেন একটু ঘনঘন চলে আসে আমার চেয়ারের কাছে। শুধু কি আমার চোখেই পড়ে সেটা? অন্যরা তো আর ঠুলি এঁটে নেই চোখে। অনেক কিছুই ভেবে নেয় তারা এসব দেখে! হয়ত বা আমারও প্রশ্রয় আছে বলে ভেবে নেয়।

কি করেছি আমি যে ওরা আমাকে এমনভাবে চরম অসম্মানের কাদা ছুঁড়ল? আমার দুর্বলতা যা আছে তা আমার মনের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে। আমি তাকে পিঞ্জরমুক্ত করে উড়িয়ে দিইনি বাতাসে!

বিনিময়ে কতটুকু পেয়েছি? আর এখন তো শুনছি উর্বশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ওর। স্বচক্ষে দেখলাম ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছে ওর সঙ্গে। আমাকে দেখে ছুঁড়ে দিয়েছে কৃপাহাস্য।

প্রত্যুত্তরে না হেসে উচিত কাজই করেছি। আমার কি কোন মূল্য নেই? ওর কৃপাহাস্যে ধন্য মনে করব নিজেকে এমন অপদার্থ ও ভাবল কি করে আমাকে?

সেই সন্ধ্যাটা খুব খারাপ কেটেছিল আমার। অন্যের চোখে নিজেকে এতটা ছোট করে দেখতে হবে বলে ভাবিনি কোনদিন। আমি কোনদিন

বেপরোয়া স্বভাবের নই। বাড়ির বড়দের শাসনের নীচে ছকেবাঁধা জীবন-যাপনে অভ্যস্ত বরাবর। লোকলজ্জা, লোকাপবাদে বড় ভয় আমার, বড় অস্বস্তি।

সেসব অগ্রাহ্য করার মত মনোবল গড়ে ওঠার সুযোগ বা উপলক্ষ আসেনি এতদিন আমার জীবনে। সেজন্য ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায়, যন্ত্রণায়, লজ্জায় কালো হয়ে উঠেছিল আমার মন। চোখ ফিল্মের পর্দায় ছিল মাত্র। মন আমার অস্থির হয়ে ছটফট করেছে সারাক্ষণ। যতক্ষণ বসেছিলাম সেই হলে মনে মনে চাবুক হাতে নিয়ে ওদের সবাইকে পিটিয়েছিলাম বেধড়ক।

আমার সেই উদ্যত ক্রোধের হাত থেকে রেহাই পায়নি মিশেলও। শুধু কি তাই? বিদিশার জন্য ফরাসী শিখতে এসে এত অসম্মান প্রাপ্য হল বলে ওকেও রেহাই দিইনি। নির্মম রোষে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে সমানে শাস্তি দিয়েছি সকলকে।

পেছনের দিকে বসেছিলাম আমি। দরজার কাছে। ভেবেছিলাম ভাল না লাগলে চলে যাব। মাঝে মাঝে আমার চোখ পড়ছিল মিশেল আর উর্বশীর দিকে। সামনের দিকে বসেছিল ওরা পাশাপাশি। ওদের পাশে ছিল মঁসিয়ো কুর্তি, রোবের ও আরও দু'একজন কর্মকর্তা।

আমি আর কাউকে লক্ষ্য করছিলাম না। আমার চোখ মাঝে মাঝে বিচরণ করছিল মিশেল আর উর্বশীর ওপর। জীন্‌স্ পরেছিল উর্বশী। পলকের দৃষ্টিপাতে চোখে পড়েছিল সুপ্রকট শরীরের নির্লজ্জ সম্ভার। মিশেলের মনে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে অনুমান করতে চেষ্টা করছিলাম।

আমার যে বয়স হয়েছে সে কথা মাঝে মাঝেই উল্লেখ করা হয় বাড়িতে। বিয়ের সম্বন্ধ আসলে বেশি করে আলোচিত হয় সে প্রসঙ্গ। কিন্তু তার বেদনাদায়ক সত্যতা যেন টের পেয়েছিলাম বেশি করে সেই সন্ধ্যায়।

মিশেলের ব্যগ্র দৃষ্টিপাতে, তার ঔৎসুক্যে, তার শতেক আচরণে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম। কালের অনিবার্য নিয়মে বয়স বাড়বে। তার জন্য লজ্জার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু তার সমস্ত লজ্জা আমাকে বিঁধল শুধু মিশেলের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে।

আবেগের ঘূর্ণীস্রোতে তলিয়ে গিয়েছিল মধ্যবিত্ত সংস্কারের মানসিকতা।

ছেলেদের কটু মন্তব্যে সেই সত্যের নগ্নতা ধরা পড়ল নির্মমভাবে। নিজেকেই নিজে ছিছি করেছিলাম বারবার। পঞ্চশর কেমন করে সেই সর্বহর সর্বনাশা বিস্মৃতির কুহক বিস্তার করেছিল তা ভেবে কূলকিনারা পাইনি যেন।

আলিয়ঁসের অডিটোরিয়ামে কখনও ছবির পর্দায় কখনও বা মিশেল আর উর্বশীর দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ কষ্টে ছটফট করতে করতে চরম এক সঙ্কল্প করেছিলাম। ভবিষ্যতে মিশেলকে নিয়ে এমনভাবে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে দেব না। যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি ঘনিষ্ঠতার সুযোগ তাকে দেব না। আমার থেকে বয়সে ছোট এক বিদেশী যুবকের জন্য আমার স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য আহুতি দেব না। যাদুকর হয়ে ঢুকে কুহকের খেলা খেলতে দেবনা তাকে কিছুতেই।

মুহূর্তের উত্তেজনায় তৈরি হলেও সেই সঙ্কল্পের জের চলেছিল অনেকদিন। প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত। সেই ছয় মাস কিন্তু কম নরকযন্ত্রণা সইনি। রাঁবোর নরকে এক ঋতুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তখন। জীবনের প্রয়োজনে অভিনয় কত মর্মান্তিক হয়ে ওঠে তা বুঝেছিলাম তখন। পরে মিশেলের কাছে শুনছিলাম আমি একাই সেই নরকযন্ত্রণা সইনি। তাকেও সইতে হয়েছে সেই যন্ত্রণা।

মিশেল বলেছিল আমার থেকেও বেশি দুঃখ সয়েছিল ও নিজে। আমার আচরণের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি ও। আকস্মিকভাবে আমার সেই কাঠিন্য আর অনমনীয় রুক্ষতা দেখে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল ও। সদ্য নিদ্রোত্থিত কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু না বলে হঠাৎ যদি প্রহার করা হয় তাহলে তার যে রকম অনুভূতি হয় ঠিক সেরকম অনুভূতি হয়েছিল ওর। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ধাক্কা সামলানো খুব অনায়াসে সম্ভব হয়নি।

ওর মত করে অনেক কিছু অনুমান করে নিয়েছিল ও। ভেবেছিল হয়ত আমার পারিবারিক কোন ঝামেলা চলছে। মন মেজাজ ঠিক নেই সেজন্য। কিংবা হয়ত অন্য কাউকে পছন্দ করেছি। ওকে আমার ভাল লাগছে না। সেই সময়ে মাঝে মাঝে কোন ছেলের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে ওর মনে হয়েছে হয়ত সেই ছেলেটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠছে আমার।

মনে আছে এসব শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। তাকে প্রশ্ন করেছিলাম কাদের সঙ্গে আমাকে জড়িয়েছিল সে। দু' একজনের নামোল্লেখে রীতিমত চমকে গিয়েছি।

—তুমি কি পাগল মিশেল? মঁসিয়ো রায় তো বাচ্চা ছেলে। কত বয়স হবে ওর? খুব বেশি হলে পঁচিশ-ছাব্বিশ! ওর সঙ্গে আমার কখনও ওরকম সম্পর্ক হতে পারে?

যথারীতি নাছোড়বান্দা মিশেল।

—বয়স নিয়ে তোমাদের এতসব স্পর্শকাতরতা একদম বুঝতে পারিনা। বয়সের হিসাব করে কি প্রেম করো তোমরা?

—তা যে করিনা সেটা তোমার আমার সম্পর্কই প্রমাণ করছে। কিন্তু মঁসিয়ো রায়ের মত বাচ্চা ছেলের প্রতি তা বলে বাৎসল্য ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি আসে না।

—আমি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত নই। শুধুমাত্র বয়সের উপর নির্ভর করে না আমাদের অনুভূতি। বাচ্চা ছেলে কেন একজন বয়স্ক লোকের প্রতিও বাৎসল্য আসতে পারে। আর তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে কি বলবে তুমি? সহজে তৈরি হয়নি আমাদের সম্পর্ক। বয়স নিয়ে যথেষ্টই জটিলতা ছিল তোমার মনে। আমি যদি উদ্যোগী না হতাম কোন সম্পর্কই তৈরি হতনা আমার তোমার সঙ্গে। আমার থেকে তোমার বয়স বেশি বলে অনেকদিন যে মুখ ফিরিয়েছিলে তুমি আশা করি অস্বীকার করবে না তা!

স্মৃতিচারণে সময়ের পারম্পর্য রক্ষা করা বড় মুশকিল। মিশেলের প্রতি আমার দুর্বলতার মনোভাব একেবারে নির্মূল করব বলে যেদিন সঙ্কল্প করেছিলাম তার অনেক অনেক পরে এসব কথাবার্তা হয়েছে আমার মিশেলের সঙ্গে। তবুও স্মৃতির অনুষঙ্গ হয়ে চলে আসে অনেক ঘটনা, অনেক কথোপকথন।

আমি সেদিন অপমানের জ্বালায় দাঁতে দাঁতে চেপে সঙ্কল্প করেছিলাম ভাবের ঘরে কুলুপ এঁটে দেব, অতঃপর মিশেলের সঙ্গে নিয়মমাফিক সম্পর্ক রাখব, সেদিন একপেশে ছিল আমার চিন্তা। নিজের অসম্মান, অপমান আর অগৌরবের কথাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। অপরপক্ষের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে দেখিনি। বরং অপরপক্ষকে প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলেছি।

মনে আছে মানসিক অশান্তি আমার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। বাড়িতে তার অন্য রকম ব্যাখ্যা হয়েছিল। মা বাবাকে বলেছিলেন

জোর কদমে সম্বন্ধ খুঁজতে। সকলের ধারণা হয়েছিল ঠিক বয়সে বিয়ে না হওয়ার জন্যই মেজাজের পারা অতটা উঁচুতে চড়েছে। পরপর অনেকগুলো সম্বন্ধ আনা হয়েছিল আমার জন্য। কিন্তু ফল সেই একই হয়েছিল। কখনও পাত্রপক্ষ পছন্দ করেছিল আমাকে। কখনও বা আমাদের পক্ষ পাত্রকে। কিন্তু পারস্পরিক বোঝাপড়া সন্তোষজনক না হওয়ায় কোনটাই শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি।

আমি যেন আগের থেকে অনেক বেশি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলাম। পুরোপুরি ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দ তখন গৌণ হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। মনটাকে রাশ টেনে ধরবার তীব্র ইচ্ছার কাছে বলি দিয়েছিলাম অন্য সব ইচ্ছা। মিশেলের প্রতি বিপজ্জনক আকর্ষণের আওতা থেকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে আনতে হবে মনটাকে এই ছিল আমার একাগ্র ইচ্ছা।

আমি তখন সর্বান্তকরণে চাইছি মোটামুটি ভদ্র গোছের একটা সম্বন্ধ জুটে যাক। মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের বয়স্ক মেয়ের জন্য যেমন ছক বেঁধে দেওয়া আছে তেমন ছকের মাপে একটি সম্বন্ধ পাওয়ার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠার কথা নয় আমার। তবু তখন আমার মনে অন্য কোন চিন্তা স্থান পায়নি।

নিয়তিনির্দিষ্ট ঘটনাস্রোতের উজানে আমার মনের দুর্বার ভাবনাস্রোতের পাড়ি দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টার কথা মনে পড়লে এখন হাসি পায়। কিন্তু যেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন কর্মচারীর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ একরকম পাকা হয়ে গিয়েছিল সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে-ছিলাম আমি।

কিন্তু তবু বুঝি সরল গতিতে চলেনি আমার মনের ভাবনাচিন্তা। দুরন্ত নদীবক্ষে নৌকাপাড়ি দিয়ে ঝড়ের মুখে পড়ে অসহায় মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ বোধ করে। আপ্রাণ কসরতের পর নৌকা যখন নিরাপদ তীরে এসে ভেড়ে তখন স্বস্তি খুঁজে পায় মানুষ। কিন্তু সেটাই তার সামগ্রিক অনুভূতি নয়। প্রাণটা হয়ত বাঁচে কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডবের সময় নদীবক্ষের সেই উত্তাল ভীষণ সৌন্দর্যসুধা পানের আনন্দ খোয়ায় মানুষ। যে একবার সেই ভীষণ দুরন্ত ভয়ঙ্করের স্বাদ টের পেয়েছে তার কাছে সেই অপ্রাপ্তি কম কষ্টের নয়।

॥ আট ॥

দ্বিতীয় সেমেস্টার শেষ হতে আরও মাস তিনেক বাকি ছিল তখন। ক্লাস ছেড়ে দেওয়া যায় না। নিয়মরক্ষা মত একদিন দুদিন বাদ দিয়ে দিয়ে আলিঁয়সে আসছিলাম আমি। তবে পড়াশোনা ঠিকমত চালিয়ে যাচ্ছিলাম বাড়িতে।

প্রতিযোগিতার স্বাদ একবার পেয়ে গেলে পর তার নেশা কাটানো দায়। ভাল ছাত্রী হিসাবে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছি। অভিনয়ের দরুন সেই খ্যাতি আরও বেড়েছে। অতএব ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠা হারাতে রাজী ছিলাম না। তবে আমার সেই নিয়মিত অনুপস্থিতি মিশেলকে যে ব্যথিত করত তা আমি তার চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারতাম।

ইচ্ছা করেই তখন ক্লাস সুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এসে উপস্থিত হতাম আলিঁয়সে। ক্লাসের পর দেরি না করে রওনা হতাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। বিদিশা অবাক হতো। জিজ্ঞাসা করত আমার এই ব্যস্ততা কিসের জন্য। সংক্ষেপে কারণ আছে বলে প্রায়ই এড়িয়ে যেতাম সেই প্রশ্ন।

মিশেলের মনেও যে সেই প্রশ্ন দুর্বার হয়ে উঠত তা বুঝতাম আমি। অনেক সময়েই দেখতাম কেমন একটা অন্যমনস্ক ব্যথিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ওর চোখে। তবু ভূতগ্রস্তের মত একটা গোঁ পেয়ে বসেছিল আমাকে।

কখনও কখনও ওকে দেখে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কিংবা ওর কণ্ঠস্বর শুনে দুর্বল হয়ে পড়তাম। পরক্ষণেই প্রাণপণে চেষ্টা করতাম সেটা নির্মূল করার। নিজেকেই নিজে বলতাম—'এ সমস্তই পুরুষের ছলচাতুরী। একটা মেয়েকে কব্জা করার ধূর্ত ফন্দীফিকির। আর উর্বশীর সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠতার কোন বিরাম দেখছি না!'

মাঝে মাঝেই উর্বশীকে দেখা যেত মিশেলের সঙ্গে। আগে হয়ত সেটা কোন রেখাপাত করত না মনে। কিন্তু ছেলেদের আলোচনা শোনার পর একটা অব্যর্থ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আমার মনে। ছেলেদের মুখে শুনেছিলাম লোগ্রোঁর সঙ্গে উর্বশীর সম্পর্কে চিঁড় ধরেছে। কথাটা কতদূর সত্য তা যাচাই করার উপায় ছিল না।

তবে লোগ্রের সঙ্গে দেখা যেতনা উর্বশীকে আগের মত। সঠিক কারণ কি তা জানতে কৌতূহল হোত। সেই কৌতূহল নিবৃত্তি করতে গেলে স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে হয়। কিন্তু মিশেলের সঙ্গে উর্বশীকে এত ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে যে সেই প্রশ্নটা অন্যের কানে নির্দোষ না শোনাতে পারে। সেই ভয়ে মনের চিন্তা মনে পুষে রাখতাম। বাইরে প্রকাশ করতাম না।

অথচ মিশেলকে জোর করে যতই অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করিনা কেন ওর সঙ্গে উর্বশীর ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ঠেকত আমার কাছে। ঠিক যেন ঈর্ষা ছিলনা সেটা। আলিঁয়সে মেধাবী সুন্দর চেহারার ভাল মেয়ের অভাব ছিলনা। মিশেল যদি তাদের কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতো তাহলে আমার কষ্ট হতো হয়ত কিন্তু এতটা অসহ্য ঠেকত না।

আর দশজন পুরুষের থেকে আলাদা মনে হোত আমার মিশেলকে। উর্বশীর শরীর সম্ভার দেখে তার অন্ততঃ প্রলুব্ধ হবার কথা নয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসেনি মিশেল ঠিকই। উর্বশী যদি আসে, কথা বলে, তাহলে ভদ্রতাবোধের খাতিরেও তাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না মিশেল।

কিন্তু তবু যেন আমার মন ঠিক শান্ত হতো না। পুরুষের লোভ অনেক সময়েই সীমারেখা মেনে চলে না। আমার ভয় ছিল সেখানেই। অবশ্য যদি একেবারে তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারতাম তাহলে হয়ত সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। সমগ্র পুরুষজাতির নৈতিক অভিভাবকের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়নি কেউ।

আমার আচরণের মধ্যে সেই পরিবর্তন দেখে মিশেলও অবাক হচ্ছিল। তার সেই বিস্ময় শুধু তার নিঃশব্দ দৃষ্টির মধ্যেই সীমিত ছিলনা। কখনও কখনও ভাষায় ব্যক্ত করেছে সে তার মনোভাব।

একদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। ক্লাসে কথা প্রসঙ্গে 'ফেমিনিজম' আর 'মেল শওভিনিজম্' নিয়ে কথা উঠল। রীতিমত বিতর্ক সৃষ্টি হোল তা নিয়ে। অনেকে অনেক কিছু বলল। ইচ্ছা করেই নির্বাক থাকলাম আমি। পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা ছেড়েই দিয়েছিলাম আমি। এখন অবশ্য সেসব মনে পড়লে হাসি পায় অপরিণত বুদ্ধির কথা ভেবে।

কিন্তু তখন আমার ভেতরে যে রোষ, যে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল তা আত্ম-প্রকাশ করেছিল সেই নঞর্থক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। অন্যদিন মিশেল সেটা

লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছে। তবে তা নিয়ে কোন মন্তব্য করেনি। তার নীরব দৃষ্টির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে তার অকপট বিস্ময়বোধ। সেদিন কিন্তু সরাসরি প্রকাশ করেছিল সে তার বিস্ময়।

—কি ব্যাপার মাদমোয়াজেল? আপনার কোন মতামত নেই?

ইচ্ছা করেই গোঁ ধরে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।

—না।

মিশেলও যেন গোঁ ধরেছিল। আমার কাছে থেকে সুস্পষ্ট জবাব সে শুনবেই।

—না কেন মাদমোয়াজেল? আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে এ ব্যাপারে শুনি আমরা! কোন না কোন মতামত নিশ্চয়ই আছে আপনার!

হঠাৎ আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। ঠিক যেন রাগও নয়। খুব দুঃখে কষ্টে কান্না আসা একটা অসহায় বোবা রাগ।

—আমি মনে করি পুরুষ পুরুষই, আর মেয়ে মেয়েই। দুজনের মনমেজাজ রুচি আলাদা। দুজনের মধ্যে পুরো সম্প্রীতি বা সখ্য কখনই সম্ভব নয়। ফেমিনিজম আর মেল শওভিনিজমের বিতর্ক সে কারণেই। মেয়েরা চেয়েছে নিজেদের আধিপত্য, পুরুষেরা তাদের। এ নিয়ে যে সমস্যা তার কোনদিন সমাধান হবে না। কি পরিবারের মধ্যে কি পরিবারের বাইরে মেয়ে পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সুষম কোন বন্ধন নেই। আছে শুধু আপোষ করে চলা, আছে অসন্তোষ, বিদ্রোহ গোপন করে জোড়াতালি দিয়ে চলার চেষ্টা।

আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম নিজের কথা শুনে। কোনদিন এভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত নই আমি। আর এ ধরনের চিন্তাধারাও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে কত অদলবদল ঘটায় তা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

আমাদের পরিবারে পুরুষের আধিপত্য দেখেই অভ্যস্ত আমি। তা নিয়ে প্রবল কোন বিদ্রোহের তাগিদ টের পাইনি তো আগে। তবু যন্ত্রণায়, ক্ষোভে, হতাশার জন্ম নিয়েছে কখন বিদ্রোহের একটি স্ফুলিঙ্গ। আমার অজান্তেই কিভাবে বেড়ে উঠেছে অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় সম্প্রসারিত এক চেতনার মহীরুহ।

মিশেল যেন আহত হলো। তার দীঘল চোখের পিঙ্গল দ্যুতি যন্ত্রণাসিক্ত

দেখায়। কণ্ঠস্বরেও টের পেলাম আমি কেমন এক বিষণ্ণ আর্দ্রতা।

—মেয়ে পুরুষের মিলিত শক্তিই তো সৃষ্টির মূলমন্ত্র। তার মধ্যে আপনি খালি অসম সম্পর্কই দেখছেন? সেই সম্পর্কের ছন্দ, সুর কি সত্য নয়?

তর্কের মধ্যে যাইনা আমি। তর্কে জিতবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে মিশেলের। এ পর্যন্ত যতদিন কথা বলেছি ওর সঙ্গে দেখেছি অনায়াসে পর্যুদস্ত করতে পারে ও ওর প্রতিপক্ষকে। কণ্ঠস্বর না চড়িয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গী বজায় রেখে তর্ক চালিয়ে যায় ও। একটু একটু করে যুক্তির জাল বিছিয়ে দিতে থাকে। আর একটু একটু করে প্রতিপক্ষ সেই জালের বেষ্টনীর মধ্যে বন্দী হয়ে হারিয়ে ফেলে তার প্রতিরোধের ক্ষমতা। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায়ান্তর থাকেনা তখন তার।

সে পথে হাঁটিনা আমি। আগের মত অনমনীয় দৃঢ়তায় গোঁ প্রকাশ করি আমার।

—আমার ধারণার কথা বলেছি আমি। আর আপনি তো আমার ব্যক্তিগত মতামতই জানতে চেয়েছেন তাই না?

একটু যেন অপ্রস্তুত হয় সে। বিষণ্ণ, স্থির অপলক চোখে আমাকে দেখতে দেখতে ছোট্ট করে হাসে।

—তা ঠিক।

ক্লাস শেষ হতে বাকি ছিল তখনও আধ ঘণ্টাখানিক। কিন্তু কেমন যেন ছন্দ পতন হয়েছিল ক্লাসের। আর জমেনি ক্লাস। অন্যেরা কতটুকু অনুধাবন করেছিল জানিনা। কিন্তু বিদিশা দেখেছিলাম অবাক হয়ে দেখছিল আমাকে। কিছু একটা অনুমান করেছিল ও নিশ্চয়। কিন্তু মুখে একটিও প্রশ্ন করেনি।

বাড়ি ফেরার পথেও নীরব ছিল ও। হয়ত ভেবেছিল মনমেজাজ ভাল ভাল নেই আমার। প্রশ্ন করে লাভ হবেনা।

তার পরে কয়েকদিন ক্লাসে একটু গম্ভীর দেখা গেল মিশেলকে। সেটা অবশ্য আমার মনগড়া ধারণাও হতে পারে। নিজের মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছি তখন সবকিছু। তবু আমার কেমন মনে হোত মনঃকষ্টে আছে সে। তারই ছাপ পড়েছে তার মুখে, চোখে, ব্যবহারে।

দুটো স্বতন্ত্র ভাগে বিভাজিত হয়ে গিয়েছিল আমার সত্তা। একটা সবকিছু বিস্মৃত হয়ে অবুঝ শিশুর মত কাঁদত। অপরটি বাইবেলবর্ণিত

শয়তানের মত নিজের হাতে গড়া দুঃখকষ্টঘেরা নারকীয় জগতে মাথা উঁচু করে রাজার মত বাঁচতে চাইত। তবু বেশি দাপট ছিল যেন সেই শয়তানটার। ঈর্ষায়, রোষে, ক্রোধে, সঙ্কল্পে সতত অস্থির, সতত অশান্ত থাকত সে।

যদি কখনও মিশেলের দিকে তাকিয়ে কাটা ছাগলের মত লাফাত আমার হৃৎপিণ্ড তখন রক্তচক্ষু পাকিয়ে শাসাত সে আমায়। উর্বশীর সঙ্গে সম্ভব অসম্ভব ঘনিষ্ঠতার কথা কল্পনা করে স্বেচ্ছাদণ্ড ভোগ করত।

ক্লাসের সময়টুকুর বাইরে অতিরিক্ত সময় থাকতামনা বলে উর্বশী লোগ্রোঁ কিংবা উর্বশী মিশেল সম্পর্কিত কোন রটনা কানে আসতনা। বিদিশা কি বুঝেছিল জানিনা। তবে ও নিজেও কেমন নীরব হয়ে গিয়েছিল। আমিও যেমন কোন কৌতূহল দেখাতাম না—ওও তেমন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আলিঁয়সের প্রসঙ্গ তুলত না। আজও জানি না কি মনে করে ও সেই নীরবতা অবলম্বন করেছিল। আমি নিজেও অবশ্য পরে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন করিনি। লজ্জাবশতঃ, সঙ্কোচবশতঃ।

থিয়েটার গ্রুপের সেক্রেটারী হিসাবে মিশেলের দায়িত্ব ছিল নিয়মিত ব্যবধানে ভাল ভাল নাটকগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা করা। কখনও কখনও নিজেও ছোট ছোট একাঙ্ক নাটক লিখে তার অভিনয়ের ব্যবস্থা করত সে। তাছাড়াও বিখ্যাত নাটকের কোন বিশেষ অঙ্ক থেকে বিশেষ কোন দৃশ্য চয়ন করে সেটা অভিনয় করাত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। বিখ্যাত উপন্যাসের কোন ঘটনা বা দৃশ্যকেও চিত্রনাট্যে রূপায়িত করতে উৎসাহ কম ছিলনা তার।

এর আগে ভাষা শিক্ষার পরিধি ছাড়িয়ে ফরাসী সংস্কৃতিকে এমন-ভাবে ছাত্রছাত্রীদের মনে গেঁথে দিতে অপর কেউ সেভাবে চেষ্টা করেনি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ফরাসী ভাষায় কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি মৌলিক সাহিত্য রচনার আগ্রহও জাগিয়ে তুলেছিল মিশেল। উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ভাল পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল।

সমসাময়িক বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রপ্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে সংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল যেন সে। তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করত সে গুণী ছাত্রছাত্রীদের। অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের

সাহায্য নিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করত সব কিছু সে। ডিরেক্টার নিজেও এসবে খুব আগ্রহী ছিলেন বলে প্রায় ত্রুটিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারত সেইসব অনুষ্ঠান। তাছাড়া বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে ফ্রান্সের সংস্কৃতির রাখীবন্ধনও যেন অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এলো সে।

পুরনো ছাত্রছাত্রীদের সপ্রশংস আলোচনা কানে আসত প্রায়ই। তারা বলত মিশেল আসার আগে অপর কেউ এমন দক্ষতা নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে উদ্যোগী হয়নি আলিয়ঁসকে এভাবে একটি যথার্থ সংস্কৃতিকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। অনেকের ধারণা হোলো ওর মেয়াদ শেষ হবার পর হয়ত পরবর্তী ডিরেক্টার হিসাবে থেকে যাবে ও।

আমার পক্ষে এই ব্যাপারটা মুশকিলের ছিল। মন্ত্রের মত তার নাম জপত যেন সকলে। যে কোন উপলক্ষে তাকে দেখা যেত অগ্রণী ভূমিকায়। আমি তাকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতে চাইতাম। পাছে দেখা হয়ে যায় এই ভয়েও যেন কাঁটা হয়ে থাকতাম। কিন্তু নানা কারণে তা অনেক সময়েই সম্ভব হতো না।

আর তাকে দেখলে বুঝতে পারতাম বুকের ভেতরে একটা কান্না থমকে দাঁড়াচ্ছে। নিজের সেই দুর্বলতা দেখে নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতাম। 'ছিঃ মীনাক্ষী সেন! তোমার বয়স তো কম হয়নি? নেহাৎ এখনও পর্যন্ত অনূঢ়া রয়ে গেছ তাই! এই সব প্রেম ট্রেমের দুর্বলতা কি সাজে আর তোমার? আর যে তোমার থেকে বয়সে অতটা ছোট তার প্রতি?'

মাঝে মাঝে মনে হোত এ বোধহয় আমার বিকৃতি এক রকমের। মধ্যবিত্ত মানসিকতা দিয়ে ব্যাপারটা নিজের কাছেই খুব স্বাভাবিক ঠেকত না। অনেক পরে যখন মিশেলের কাছে আমার এই মনোভাব ব্যক্ত করেছি ও বলেছিল এসব বুঝতে ও অক্ষম।

বলেছিল 'আমার কাছে বয়স নিয়ে তোমার এত অস্বস্তি একটুও স্বাভাবিক ঠেকে না। মনের আবেগ টাবেগ কি বয়স মেপে আসবে না কি? আমার তো মনে হয় বরং মনটাই হওয়া উচিত বয়সের মাপকাঠি। অল্পবয়সেও যদি কারুর বৃদ্ধের মানসিকতা থাকে তাহলে তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধই থাকতে পারে। স্বাভাবিক আবেগসম্পন্ন অল্প বয়সী মানুষের পক্ষে তার সঙ্গ বা সান্নিধ্য অসহ্য লাগবে।'

যখন আমি নিজেকে ঐভাবে অনেক কিছু থেকে সরিয়ে নিচ্ছি সেই

সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে ছেলেটির বাড়ি থেকে দেখতে আসল আমাকে। ওদের পছন্দ হোল আমায়। সেরকম আভাস দিয়েও গেল ওরা যাবার সময়।

পাত্রও এসেছিল সঙ্গে। বেয়াল্লিশ মত হবে শুনেছিলাম পাত্রের বয়স। আমার সঙ্গে ভীষণ কিছু বেমানান নয়। আর চেহারায়ও কিছু কুদর্শন নয়। কিন্তু মিশেলের চেহারা এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল আমার দৃষ্টি, বুদ্ধি, মন যে পাত্রকে দেখেই মন খারাপ হয়ে গেল আমার। আমার সামনে বসা গম্ভীরদর্শন ঐ প্রৌঢ়ের সঙ্গে নিরানন্দ একঘেয়ে জীবন কাটাতে হবে ভেবে বুকের ভেতরটা আছাড়ি পিছাড়ি করতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরের মত মিশেল আমাকে এমন কুহকজালে জড়িয়েছে বলে তার ওপরও অবুঝ রাগে কষ্ট পাচ্ছিলাম। যুক্তি দিয়ে বুঝছিলাম যে পাত্রের চেহারা বা বয়স কোনটাই আমার সঙ্গে বেমানান নয়। অনর্থক বায়নাক্কা তোলার অর্থ হয় না। বয়স বেড়ে যাচ্ছে বলে জ্যাঠামশাই ক্রমাগত বাবাকে তাগাদা দিচ্ছেন। আমাদের পরিবারে এ জিনিষ অভাবিত। আর অমার্জনীয়ও বটে। জ্যাঠিমাও মাকে কথা শোনাচ্ছেন।

দিদির বিয়ে নিয়ে মরমে মরে আছেন মা-বাবা। আমিও এত বয়স পর্যন্ত পাত্রস্থ হইনি। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত চাকরি করছি। আবার সন্ধ্যা-বেলায় পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে ফরাসী ভাষা শিখছি। নেহাৎ আমি একটু বেশি-রকম গোঁ ধরেছিলাম বলে আর বিদিশাও এসে বাড়িতে একটু বুঝিয়েছিল বলে তেমনভাবে বাধা দেয়নি কেউ। কিন্তু আর বেশি দেরি করতে চাইছিলনা বাড়ির লোক। পরে কিসে কি হয় এ নিয়ে এমনিতেই বাড়ির লোকের চিন্তা ছিল। শুধু বেশি জেদাজেদির ফলে আবার ইতে না বিপরীত হয় এই আশঙ্কায় গুরুতর কোন আপত্তি তোলেনি।

আগে আমি একাধিকবার আমার অপছন্দের কথা ব্যক্ত করেছি মায়ের কাছে। সেবার আমিও যেন নিজের ওপরই রাগে জেদে ঠিক করে ফেললাম যা হবার হবে। 'যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি' মনে করে প্রতিরোধের চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলাম।

কয়েক দিনের মধ্যে পাকা দেখা হয়ে গেল। বিয়ের দিন ঠিক হোলো পরের মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের এক দিন। আমার তখনকার মানসিক অবস্থা যূপকাষ্ঠে বাঁধা বলিদানের পশুর মত। মৃত্যু একরকম অবধারিত—তারই

সাড়ম্বর প্রস্তুতি চলেছে চারপাশে। আমার শুধু সাশ্রু নয়নে সেই অনিবার্য ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকা।

আলিয়ঁসে সেই সেমেস্টার প্রায় শেষ হবার মুখে তখন। প্রথমে ভেবেছিলাম ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দেব। পরে মনে হোল জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা। এতদিন ক্লাস করে শেষে সেটা বন্ধ করে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। অন্ততঃ এবারের পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া যাক।

সেই মাসে নতুন একটি নাটকে অভিনয়ের জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করছিল মিশেল। অন্যান্যবার মিশেল আমাকে তার ইচ্ছামত ভূমিকায় নির্বাচিত করে। সেবার সে কি বুঝেছিল জানিনা। আমাকে জিজ্ঞাসা করল অভিনয় করব কিনা? আমি ঠিকই করেছিলাম কোন রকমে এই সেমেস্টারের পাঠ চুকিয়ে পুরোপুরি সংশ্রব ত্যাগ করব আলিঁয়সের। আর তখন যে পরিস্থিতির মধ্যে আছি তাতে অভিনয়ের প্রশ্নই ওঠেনা। তবু মানব চরিত্রের জটিল রহস্যের নিয়মে তার প্রশ্নে অপমানিত বোধ করেছিলাম।

আমার লজ্জা আরও বেড়েছিল সহপাঠীদের সবিস্ময়, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। কারণ কিছুদিন ধরে নাটকে আমার অভিনয় করা একেবারে অবধারিত হয়ে পড়েছিল। আপ্রাণ প্রয়াসে আমার লজ্জা আর অপমানের গ্লানি গোপন রেখে সহজভাবে বলতে চেষ্টা করলাম যে আমার পক্ষে অভিনয় করা আর সম্ভব হবেনা। দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করল না মিশেল। একরকম সহজ স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সেমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে দু'একজনকে নির্বাচিত করল অভিনয়ের জন্য।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে বিদিশা হঠাৎ আমার হাতটা টেনে নিয়ে উষ্ণ একটা চাপ দিয়েছিল।

—ভালই করেছিস মীনাক্ষী। এই অভিনয় করা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। তোর সঙ্গে মিশেলকে জড়িয়ে আজেবাজে কথা বলছে অনেকে। আমার ত ভয় করে তোর বাড়িতে যদি এসব কথা কানে যায় তাহলে তার ফলটা কি দাঁড়াবে!

—অভিনয় করছিনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। কিন্তু তা নিয়ে আজেবাজে কথা বলবে কেন লোকে বলতে পারিস বিদিশা?

—আসলে কি জানিস? লোকে তো সবটা দেখতে পাচ্ছেনা। চোখের সামনে যেটা দেখছে সেইটাই তাদের কাছে বিচার্য বিষয় হয়ে

উঠেছে।

—কিন্তু চোখে কি দেখছে তারা? আমি কি বিনা প্রয়োজনে কোনদিন মঁসিয়োর সঙ্গে এতটুকু বেশি কথা বলেছি না ঐ উর্বশী লোগ্রোঁর মত যত্রতত্র ঘুরে বেরিয়েছি?

—তুই আর উর্বশী কি সমান? তবে পরপর তিনটে নাটকে তোর সঙ্গে অভিনয় করল মিশেল। বিশেষ ভূমিকায়। ও নিজে যদি অভিনয় না করত, শুধু নির্দেশনা দিয়ে ক্ষান্ত হতো, তাহলে এত কথা উঠত না। আমাকে তুই কিছু বোঝাতে আসিসনা মীনাক্ষী। তোকে আমি কি এখন নতুন করে চিনব? আমি বলব সব দোষ মঁসিয়োর। তোর প্রতি ওর যে দুর্বলতা আছে সেটা যদি এত খোলাখুলিভাবে ও প্রকাশ না করত তাহলে কিছুই হতো না। অথচ এখন শুনছি উর্বশীর সঙ্গে নাকি নতুন করে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। হয়ত তোর কাছে পাত্তা পাচ্ছে না বলে।

বিদিশার ঐ ঝাঁজ আমার ভাল লাগছিল না। আমি নিজে মিশেলকে যা খুশি বলতে পারি, ভাবতে পারি। কিন্তু অপরের মুখে তার সম্পর্কে কটূক্তি একেবারেই সহ্য হচ্ছিল না। হয়ত মিশেল যদি জাতে ফরাসী না হতো তাহলে ও এতটা তীব্র আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতো না।

এই ব্যাপারটাও আমার কাছে দুঃসহ মনে হোত। বিদিশার এমন একটা স্পর্শকাতর অধ্যায় আছে যে অনেক সময়েই অনেক কিছু আলোচনা করতে দ্বিধা হয়। বাড়িতে এমন একজনও নেই যার কাছে মনোভাব খুলে বলা যায়। একমাত্র দিদি হয়ত ব্যাপারটা বুঝত খানিকটা। কিন্তু এখন আর সে চেষ্টা করে লাভ নেই। আর তো কয়েকটা দিন। পরীক্ষা হয়ে যাবে। তারপর বিয়ে। নতুন পরিবারে নতুন রূপে অধিষ্ঠিত হব। হর্ষ-বিষাদ বিজড়িত এই অধ্যায় জীবন থেকে মুছে যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

সেই নাটকের অভিনয় আমি দেখতে যাইনি। লোকমুখে শুনেছিলাম উর্বশীর একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল। দুর্ধর্ষ হয়েছিল নাকি ওর অভিনয়। তবে মিশেল অভিনয় করেনি। একটি প্রাক্তন ছাত্রকে নির্বাচিত করা হয়েছিল উর্বশীর বিপরীত ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য। দন্তশূলের মত মিশেলের চিন্তা ক্রমাগত পীড়িত করছিল আমাকে। অভিনয়ে মিশেলের উৎসাহ রীতিমত লক্ষ্যনীয় ছিল। সে কেন অভিনয় করেনি সেটা নিয়েও ভাবনার যেন বিরাম ছিল না আমার।

উর্বশী অধ্যায় সেখানেই শেষ হয়নি। কিছুদিন পরেই শুনলাম তার আঁকা ছবির একক প্রদর্শনী হবে। যথারীতি মিশেলই বেশি উদ্যোগী সে ব্যাপারে। উর্বশী ছবি আঁকে শুনেছিলাম। কিন্তু তাকে দেখে তার ছবির মান সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা ছিল না। তার চেহারা, পোষাক কথাবার্তা কোনটাই আমার কাছে শিল্পীজনোচিত মনে হোতনা।

সে যে এরকম একটা সুযোগ পাচ্ছে তাতে অনেকের মনেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। একমাত্র যারা তাকে দীর্ঘদিন ধরে নানাসূত্রে জানে তারা খুব অবাক হোল না। তবে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই পছন্দ করত না তাকে। তাদের মুখে শোনা যেত লোগ্রোঁর আগেও নাকি কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার। শেষ পর্যন্ত কারুর সঙ্গেই তার সেই সম্পর্ক টেঁকেনি। সে ব্যাপারে দোষ বা দায় তার কতখানি আর অন্যদের কতখানি আমরা জানতাম না। কিন্তু তার সুনাম অনেকখানিই ক্ষুণ্ন হয়েছিল। তার উগ্র পোষাকের দরুন সেই অখ্যাতি অনেক বেশি বেড়েছিল।

কাজেই তার চিত্র প্রদর্শনীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে গেল। সেসব কানে এসেছিল কিছুটা আমারও। আমার কৌতূহল হোল। সেদিন আমাদের ক্লাস ছিল না। বিদিশা আর আমাদের ক্লাসের স্বাগতা রক্ষিত বলে একটি মেয়ের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলাম আমি সেই প্রদর্শনীতে। অডিটোরিয়ামের দেয়াল জুড়ে টাঙ্গানো হয়েছিল উর্বশীর ছবি। আমাদের তিনজনের কেউই ছবির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নয়। নিছক কৌতূহল পরবশ হয়েই এসেছিলাম আমরা সেই প্রদর্শনীতে।

ঢুকেই দেখি সামনেই ছোট করে একটি পরিচিতি দেওয়া হয়েছে উর্বশীর। খুব একটা ভীড় ছিলনা। আলিঁয়সেরই বর্তমান প্রাক্তন কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রী ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছিল। দু' চারজন একজোট হয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। অচেনা কোন কোন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকেও দেখলাম ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতে। আমরা সমঝদার নই। তবু বুঝতে পারছিলাম আর যাই হোক হাত খুব পাকা উর্বশীর। তার পরিচিতির মধ্যেও সেরকমের একটি ইঙ্গিতে ছিল। ভবিষ্যতে সে একজন নামী দামী শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এরকম একটি মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সেই পরিচিতিতে। খুব অপ্রত্যাশিত ছিল সেটা আমাদের কাছে।

অনেকের আলোচনা শুনে ধারণা হয়েছিল শিল্পোৎকর্ষের জোরে নয়,

অন্যভাবে প্রভাব খাটিয়ে সুবিধা আদায় করে নিয়েছে উর্বশী। অনেক ছবির বক্তব্যই দুর্বোধ্য ছিল আমাদের কাছে। কিন্তু তার রং আর রেখার শিল্পকৃতি লক্ষ্য করে রীতিমত বিস্মিত হচ্ছিলাম আমরা। উর্বশীর শিল্পীসত্তা অনাবিষ্কৃত মহাদেশের মত একটু একটু করে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি আমাদের বিরূপতাও যেন ফিকে হয়ে আসছিল।

বিদিশা আর স্বাগতার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম মাঝে মাঝে। আমার মত ওরাও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল দেওয়ালে টাঙ্গানো শিল্পকৃতি লক্ষ্য করে।

নিজেকে অপরাধী লাগছিল। একজন প্রতিভাবান শিল্পীকে যথোচিত মর্যাদা আর সম্মান দিইনি বলে। উচ্চাসনে বসে বাইরের পোষাক দেখে তাকে বিচার করেছি এতদিন। সেদিন বিশাল হলঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত উর্বশীর আঁকা ছবির অজস্র সমারোহ দেখতে দেখতে কেমন একটা হীনমন্যতা বোধে আক্রান্ত হচ্ছিলাম। যাকে দেখে মনে হয়েছিল অন্তঃসারশূন্য তার মধ্যে কিভাবে এমন করে শিল্পচেতনার উন্মেষ বা বিকাশ ঘটে? মনুষ্যচরিত্রের হিসাবে যে পটু নই তা বুঝতে পারছিলাম। হিসাবের সেই গরমিল দেখে নিজেকেই কোতল করতে চাইছিলাম।

সেই মুহূর্তে আরও একটি বিচিত্র অনুভূতি ছুঁয়ে গেল আমায়। মিশেলের প্রতিও নরম আর দুর্বোধ্য এক দুর্বলতা টের পাচ্ছিলাম। উর্বশীর সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্রটা যেন নাগালের মধ্যে আসছিল। আমার মধ্যে ফুড়ুৎ করে ঢুকে পড়েছিল একটা পাখি। যে তার ধারালো চঞ্চুতে ক্রমাগত ঠুকরে চলেছিল আমাকে। গলার কাছে উঠে আসছিল দলা পাকানো খানিকটা কষ্ট।

বিদিশা আর স্বাগতা একটু এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ চাপা গলায় ডাকে আমায় বিদিশা।

—অ্যাই মীনাক্ষী! পিছিয়ে পড়ছিস কেন? এই ছবিটা দেখে যা। দ্রুত দু'তিনটে ছবি ভাসাভাসা ওপর ওপর ভাবে দেখে চলে যাই ওদের পাশে।

শুধু রং আর রেখার বিন্যাস দেখে ছবির বক্তব্য কিছুই বুঝতে পারি না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিদিশাদের দিকে তাকাই।

—কিসের ছবি এটা?

—ছবি দেখে কিছুই বুঝছি না। তবে ছবির নামকরণ দেখে বুঝতে

পারছি দুটি নারী পুরুষ গভীরভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আছে।

সকৌতুকে জবাব দেয় স্বাগতা।

একটু খেয়াল করে লক্ষ্য করি সেই রেখার ঢেউ। আলিঙ্গনের ভঙ্গীটা যেন ঝাপসাভাবে ফুটে ওঠে চোখে। উর্বশী শুধু পোষাকেই দুঃসাহসী নয়। ওর শিল্পেও রয়েছে সেই দুঃসাহস।

—আচ্ছা মডেলের দরকার হয়না উর্বশীর? তা মডেল কোথায় পেল?

—অসুবিধা কোথায়? একাধিক পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে ওর। কোন অটোমেটিক ক্যামেরা হয়ত তুলে রেখেছে তেমন কোন দৃশ্য। পরে রঙে রেখায় সেটাকেই ফুটিয়ে তুলেছে শিল্পের প্রয়োজনে।

বিদিশা বলে হাল্‌কা ভঙ্গীতে।

আমার ভাল লাগছিল না সেই আলোচনা। উদ্ভট যত সব চিন্তা বলে মনে হচ্ছিল কেবলি। বিদিশার কথা শুনে রাগ হচ্ছিল। এতখানি হীনতা যেন সহ্য হচ্ছিল না আমার। যা মূর্ত তাকে বিমূর্তে রূপান্তরিত করার এই যে শিল্পপ্রয়াস তার মধ্যে অলক্ষিত এক মানসিক উত্তরণের আভাসও বুঝি পাওয়া যায়। সেই মুহূর্তে হঠাৎ কেমন অস্বস্তি বোধ হোল আমার। মনে হোল দূর থেকে কেউ যেন একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি পড়ে গেল মিশেলের দিকে। ঘরের অন্য কোণে দাঁড়িয়ে আছে সে একাধিক ভদ্রলোকের সঙ্গে। সামনেই রয়েছে একটা বড় ছবি। ভদ্রলোকদের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। মিশেলের চোখে ফুটে উঠেছিল গভীর একাগ্র আর বিষণ্ণ দৃষ্টি। এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল সে আমার দিকে। চকিতে চোখ সরিয়ে নিয়ে মনোনিবেশ করি দেয়ালের ছবিতে।

আমার সঙ্গীরা লক্ষ্য করেনি আমাদের। কিন্তু আমার বুকে ধাক্কা লাগল যেন। এমন ক্ষুব্ধ সকাতর আর বেদনার্ত দৃষ্টি এর আগে দেখিনি আমি তার চোখে। আর এমন বাঙ্ময়ও যেন নয়। আমার আচরণে তার মনে যে অনেক ক্ষোভের পাহাড় জমেছে তা তার অভিমানকাতর দৃষ্টির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যই তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি তো জ্ঞানপাপী! ইদানীং এড়িয়ে যাচ্ছি তাকে। ইচ্ছাকৃত কাঠিন্য বজায় রাখছি আমার চলাফেরা, কথাবার্তা সব কিছুতে। আমার আগের

আচরণের সঙ্গে এখনকার আচরণের ঘোরতর অমিল তার অন্ততঃ চোখে না পড়ার কথা নয়। আজকাল সেও আমাকে দেখামাত্র আগের মত সহাস্যে এগিয়ে এসে 'বঁজুর' বা 'বসোঁয়া' জানায় না।

ছবির বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল আমার মন। যন্ত্রের মত বিদিশাদের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম মাত্র। মনটা ঘুরছিল মিশেলেরই আশেপাশে। তার দৃষ্টি আমাকে তাড়া করে ফিরছিল সারাক্ষণ।

আমি ভাবছিলাম সব কিছুই কি আমার শুধুমাত্র অনুমান হতে পারে? মিশেলের মনে যদি সত্যিই আমার জন্য কোন দুর্বলতা না থাকবে তাহলে এমন ব্যথিত দৃষ্টি ফুটে উঠবে কেন তার চোখে? বিদিশা অবশ্য বলে ফরাসীরা অত্যন্ত ছলাকলাপরায়ণ। প্রেম ওদের কাছে খেলার জিনিষ। কিন্তু মিশেলের সেই ভাবান্তর তো আকস্মিকভাবেই ধরা পড়েছে আমার চোখে। বিদিশার ব্যাখ্যা কি মেনে নেওয়া যায় এক্ষেত্রে?

আরও ভাবি ছলাকলার জন্য আমার মত মেয়েকেই বা বেছে নেবে কেন মিশেল? আমার না আছে চোখধাঁধানো রূপ, না আছে পোষাকের পারিপাটা। আলিয়ঁসের অনেক ছাত্রছাত্রীর তুলনায় অনেক সাদামাটা, অনেক নিষ্প্রভ আমি। তবু ভেবে পাইনা কেন তার দৃষ্টি আমাকে আলাদা করে দেয় সকলের থেকে।

একাই থাকি বা ভীড়ের মধ্যেই থাকি আমার দিকে তার একান্ত ব্যগ্র সদা উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সেটা একা আমার চোখেই পড়েনি। আরও কেউ কেউ সেটা লক্ষ্য করেছে। তা নিয়ে মন্তব্য করেছে। রসিকতা করেছে।

আজকাল অবশ্য অনেক সংযত, অনেক নিয়ন্ত্রিত দেখায় তার দৃষ্টি। কিন্তু হঠাৎ তার চোখে এই যে বিষণ্ণ মেদুর দৃষ্টি খেলে গেল তার কি কারণ হতে পারে?

সেকথা ভাবতে গিয়ে অন্য একটি চিন্তা মনে এল। উর্বশী লোগোঁ সংবাদ যাই হোক্ মিশেলের সঙ্গে সেভাবে তার কোন যোগসূত্র নেই। মনে হোল লোকচরিত্র বড় বিচিত্র। সত্য অসত্য মিলিয়ে নানা কথা রটনা করতে ভালবাসে লোকে। মিশেল শিল্পী, শিল্পরসিক। উর্বশীর শিল্পীসত্তাকে যদি সে মর্যাদা দেয় তার মধ্যে দোষটা কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিন্তার রাশ টেনে ধরি। দোষগুণের কথা আসছে

কেন? উর্বশীর সঙ্গে যদিই বা কোন নিভৃত সম্পর্ক গড়ে ওঠে মিশেলের তাহলেও সেটাকে দোষনীয় বলার কি এক্তিয়ার আছে আমার?

আমি কেন বার বার নিজেকে তার সঙ্গে জড়িয়ে এমন করে কষ্ট পাই? নিজের বয়সের কথা বারবার ভুলে যাই? আমার কেন এই দুর্মতি?

মনে হোলো এক মাসও বাকি নেই বিয়ের। এখনও আমি আকাশ-কুসুম কল্পনা করে নিজের দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে চলেছি! গম্ভীর-দর্শন রাগী চেহারার পাত্রের মুখ ভেসে উঠল মনশ্চক্ষে। ভবিতব্যের হাতে স্বপ্নসমৃদ্ধ এক উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে সুরু হতে যাচ্ছে বিবর্ণ বিষাদময় নিরানন্দ এক অধ্যায়। দুদিনের জন্য ভিন দেশের এক রাজপুত্র এসে আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে করে এনেছিল সুর, ছন্দ, স্বপ্ন।

রূপকথার সেই ঘোর এখন কাটিয়ে ওঠার পালা। স্বপ্নের রেশ মুছে ফেলে প্রস্তুত হতে হবে কঠিন রূঢ় বাস্তবের মোকাবিলা করার জন্য।

আমি বুঝতে পারছিলাম আমার মধ্যে শক্ত দড়ির বাঁধন ঢিলে হয়ে আলগা হয়ে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে হাড়, মাংস, মজ্জা। বেশিক্ষণ এখানে অবস্থান করা সমীচীন হবে না।

আমি জানিনা আমার মুখে তার কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল কিনা। কিন্তু বিদিশা আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এক প্রশ্ন করেছিল আর্তস্বরে।

—তোর কি শরীর খারাপ লাগছে মীনাক্ষী? তাহলে চল আমরা বেড়িয়ে যাই। ভাল করে দেখতে সময় লাগে। প্রদর্শনী তো কালও চলবে। কোন একজন সমঝদারকে ধরে বুঝে নেওয়া যাবে তখন!

—তাই চল্। আমার শরীরটা কেমন ভাল বোধ হচ্ছে না।

স্বাগতা থেকে গেল। ও বললো ওর পক্ষে কাল আসা হয়ত সম্ভব হবে না। বিদিশার পিছন পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছি এমন সময় পিছন থেকে এগিয়ে এল মিশেল আমার কাছে।

—কি হোল মাদমোয়াজেল? পুরো না দেখেই চলে যাচ্ছেন যে?

—আমার শরীর ভাল লাগছেনা। যদি পারি কাল আসব।

—আপনাকে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে। আজকাল আপনাকে দেখে আমার মনে হয় শরীর হয়ত ভাল চলছেনা আপনার।

—না না তেমন কিছু হয়নি। শুধু—

কি বলব ভেবে পাইনা। অর্ধপথে থেমে যাই। বিদিশা ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। ও হয়ত রাগ করছে। আমার দ্বিধান্বিত ভঙ্গী দেখে মিশেল কি মনে করে জানিনা। হঠাৎ ও এগিয়ে এসে দরজার দিকে পিছন করে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

—মাদমোয়াজেল! আমার দৃঢ় বিশ্বাস কিছু একটা হয়েছে আপনার। আমাকে বলতে পারেননা কি হয়েছে? কেন আপনি—

আর আত্মসংবরণ করতে পারি না। এতদিনের নিরুদ্ধ যন্ত্রণা বাঁধভাঙা বন্যার মত আগল মানতে চায় না। গ্লানি, অশান্তি, যন্ত্রণা আগামী দিনের নিরুত্তাপ জীবনের জন্য দুশ্চিন্তা আমাকে উতলা করে দিল মুহূর্তের মধ্যে। হঠাৎ সব কিছু কেমন ভাঙচুর হয়ে গেল।

—কিছুনা মঁসিয়ো।

এইটুকু মাত্র বলে ভেঙ্গে পড়ি আমি। দুচোখ প্লাবিত করে বইতে থাকে জল।

মিশেলকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসি 'অডিটোরিয়াম' থেকে। তার আগেই রুমালে চোখ মুখ মুছে নিয়েছিলাম অবশ্য।

লিফটের কাছে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বিদিশা। আমাকে দেখামাত্র বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে সে।

—কি করছিলি তুই? আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিলি। হঠাৎ কি মনে করে পিছিয়ে গেলি আবার?

—কিছুনা—বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু ততক্ষণে তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছে সে।

—তুই কাঁদছিলি মীনাক্ষী?

—লক্ষ্মীটি আমাকে আজকের মত মাপ কর। আমি কিছু বলতে পারব না আজ।

নীচে নেমে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করে বিদিশা।

—বাসে যাবি না ট্যাক্সি করে পৌঁছে দেব তোকে?

—না না ট্যাক্সির দরকার নেই। বাসেই যাব।

সারা রাস্তা দ্বিতীয় কোন বাক্যবিনিময় হয়নি আমাদের মধ্যে। কিন্তু বিদিশা যে মাঝে মাঝে আমাকে তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ্য করছিল তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না আমার।

॥ নয় ॥

শিল্প প্রদর্শনীর পব আব মাত্র দুদিন ক্লাস হয়েছিল আমাদেব। ক্লাসে যেতে লজ্জা কবছিল আমাব। মিশেলেব সামনে নিজেব হৃদয়দৌর্বল্য অনাবৃত হয়ে গিয়েছিল বলে।

কিন্তু এক সপ্তাহ পবে পবীক্ষা আমাদেব। আমি তাই প্রশ্রয় দিইনি আমাব সেই লজ্জা। মিশেল কিন্তু খুবই গম্ভীব হয়ে গিয়েছিল। পডানোব বাইবে বাডতি কথা বিশেষ বলছিল না। তাকে দেখে কেমন একটু চিন্তামগ্ন মনে হয়েছিল আমাব। আমাকে যেন একবকম এড়িয়ে চলছিল সে তখন থেকে। এমনিতে নিজেব চেয়াব ছেডে মাঝে মাঝেই উঠে আসত সে আমাদেব নিকট সান্নিধ্যে। বিশেষ কবে আমাব চেয়ারেব কাছে যখন সে প্রাযই চলে আসত তখন আমি ভয়ে শুঁযোপোকাব মত গুটিযে থাকতাম।

কিন্তু সেই ঘটনাব পব আশ্চর্য রকম সংযত হয়ে গিয়েছিল সে। আব তাব সেই গাম্ভীর্য আব সংযম দেখে লজ্জা যেন বেড়ে গেল আমাব আরও। আমাব মনে হোল সে আমাব মনটাকে ছবিব মত স্পষ্ট কবে দেখতে পেয়েছে। সেদিনেব সেই ঘটনাব পব আব কোন সংশয় নেই তাব। কিন্তু ব্যাপাবটা ঠিক এভাবে এতদূব গডাবে তা বোধহয় ভেবে উঠতে পাবেনি। হযত বিদিশাব কথামত বিদেশে অপবিচিত পবিবেশে কিছুটা আনন্দ খুঁজেছে। সেজন্য বেছে নিয়েছিল আমাকে, পরে উর্বশীকে। কিন্তু তার পবিণতি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। সে হযত ঠিক সেটাকে প্রশ্রয় দিতে চাইছে না।

এসব হিজিবিজি সাতসতেবো চিন্তা কবে আমাব মর্মযন্ত্রণা শতগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু ভেবে দেখলাম যা হবাব হয়েছে। তাবজন্য অনুশোচনা কবে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। অতঃপব শক্ত বাশ টেনে নিজেকে সামাল দিতে হবে। যাতে অনুরূপ ঘটনাব পুনবাবৃত্তি আব না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হোল তা আব সম্ভাবনা সুদূবপবাহত। সামনেই পবীক্ষা। পবে সবই বিসর্জন দিয়ে নিজেকে বলিদান। এব মাঝে বাডতি সময় কোথায আবেগেব স্রোতে ভেসে যাওয়াব?

যথাসময়ে পবীক্ষা হয়ে গেল। ফলাফল ঘোষণা হতে দেখলাম শীর্ষস্থান

অধিকার করেছি আমি। একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না সেটা। তাই আনন্দে অধীর হইনি। অতঃপর ফরাসী চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে তীব্র বিষাদে ভরে গেল মন।

তার পরেই পড়ে গেল গরমের ছুটি। আলিয়ঁসে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আমার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেন। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। বাড়িতে জোরদার হয়ে উঠল আসন্ন বিবাহের প্রস্তুতি। শাড়ি গয়না আসবাব বাসনপত্রের ব্যবস্থা করা, নিমন্ত্রণ চিঠি ছাপানো, নিমন্ত্রণের তালিকা প্রস্তুত করা ইত্যাদি হাজারটা কাজে মশগুল হয়ে গেল বাড়ির সকলে।

প্রতিদিনই এ সে আসছে, চাপানাদি গল্পগুজব করে আবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। সেই হাসিগল্প ব্যস্ততার মধ্যে অন্য চিন্তার ফুরসুৎ ছিল না যেন। যে অনিবার্য এগিয়ে আসছে তাকে সাগ্রহে বরণ করে না নিতে পারি। কিন্তু তাকে গ্রহণ না করে উপায় নেই। ফাঁসির আসামীর মত চরম দিনটির জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম।

তবু অবুঝ হয়ে উঠত মন মাঝে মাঝে। পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের ঠাট্টা মস্করা ভাল লাগত না। কেউ কেউ বলত আমার অনেক পুণ্যের ফলেই এত বয়সে এমন সুপাত্র জুটেছে। শুনে রাগ হয়ে যেত। বলতে ইচ্ছা করত তোমাদের চোখে সকলে দেখেনা আমাকে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও চোখের সামনে ভেসে উঠত মিশেলের মুগ্ধ দৃষ্টি। ফরাসী দেবদর্শন এক যুবকের চোখে আমি কতটা আকর্ষণীয় তা ওদের শোনাতে ইচ্ছা করত।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতাম। 'ছিঃ মীনাক্ষী সেন! তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল? নিজের বয়সের কথা পরিবারের কথা বেমালুম ভুলতে বসেছ? একটি যুবকের কাছে মনোলোভা হয়েছ বলে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে উঠেছ অল্পবয়সী হাল্কা স্বভাবের মেয়ের মত? বয়সোচিত গাম্ভীর্য, মর্যাদাবোধ সব খুইয়ে এমন অন্তঃসারশূন্য হয়ে উঠেছ?

মনে পড়ত শেষের দিকে ক্লাসে মিশেলের গম্ভীর চিন্তামগ্ন চেহারা। মরমে মরে যেতাম বারবার। ভাবতাম আমার ফাঁপা অহঙ্কারের যোগ্য শাস্তিই পেয়েছি। মনে মনে আকাশ কুসুম কল্পনা করলে তার পরিণতি অন্যরকম হতে পারে না। বঞ্চিত মানুষের মত হঠাৎ কিছু পাওয়ার আশায় হিতাহিতবোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম। অপরপক্ষের যে ন্যূনতম স্বীকৃতিটুকু প্রয়োজন হয় সেটুকুর পর্যন্ত অপেক্ষা করিনি। সে আমাকে মুখ ফুটে

কোনদিন কিছু ব্যক্ত করল না। অথচ অপরিণতবুদ্ধি কিশোরীর মত কল্পনায় স্বর্গ তৈরি করে ফেললাম! নিজের শিক্ষা, সংস্কার সব জলাঞ্জলি দিয়ে হঠাৎ উন্মত্তের মত দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটেছিলাম। উচিত প্রতিফলই পেয়েছি আমি তার।

এসব ভাবতাম। ভেবে নিজেকে শান্ত করতাম। তবুও হঠাৎ কোন অসতর্ক মুহূর্তে জলাশয়ের শান্ত জলে ছোট্ট একটি ঢিল পড়ত। আলোড়ন চলত তার অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে বিদিশা আসত। শাড়ি গয়না দেখত। গল্পগুজব করে আবার চলে যেত। ওকে দেখে ও খুশি না অখুশি বোঝা যেতনা। ওর সেই নির্বিকার, নিরুত্তাপ ভঙ্গী দেখে আমি অবশ্য অবাক হতাম না। জীবনে এমন এক শক্ত আঘাত পেয়েছে যে মেয়ে তার মধ্যে উচ্ছ্বাস আতিশয্যের আড়ম্বর দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সে যে সেদিনের সেই ঘটনা সম্পর্কে একটিও প্রশ্ন করল না সেটা আমার ভারী আশ্চর্য লেগেছিল। একপক্ষে আমার স্বস্তির কারণ হয়েছিল সেটা ঠিকই। তবে খুব স্বাভাবিক লাগেনি ব্যাপারটা।

বিয়ের সপ্তাহখানিক আগের কথা। নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়ে গেছে দূরের জায়গায়। বাকি শুধু কাছাকাছি জায়গায় নিমন্ত্রণ করা। বাড়ির সকলের সম্মিলিত অনুরোধের চাপে ছুটি নিতে হোল স্কুলে। অতদিন আগে ছুটি নেওয়ার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। স্কুলে হেডমিস্ট্রেসও একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বাড়ির কথাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে হেডমিস্ট্রেস আর আপত্তি করতে পারলেন না।

বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে বাড়িতে হয়নি। তারজন্য আফশোষ আজও বড় কম নেই কারুর। মা জ্যাঠাইমা মিলিতভাবে তার শোধ তুলতে লাগলেন আমাকে দিয়ে। সরময়দা, কাঁচা হলুদ চিনেবাদাম বাটার রূপটানে আমার বয়স, শ্রী ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হতে লাগল। প্রতিরোধ করতে পারলাম না আমি। শুধু কি তাই? আমার যা খেতে ভাল লাগে তা খাইয়ে সত্যি সত্যিই বলির পাঁঠা করে তুলল আমাকে বাড়ির লোকে।

এই সময়ে প্রায়ই একটা কথা মনে হোত। মায়েরা যাকে 'বিয়ের ফুল ফোটা' বলেন তা এতদিন ফুটল না। যখন ফুটল হৃদয় তখন আর অক্ষত নেই আগের মত। আগের ছোটখাট দুর্বলতাগুলি তেমনভাবে দাগ কাটেনি

মনে। সেগুলির এতটুকুও রেশ নেই আজ। কিন্তু মিশেলপর্বকে ঠিক তেমনভাবে জলের দাগ বলা যাচ্ছে না। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস মানুষের জীবনে!

এর মধ্যে একদিন দুপুরে হঠাৎ এসে হাজির বিদিশা। তখনও স্নান করতে যাইনি আমি। স্নানপর্বের আগে সরময়দা হলুদবাটায় গাত্রমার্জনা করে দিয়েছিলেন জ্যাঠাইমা। আমাকে দেখে হাসে বিদিশা।

—সুন্দরী হতে চাইছিস? চেহারায় জেল্লা আনতে চাইছিস?

—ধ্যুৎ! এই কয়দিন এসব মেখে যদি চেহারায় জেল্লা আসত তাহলে আর চিন্তা ছিল না। সকলেরই চেহারায় জেল্লা দেখা যেত তাহলে। কিন্তু আমি নিরুপায়। জ্যাঠাইমা যদি এসব মাখিয়ে একটু সুখ পান তাহলে তাতে বাদ সাধি কেন? কটা দিন বৈত নয়!

—তা ঠিক।

অন্যমনস্ক দেখায় বিদিশাকে। কি যেন একটা ভাবছে ও নিবিষ্ট মনে। ওকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত একটা চিন্তা খেলে যায় আমার মাথায়। নিজের প্রয়োজনেই এসেছে আজ ও। আমার খবরাখবর করতে এরকম অসময়ে আসেনি। ওর উদাস, অন্যমনস্ক, বিমনা ভাবভঙ্গীতেই ধরা পড়ছে সেটা। তবে প্রয়োজনটা ঠিক কি তা অনুমান করতে পারি না।

আমরা দুজনেই নিশ্চুপ। আমার অস্বস্তি উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। স্নানের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। অবেলা হয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। ভদ্রতা রক্ষা করে কথা বলবেন না মা কিংবা জ্যাঠাইমা। বিদিশা বোধহয় বুঝতে পারে আমার অস্বস্তি।

—মীনাক্ষী। আমি বসব খানিকক্ষণ। তুই স্নান সেরে আয়। অবেলায় স্নান কিংবা খাওয়া ঠিক নয় এই সময়ে। এরপর অনেক হ্যাপা সামলানোর ব্যাপার আছে।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে স্নান সেরে আসি। এসে দেখি বেশ জমিয়ে বসেছে বিদিশা মা আর জ্যাঠাইমার সঙ্গে।

—এণাক্ষীদিকে আনবেন না মাসিমা?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ও এরকম একটা দুঃসাহসী প্রশ্ন করছে দেখে। আমাদের বাড়িতে এমন অনায়াসে দিদির নামোচ্চারণ হয়না বহুকাল। আমার বিয়ের মরশুমে রাশ কিছুটা ঢিলে হয়েছে ঠিকই।

ঠারে ঠোরে দিদির প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। কিন্তু ওর মত সদাসতর্ক সাবধানী মেয়ে সোজাসুজি এরকম প্রশ্ন করবে তা যেন একেবারেই অকল্পনীয়।

বিষণ্ণ মনমরা দৃষ্টিতে মা তাকান জ্যাঠাইমার দিকে। নিজে কোন জবাব খুঁজে পাননা বলে। জ্যাঠাইমা মুখ রক্ষা করেন।

—আমাদের তো আর অসাধ নেই। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। বাড়ির কর্তারা যদি আনান তাহলে আসবে এণা। আমাদের মা হাত পা একেবারেই বাঁধা।

—তা হয়তো সত্যি। কিন্তু বাড়ির বড় মেয়ে। বোনের বিয়েতে সে উপস্থিত থাকবে না—সেটা একটু কেমন দেখাবেনা জ্যাঠাইমা?

বুঝতে পারি জ্যাঠাইমাও আমার মত অবাক হয়ে গেছেন। তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে নির্ভেজাল বিস্ময়। গম্ভীর, স্বল্পভাষী বিদিশা। ছোটবেলা থেকে ওকে চেনে বাড়ির সকলে। তার পক্ষে এরকম একটা অলিখিত নিষিদ্ধ বিষয়ে কথা চালিয়ে যাওয়া ভাবাই যায় না। তবু পলকের মধ্যে সেই বিস্ময় চাপা দিয়ে একরকম ঝাঁজিয়ে ওঠেন জ্যাঠাইমা।

—বাড়ির বড় মেয়ের আচরণটা কি বড় মেয়ের মত হয়েছে? কারুর কথা শুনল না, মানল না। হুট করে একটা ভিন জাতের ছেলেকে বিয়ে করে বসল। তার জন্য ছোট বোনটার বিয়েতে যে বিঘ্ন হতে পারে সে কথাটাও একবার ভাবল না! আমাদের ভাগ্যি ভাল মীনার শ্বশুরবাড়ি থেকে তারজন্য কোনরকম আপত্তি তোলেনি কেউ।

বিদিশা পুরোপুরি মেনে নেয়না যেন।

—সে যা হবার হয়েছে। এখন বাড়িতে এমন একটা শুভ কাজ হতে যাচ্ছে। এণাক্ষীদিকে আনান আপনারা।

মা বা জ্যাঠাইমা কোন জবাব দেন না। পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করি আমি স্বয়ং। প্রসঙ্গান্তরে চলে এসে।

—তোর তাড়া নেই তো? খেতে খেতে কথা হবে। আয়।

—আমি খেয়ে এসেছি। তোরা খেয়ে নে। এখানেই বসি আমি।

এবার মা ও জ্যাঠাইমা সমস্বরে প্রতিবাদ করেন।

—এটা কোন কথা হোল? সেই কখন খেয়ে এসেছ? বাসে করে আসতে আসতে হজম হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে অল্প করে চাট্টি খেয়ে নেবে এস।

দ্বিরুক্তি করেনা বিদিশা এরপর। বাড়ির পুরুষেরা কেউ তখন বাড়িতে ছিল না। একচ্ছত্র মহিলামহল। এটাসেটা আলতু ফালতু আলোচনা করতে করতে খাওয়া সারা হোল। খাওয়ার পর বিদিশাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে আসি। আমার মনে এতক্ষণ ধরে যে প্রশ্নটা দুর্বার হয়ে উঠেছিল তা ব্যক্ত করি দ্বিধার সঙ্গে।

—আমার কেবলই মনে হচ্ছে বিদিশা আজ তুই কিছু একটা বলতে এসেছিস। মা জ্যাঠাইমা ছিলেন বলে এতক্ষণ কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

সঙ্গে সঙ্গে ধরা দেয়না বিদিশা। আমাকে একটু খেলাবার চেষ্টা করে হেসে।

—তাই বুঝি? তা তুইই বল কি বলতে এসেছি?

ওর গলায় কৌতুকের ছোঁয়া। উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলাম আমি।

ইদানীং বিদিশার স্বভাবে যে কাঠিন্যের প্রলেপ পড়েছে তার সঙ্গে এই কৌতুক, এই হেঁয়ালি, এই রঙ্গরসের অবতারণা একেবারে বেমানান। আমার বিস্ময় গোপন করি না।

—কিছু মনে করিস না। খুব আশ্চর্য লাগছে তোর কথাবার্তা। মনে হচ্ছে বিশেষ কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। আর সেটা বলবার জন্যই ছুটে এসেছিস তুই এখানে।

আর হেঁয়ালি করেনা বিদিশা।

—তুই ঠিকই অনুমান করেছিস। তোকে কয়েকদিন ধরে বলব বলব করছি কিন্তু বলতে পারছি না। কিছুদিন থেকে ঘনঘন লিখছে আমাকে সুব্রত। ও মিটিয়ে ফেলতে চাইছে। প্রথম প্রথম ওর চিঠির কোন জবাব দিইনি। এখন ওর চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি খুবই অনুতপ্ত ও। আর শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি সবখান থেকেই আমাকে অনুরোধ করছে আমি যেন পুরনো কথা ভুলে যাই। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি। তুই কি বলিস মীনাক্ষী? আমি যেন কেমন দোটানায় পড়েছি।

—আমি কি বলব বল? এটা সম্পূর্ণভাবে তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে মনের দিক থেকে যদি তুই সে ব্যাপারে সাড়া পাস তাহলে তো কথাই নেই। মানুষ মাত্রেরই ভুল হতে পারে। সেই ভুল বুঝতে পেরে যদি সে অনুতপ্ত হয় তাহলে তার জন্য ক্ষমাও পেতে পারে। আমি আগেও তো তোকে এই এক কথাই বলেছি। তুইই গোঁয়ার্তুমি করে কিছু বুঝতে

চাসনি।

—তবে আমি একটা শর্ত রেখেছি বুঝলি? ফ্রান্সে থাকা চলবে না। ও যদি এখানে এসে থাকে তাহলেই আমি ওর প্রস্তাবে রাজী।

—বিদিশা কিছু মনে করিস না। তোর ঘাড় থেকে এই ফ্রান্স আর ফরাসী বিদ্বেষের ভূত নামানো দরকার। খারাপ ভাল সব দেশেই আছে। আমাদের দেশে কি এ রকমের ব্যাপার হচ্ছে না?

—অনেক কম। আমি সেদেশে ছিলাম। ওদের ভাল করে দেখেছি কাছে থেকে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনাই হয় না। আমি তো তোর জন্য ভয় পাচ্ছিলাম।

অনুমান করতে পারি কি বলতে চাইছে ও। তবু স্পষ্ট করে সেটা শোনার বাসনা ত্যাগ করতে পারি না।

—আমার জন্য ভয় পাচ্ছিলি মানে?

—আমার মনে হচ্ছিল তোর সঙ্গে মঁসিয়ো বেঁরতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হতে যাচ্ছে। আমি নিজে ভুক্তভোগী। তোরও আমার মত তিক্ত কোন অভিজ্ঞতা হয় তা আমি চাইনি। এখন উর্বশী যে মঁসিয়োর দিকে ঝুঁকেছে সেটা একপক্ষে মঙ্গলই হয়েছে।

এই প্রসঙ্গ ভাল লাগে না আমার। উর্বশীর আচার-আচরণ যেমনই হোক, গুণী শিল্পী সে। আগে তার সেই পরিচয় জানা ছিল না। তার সম্পর্কে অনেক বিরূপতা পোষণ করেছি আমি নিজেও। এখন আমার মনে হয় এভাবে ওপর ওপর দেখে বিচার হয় না সব কিছুর। তাতে ভুলভ্রান্তি থেকে যায়।

আর মঁসিয়োর সম্পর্কেও এভাবে কোন ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। আমি নিজেও আগে কষ্ট পেয়েছি এসব চিন্তায়। সেদিন চিত্রপ্রদর্শনীতে গিয়ে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো যেন আমার। হঠাৎ যেন কুয়াশার পর্দাটা সরে গিয়েছিল আর চোখের সামনে যা প্রত্যক্ষ তার অন্তরালে অন্য কিছুর আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এখন আমার মনটা হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট, জ্বালা ছটফটানি কমে গেছে। মনে হচ্ছে এক শিল্পী অপর শিল্পীর প্রতি যে আকর্ষণ বোধ করে সেটা নিছক দেহসর্বস্ব স্থূল কামনা হতে পারে না। মিশেলের প্রতি আমার দুর্বলতা আজও নির্মল হয়নি। সেজন্য আমার কষ্ট

আজও আছে। তবু আমি যে একজন কামপরায়ণ মানুষের জন্য ব্যাকুল হইনি সেটা উপলব্ধি করে নিজের প্রতি অনাস্থা দূর হয়েছিল অনেকখানি।

বিদিশাও প্রত্যক্ষ করেছে উর্বশীর শিল্পপ্রতিভা। তবু যেন ওর সম্পর্কে আপত্তি তার যাবার নয়। আমার মনে কিন্তু অনেক বাঁধন খসে খসে পড়ছে। তর্কের স্পৃহাও হয়ত চলে গেছে সে কারণেই।

—তুই প্রথম থেকেই একটু বেশি ভয় পাচ্ছিলি। অথচ তেমন কোন কারণ ঘটেনি। তা সে যাই হোক্ এখন যে তোর ভয় দূর হয়েছে সেটাও সমান মঙ্গলের ব্যাপার।

—আচ্ছা মীনাক্ষী! একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? সেদিন মঁসিয়ো তোকে কি বলেছিলেন?

আচমকা এই প্রশ্ন শুনে হতবাক হয়ে যাই। সেদিন প্রশ্ন করাটা স্বাভাবিক ছিল বিদিশার পক্ষে। অথচ তখন একেবারে নীরব ছিল ও সে ব্যাপারে। এতদিন পরে আজ ওর কৌতূহল নিবৃত্তি করতে চাইছে। খুবই আশ্চর্য! একবার ভাবলাম ওকে জিজ্ঞাসা করি সেদিন কেন চুপ করে ছিল ও। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হোল কি দরকার? মনে মনে যে খেলাঘর বেঁধেছিলাম তাতো ভেঙ্গে দিয়েছিই। আর কেন অকারণে তা নিয়ে উচাটন হওয়া? স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই জবাব দিই বিদিশার প্রশ্নের।

—তেমন কিছু নয়। মঁসিয়ো জিজ্ঞাসা করছিলেন আমার শরীর কেমন আছে?

—শুধু এই কথা? তাহলে তোর চোখে জল এসেছিল কেন?

তীক্ষ্ণ চোখে আমায় লক্ষ্য করে বিদিশা।

—আমি মিথ্যা বলছি না বিদিশা। মঁসিয়ো কাঁদাবার মত কোন কথা সত্যিই বলেননি। আমার শরীর মন ঠিক ছিল না। হঠাৎ চোখে জল এসে গিয়েছিল কেমন।

একটুক্ষণ চুপ করে কি ভাবে বিদিশা। পরে গলার স্বর আস্তে করে ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে আমায়।

—তুই মিশেলকে ভালবাসিস। তাই না মীনাক্ষী?

ওর গলায় বিষাদের ছোঁয়া। এতদিন স্পষ্ট করে একরকম কোন প্রশ্ন করেনি বিদিশা। অথচ সেটাই স্বাভাবিক ছিল। ওর জীবনে যে পরিবর্তনের আভাস এসেছে তা ওর স্বভাবের মধ্যেও কেমন একটা পরিবর্তন

এনে দিয়েছে। ইদানীং ওর মধ্যে যে কাঠ কাঠ রুক্ষতা দেখা যায় তা যেন শ্যামল ছোঁয়ায় কোমল লাবণ্য ধারণ করেছে। অনেক বেশি ঢিলেঢালা, শিথিল হয়ে উঠেছে ও। আর অসতর্কও বুঝি। কিংবা বিপদ কেটে গেছে মনে করে সহজ হতে পারছে ও এখন।

—এতদিন পরে এই প্রশ্ন ? আগে তো কোনদিন ঠিক এ ধরনের প্রশ্ন শুনিনি তোর মুখে বিদিশা ?

—প্রশ্নটা মুখে হয়ত আজ করছি। কিন্তু অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে গুনগুন করছে। কিন্তু বিষয়টা ঠিক খেলা করবার মত নয় বলে চুপ করে থেকেছি।

—তাহলে আজও মুলতবি থাকতে পারত সেটা। কয়েকদিন বাদেই বিয়ে হচ্ছে আমার ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে। মনে প্রাণে এখন তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এখন এই প্রশ্ন খুবই বিপজ্জনক।

—জবাব পেয়ে গেছি মীনাক্ষী। তবু একটা কথা বলি। যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে। দেখবি সময়ের সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে। এণাক্ষীদির অবস্থা তো দেখেছিস। দিদির মত ভুগতে হোত তোকেও। হয়ত বা আরও বেশি। আমি সেজন্যই প্রশ্রয় দিইনি। আমার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার শুধু ছিল না। তোকে একটা কথা বলি বলি করেও বলিনি। আজ বলছি। কিছুদিন আগে তোদের বাড়ি এসেছিলাম। তুই বাড়ি ছিলি না। মেসোমশায় আমাকে মঁসিয়ো বেরঁতার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কবে থেকে তোর সঙ্গে আলাপ, ওর সঙ্গে তোর কিরকম সম্পর্ক এইসব। আমি ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের জবাব দিয়ে গেছি। বলেছি মীনাক্ষী ভাল ছাত্রী বলে মঁসিয়ো পছন্দ করেন ওকে। এর বেশি কিছু আমি অন্ততঃ জানিনা। মনে মনে ভাবছিলাম এসব খবর মেসোমশায় জানলেন কি করে ? কিন্তু আমাকে কোন প্রশ্ন করতে হোল না। মেসো-মশায় নিজেই বললেন যে ওঁর এক বন্ধুর ছেলের কাছে মিশেলের সঙ্গে তোর অভিনয় করার কথা জানতে পেরেছেন। সে নাকি আলিয়ঁসেই পড়ে। বললেন প্রথমে শুনে খুব অবাক লেগেছিল ওঁর। কারণ তুই যে অভিনয় করতে পারিস তা ওর জানা ছিল না। আর দ্বিতীয়তঃ বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে একজন সাহেবের সঙ্গে যে এভাবে অভিনয় করবি সেটা নাকি বিশ্বাসই হতে চাইছিল না ওর। বাড়িতে জানেনা তোর অভিনয় করার

কথা ?

—বাবা বা জ্যাঠামশাইকে জানাইনি। ইচ্ছা করেই। ওঁরা মত দিতেন না। জ্যাঠাইমা আর মাকে অনেক বলে কয়ে রাজী করিয়েছিলাম। সে কথা থাক্। কিন্তু ছেলেটি কে জানিস ? ওর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলি ?

—ছেলেটি নাকি ওর নামোল্লেখ করতে নিষেধ করেছে। ওর কথাবার্তা শুনে মেশোমশায়ের মনে হয়েছে যে তোদের মধ্যে কোন একটা সম্পর্ক হয়ত তৈরি হয়েছে। আমি ওঁকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে স্বার্থদুষ্ট লোকেরা উল্টোপাল্টা অনেক কথাই বলতে ভালবাসে। ক্লাসের অনেকেই ওরকম অভিনয় করেছে। মীনাক্ষীর কথা নিয়ে ছেলেটি কেন বিশেষভাবে আলোচনা করেছে তা বুঝতে পারছিনা আমি। আর ওর উদ্দেশ্য যদি সৎ হতো তাহলে নিজের নামটা গোপন রাখতে বলত না। শুনে যেন স্বস্তি পেলেন মেশোমশাই। বললেন আমিও তাই ভাবলাম যে সেরকম কিছু ঘটলে কি আর আমার কানে আসতনা ? আমি ওঁকে তখন বললাম আমি অন্ততঃ জানতে পারতাম। তা শুনে কাতরভাবে কি বললেন জানিস ?

—কি বললেন ?

—বললেন 'আসলে কি জান ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। আমার অবস্থাও তেমনি। বড় মেয়ে যে আঘাত দিয়ে গেছে তা এ জীবনে আর শুকোবেনা। এখন ছোটটিকে যদি ঠিকমত পাত্রস্থ করতে পারি তাহলে কিছুটা স্বস্তি পাই। অথচ কোন সম্বন্ধই লাগছেনা। আমার ভয় সেজন্যই।'

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম বিদিশার কথা। আমাদের অজানতে কত কি ঘটে যায় ! অথচ উটপাখির মত বালিতে মুখ ডুবিয়ে ভাবছিলাম আমাদের বাড়িতে মিশেল সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও কেউ জানেনা। অতি-হিতৈষী যে ছেলেটি বাবাকে ওসব খবরাখবর দিয়েছে সে কে তা জানতে ইচ্ছা করছিল। হয়ত বাবা বিদিশার কাছে তার নামোল্লেখ করেছেন। অপ্রয়োজন বোধে বিদিশা বলছেনা আমায় সেকথা।

আশ্চর্য বাবা যে এখবর পেয়েছেন তা তার হাবভাব আচরণেও ধরা পড়েনি। মনে হচ্ছিল অভিনয়ে বাবাও কম পারদর্শী নন। যে খবর তার কানে এসেছে তাতে তার আদৌ খুশি হবার কথা না। অথচ নিজের

মনোভাব গোপন রেখে দিয়েছেন এতদিন। তার কারণ কি হতে পারে চিন্তা করে মনে হোল বিদিশার কথা পুরোপুরি হয়ত বিশ্বাস করেননি বাবা। দিদির ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তির ফল ভাল হয়নি দেখেছেন। আমার ক্ষেত্রে অন্য পদ্ধতি অবলম্বনের কথা ভেবেছেন তাই।

বাড়িতে আর কে মিশেলের কথা জানে চিন্তা করছিলাম। যদি জেনেও আমাকে কিছু না বলে তাহলে বলতেই হবে অত্যন্ত অভাবিত এ জিনিষ আমাদের পরিবারে। বিদিশাকে জিজ্ঞাসা করা যায়। কিন্তু ইচ্ছে হোল না। তারের কাছে এসে পৌঁছেছি। অন্য পাড়ের কথা চিন্তা করে আলোড়ন করে কি লাভ?

—এখন বুঝতে পারছি ইদানীং বাবা কেন এত ক্ষেপে উঠেছিলেন নতুন করে আমার সম্বন্ধ খোঁজার ব্যাপারে। পাছে দিদির মত আমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই সেই ভয়ে খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত ধরে এনেছেন যাহোক্ একটা সম্বন্ধ!

—যাহোক্ বলছিস কেন মীনাক্ষী? মামিমাদের কাছে যতটুকু শুনলাম তাতে পাত্র তো ভালই মনে হচ্ছে। মোটামুটি ভাল চাকরি। নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। স্বভাব চরিত্রও শুনলাম ভাল। আমার তো শুনে ভালই লাগল।

—তুই ঠিকই বলেছিস বিদিশা। মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার মত এত বয়সের মেয়ের পক্ষে এরকম পাত্র তো সুপাত্রই। তবু কি জানিস? হয়ত আমার পক্ষে এখন এসব বলা সমীচীন নয়। কিন্তু আমার কেন যেন একটুও ভাল লাগছে না। প্রথম দর্শনেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকের মনেই তো কল্পনা থাকে, স্বপ্ন থাকে? আমার সেই কল্পনার সঙ্গে স্বপ্নের সঙ্গে এতটুকুও যেন মিলছেনা। আমি যখনই ভাবি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে সারাজীবন কাটাতে হবে স্বামী স্ত্রীর মতো তখনই সবকিছু কেমন তেঁতো বিস্বাদ হয়ে যায়!

—আমি জানি কেন এটা হচ্ছে। মিশেলের সঙ্গে যদি তোর দেখা না হতো তাহলে হয়ত কোন অসুবিধা হোতনা তোর ধূর্জটিপ্রসাদকে মেনে নিতে। তবে একটা কথা মনে রাখিস মীনাক্ষী। বাইরের চটকটা অল্পদিনের। বেশিদিন শুতে মন ভরেনা। সুব্রতকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল যেমনটি চেয়েছি ঠিক তেমনটি যেন ও। হু

বছর খুব সুন্দর কেটেছিল। তারপরেই তো গোল বাঁধল।

—তুই এখনও সুব্রতকে খুব ভালবাসিস তাই না?

—তা বাসি। তবে ওর ব্যবহারের কথা মনে করলে এখনও রাগে রি রি করে সারা শরীর। এখন সুব্রত যদি মেনে নেয় আমার শর্ত তাহলে হয়ত আবার আমাদের ছেঁড়াখোঁড়া সম্বন্ধ জোড়া লাগবে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় পুরোপুরি জোড়া হয়ত তাতেও লাগবেনা। জীবন থেকে এই গ্লানির স্মৃতি তো একেবারে মুছে ফেলা যাবেনা।

চুপ করে শুনি বিদিশার কথা। ওর বক্তব্যের মধ্যে যে যুক্তি আছে তা অকাট্য মনে হয়। বাইরের চটক মানুষকে সত্যিই খুব বেশি কিছু দিতে পারে না। তা সাময়িক মোহ বা উচ্ছ্বাসের আবর্ত তৈরি করে। সুখ শান্তি নির্ভর করে অন্তর সম্পদের উপর। চটকসর্বস্ব মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা কি আমার অজানা?

কিন্তু মিশেলের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেব ভাবলেও তা ঝেড়ে ফেলা যায় না। তার আশ্চর্য সুন্দর যুবকশরীরের মধ্যে অধিষ্ঠান করছে অন্তঃসারশূন্য মন তাকে দেখলে, তার দীপ্ত চোখের গভীর অতল দৃষ্টি লক্ষ্য করলে সে কথা ভাবতেই পারি না। তার আচরণ, তার আলাপের মধ্যে কোথায়ও নেই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের আড়ম্বর।

তবু সুদূর আকাশের তারার মতো আমার কাছে সে দুর্লভ। ঘুমের ঘোরে সুন্দর স্বপ্ন দেখে যে মানুষ, জেগে উঠে সে তাকে প্রত্যাশা করতে পারে না কোনমতেই। তাই বলে তাকে চটকসর্বস্ব সুন্দরদর্শন পুরুষ বলে অশ্রদ্ধা করতে বড় কষ্ট হয়। মনের মধ্যে কোথায় যেন টান লাগে।

বিদিশাও চুপ করে ভাবছিল কিছু। আমাকে নীরব দেখে অল্প হেসে আবার সেই প্রশ্নে ফিরে আসে।

—আমি বলেছিলাম জবাব চাইনা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তোর মুখ থেকেই শুনি কথাটা। তুই মিশেলকে সত্যি খুব ভালবাসিস তাই না?

—'সখি ভালবাসা কারে কয়?' আমি মাঝে মাঝে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা ভালবাসা কাকে বলে? কত রকমের ভালবাসার কথা পড়েছি গল্প উপন্যাসে। শুনেছি লোকের কাছে। প্রকৃত অর্থে সে কি জিনিষ তা নিয়ে বড় দ্বন্দ হয় মনে। তবু সব শুনে টুনে ভালবাসার জন্য, ভালবাসা পাওয়ার জন্য বড় লোভ ছিল। তোর প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে মিশেলকে ভালবাসি

কিনা আমি নিজেও হয়ত জানি না। শুধু বুঝি ওর জন্য আমার বুকের ভেতরে খুব কষ্ট হয়। ও যতক্ষণ কাছে থাকে ততক্ষণ একটা সুরভির মত অনুভূতি ঘিরে থাকে আমায়। আমার শরীর মনে বাজনা বাজতে থাকে। ও যখন দূরে সরে যায় তখন তীব্র কষ্টে ছটফট করে আমার শরীর মন অনুভূতি। তোর কথা শুনে নিজেও নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম। আমি কি তার চেহারার চটক দেখে মোহিত হয়েছিলাম? মনে হোল যদি সেটা চটকের মোহ হোত তাহলে কি এমন বুকভাঙা যন্ত্রণা সইতে হোত?

—মিশেল কি তার মনোভাব জানিয়েছিল কোনদিন?

—তা যদি জানাত তুই ঠিকই জানতে পারতিস। আমার প্রতি ওর মনোভাব কেমন সে সম্পর্কে আমার নিজের মনেই যথেষ্ট সংশয় আসে। আগে মনে হোত ও আমাকে ভালবাসে। এখন মনে হয় হয়ত আমি ভুল বুঝেছি। ও আমাকে অপছন্দ না করলেও ঠিক ভালবাসেনা হয়ত। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। ওর থেকে আমি বয়সে বড়। ওর চেহারা যথেষ্ট সুন্দর। ওর মত প্রতিভা নেই আমার। তুলনায় অনেক সাধারণ আমি ওর থেকে। আমার প্রতি ওর মনোভাব অন্যরকম হওয়াটাই আশ্চর্যের।

—নিজেকে অতটা ছোট করে দেখিসনা মীনাক্ষী। তোর চেহারা, গুণপনা কোনটাই অপছন্দ করার মত নয়। আমি ভাল করেই জানি অনেকেই তোকে পছন্দ করে। মিশেলের গায়ের রং সাদা। সে জাতে ফরাসী। বয়সে তোর চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। সেগুলিই যদি তার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হয় তাহলে তাকে শ্রেষ্ঠ বলতে আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হোলো এই জিনিষগুলোই কি কোন মানুষের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হতে পারে?

—এসব আলোচনা থাক বিদিশা। আলিঁয়সের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকছেনা। নতুন পরিবেশে নতুন করে জীবন সুরু করতে যাচ্ছি। তুই প্রশ্ন করলি বলে অনেক কিছু বলে ফেললাম। আমার অনুরোধ তৃতীয় কোন ব্যক্তির কানে যেন না আসে এসব কথা।

—তার কি কোন সম্ভাবনা আছে? তুই তো ক্লাস করছিস না আর। আলিঁয়সের অধ্যায় একরকম শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তোর কথা বলছেই বা কে আর বললে শুনছেই বা কে?

—আমার কথা তো অনেকক্ষণ হোলো। এখন তোর কথা হোক্। সুব্রত যদি রাজী না হয় এখানে ফিরে আসতে তাহলে তুই কি করবি?

—কি আর করব? আরও ভাল কোন চাকরির চেষ্টা করব। গীটারের চর্চা বাড়িয়ে দেব। লাইব্রেরিতে খুব পড়াশোনা করব। তবে বিয়ে আর করব না এটুকু নিশ্চয় করে বলতে পারি। ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায়?

—আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? যদি একবারও বেলতলায় না যেতে হোত ভাল হোত। বিয়ে না করার এক জ্বালা। বিয়ে করার শত জ্বালা।

—আমাকে দেখে বলছিস একথা?

—নারে তোকে দেখে শুধু নয়। নিজেদের বাড়িতেও দেখছি তো। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এভাবে চিন্তা করিনি। আমাদের পরিবারে মেয়ে-সন্তান বিয়ে করবে না এ একরকম ভাবাই যায় না। আমিও ভাবিনি। বয়স হয়ে যাচ্ছে অথচ বিয়ে হচ্ছে না বলে মরমে মরেছিলাম এতদিন। এখন সব কিছু অন্যরকম করে ভাবি। মনে হয় বড়দা, দাদা—ওরাও তো বিয়ে করেনি। আমিও যদি ওদের মত বিয়ে না করার স্বাধীনতা পেতাম কত ভাল হতো!

—সত্যি খোকনদার জন্য খুব কষ্ট হয়। বাবার জেদের জন্য নিজের পছন্দমত বিয়ে করতে পারলেন না। আজকালকার দিনে ভাবাই যায় না!

—বড়দা কিন্তু তার জন্য মনে মনে গর্ব পোষণ করে। ও কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে সেকথা দিদিকে বোঝাতে গিয়েছিল। দিদি ছাড়েনি। শুনিয়ে দিয়েছিল খুব করে। দিদি বলেছিল 'এটা শুধু তোমার ত্যাগস্বীকার নয়। তোমার মধ্যে যে সৎসাহসের অভাব আছে এটা তারও প্রমাণ। বাবা মাকে চটিয়ে অতখানি ঝুঁকি নিতে চাওনি তুমি আসলে।

—কি জানি? কোনটা ঠিক? তবে তার জন্য খোকনদার কষ্টটা তো আর মিথ্যা নয়? আর তোর দাদা কেন বিয়ে করল না?

—দাদা হয়ত আমার বিয়ে না দিয়ে নিজে বিয়ে করবে না। বাবা মাও হয়ত সেজন্য ওকে জোর করেন না। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস? আমার যদি এই স্বাধীনতাটুকুও থাকত তাহলেও যেন বেঁচে যেতাম। অপছন্দের মানুষকে বিয়ে করার জ্বালা সইতে হোত না।

আমার হাতটা টেনে নেয় বিদিশা নিজের হাতে। নরম দেখায় তার মুখের রেখা, চোখের দৃষ্টি।

—অপছন্দ হবেই বলে ভাবছিস কেন মীনাক্ষী? আর আমি এমনও দেখেছি যে প্রথমে বরকে তেমন পছন্দ হলো না। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে একসঙ্গে থাকতে থাকতে তার প্রতিও মায়া মমতা ভালবাসা জন্মাল।

॥ দশ ॥

ঠিক তিনদিন পরেই আকস্মিক এক আঘাতে শোকের ছায়া নেমে এল বাড়িতে। বিয়ের আর চারদিন মাত্র বাকি। কেনাকাটা, নিমন্ত্রণ করা আর অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থার আয়োজন পুরোদমে চলছে তখন। জ্যাঠামশাই হার্টফেল করে মারা গেলেন। দিব্যি সুস্থ মানুষ। জ্বরজারি কিচ্ছু নেই। রাত্রে খেয়ে উঠে শুয়ে বললেন—'আমার শরীরটা কেমন ভাল বোধ হচ্ছে না। আমাকে একটু ধরে ধরে শুইয়ে দাও।'

ধরাধরি করে জ্যাঠামশাইকে তার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হোল। মাথার কাছে বসে জ্যাঠাইমা হাওয়া করতে লাগলেন। বড়দা পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডাকতে চলে গেল। কিন্তু সেই সময়টুকুও টিকে থাকলেন না জ্যাঠামশাই। ডাক্তার এসে পৌঁছানোর আগেই সব শেষ। ডাক্তার এসে শুধু সেই রায়টুকু দিলেন।

সমস্ত ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে আমরা যেন হকচকিয়ে গেলাম। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে নেই। দিদির বিয়েও বাড়িতে হয়নি। তাই আশ মিটিয়ে বিয়ের আয়োজনে মেতে উঠেছিলেন যেন। জ্যাঠামশাই একাই একশো হয়ে সবকিছু দেখাশোনা করছিলেন। বাবা তার আজ্ঞাবহ অনুজ মাত্র হয়ে তার হুকুম তামিল করে যাচ্ছিলেন।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে বরাবরই জ্যাঠামশাই সকলের মাথা হয়ে বিরাজ করেছেন। আমার দিদি যে এত বছর পরেও আমাদের বাড়িতে প্রবেশাধিকার পায়নি তারও মুখ্য কারণ হলেন জ্যাঠামশাই। আর আমার বিয়ের ব্যাপারেও তার কোন অন্যথা হয়নি। বাবা শুধু সম্বন্ধটা এনেছিলেন। পরবর্তী অধিকাংশ কাজই সম্পন্ন করেছেন জ্যাঠামশাই নিজে—কখনও একা কখনও বা ভাই, ছেলে বা ভাইয়ের ছেলের সাহায্যে।

সেই মানুষ বিয়ের ঠিক আগে আগে বাড়ির সকলকে এমন বিপাকে ফেলে হুট করে চলে যাবেন একথা কেউ ভাবতেই পারেনি। একদিকে

শোকের তীব্রতা অন্যদিকে আসন্ন বিবাহ ভণ্ডুল হওয়ার দুশ্চিন্তায় বাড়িতে যেন বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গেল।

পাত্রপক্ষকে সব কিছু জানিয়ে সময় চাওয়া হলো ছয় মাসের। আপাততঃ স্থগিত রাখতেই হবে এ বিবাহ। পাত্রপক্ষ গাঁইগুঁই করতে লাগল। তাদের কথা হোল অরক্ষণীয়া কন্যার জন্য কালাশৌচের কোন বিধান নেই। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলেই হতে পারে বিবাহ। মারা গেছেন জ্যাঠামশাই। বাবা-মা হলেও বা কথা ছিল।

জবাবে বাবা জানালেন যে একান্নবর্তী পরিবারে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু পিতামাতার মৃত্যুর মতই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব পাত্রপক্ষের কথামত অত তাড়াতাড়ি বিবাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় কোনমতেই। পাত্রপক্ষ তাদের অসম্মোষ জ্ঞাপন করে জানাল এরকম পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তারা চান খুব শীঘ্রই বিবাহ হয় পাত্রের।

প্রথম দিকে চুপচাপ ছিলাম। আমাকে সে ব্যাপারে কেউ মতামত দিতে বলেনি। যা ঠিক করার বড়রাই করবেন। কিন্তু কয়েকবার পত্র চালা-চালির পর ব্যাপারটা যখন তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

বাড়িতে শোকের ছায়া—তার মধ্যে পাত্রপক্ষের জেদ জবরদস্তি খুবই অস্বাভাবিক ঠেকছিল সকলের কাছে। পত্র চালাচালি ছাড়াও বাড়িতে বাবা-মা জ্যাঠাইমা আর দাদাদের মধ্যে আলোচনা হত সেটা নিয়ে। আমার কানে আসত সেসব কথা। শেষে লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে মুখ খুললাম আমি।

পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে ভয় ছিল মায়েদের মনে। এই অবস্থায় তাদের করণীয় কি তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন তারা। আমি পরিষ্কার ভাষায় বাবা-মাকে জানিয়ে দিলাম আমার মনোভাব। যারা মৃত্যুর মত শোকাবহ ঘটনাকেও অগ্রাহ্য করে নিজেদের জেদ বজায় রাখতে চান তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন ভবিষ্যতে খুব সুখের হবে না। এরকম পরিবারে বিয়ে করার আদৌ কোন বাসনা নেই আমার।

অন্য সময়ে এরকম কথা বলার হিম্মত হতোনা আমার। আর হলেও তার প্রতিক্রিয়া কেমন হতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু বট-গাছের মত ছায়া ধরেছিলেন জ্যাঠামশাই। তার আকস্মিক মৃত্যুতে হকচকিয়ে

গিয়েছিলেন বাবা। শোকের আঘাতে কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বাবা তেমন করে আমার কথায় আপত্তি করতে পারলেন না। জ্যাঠাইমাও পাত্রপক্ষের আচরণে খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। আমার যুক্তি তিনিও ঠেলতে পারলেন না।

একমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তবু মা। মেয়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে। বিলম্বে হলেও উপযুক্ত পাত্র যদিও বা পাওয়া গেল সেও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ভবিতব্যের এমনই বিধান! কিছুতেই যেন মন স্থির করতে পারছিলেন না মা। টালবাহানা করে ঝুলিয়ে রাখতে বলছিলেন সম্বন্ধটা।

শেষ পর্যন্ত জয় হলো আমার। তিন-চার বার পত্র চালাচালির পর চরমপত্রের আকারে শাসানি দিল পাত্রপক্ষ। তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিবাহ না হলে সম্বন্ধ বাতিল করে দিতে বাধ্য হবে তারা। আমি বড়দাকে বললাম শক্ত ভাষায় কড়া করে তার জবাব দিতে।

বড়দা তবু দ্বিধা করছিল। শেষ পর্যন্ত বাবার নির্দেশেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল বড়দা যে কোনমতেই ছয় মাসের আগে এই বিবাহ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। পাত্রপক্ষ অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য মার্জনা করে যেন আমাদের।

পরিণামে যা হবার তাই হোলো। বিয়ে ভেঙ্গে গেলো। বাড়ির অন্য সকলে পরপর এই দুটো আঘাতে বেশ মুষড়ে পড়ল। কিন্তু আমি যেন মুক্তির স্বাদ পেলাম। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুজনিত শোক ছাপিয়ে দাপাদাপি করতে লাগল শীঘ্র উদ্দাম উল্লাস। একেবারে শেষ মুহূর্তে ফাঁসির আসামী যদি ফাঁসির দড়ি থেকে বেঁচে যায় তাহলে তার যেমন মনের অবস্থা হয় ঠিক তেমন অবস্থা হোল আমার মনের।

ধরা ছোঁওয়ার বাইরে যে বিরাট শক্তি নিয়ন্ত্রিত করছে আমাদের ভবিতব্য, তাঁরই বিচিত্র রহস্যময় নির্দেশে হঠাৎ কেমন ওলোটপালোট হয়ে গেল জীবনের সাজানো ছক। মনের গভীরে যে তীব্র আকাঙ্খা বিরাজ করে তা অজ্ঞাত থেকে যায় আমাদের। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কোন প্রবল ধাক্কা এসে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায় আমাদের যে মনের অতল গভীরে তলিয়ে থাকা আকাঙ্খা ও বাসনা ওপরে ভেসে আসে।

যে পরিবারে বড় হয়ে উঠেছি সেখানে কোন মেয়ের আজীবন কুমারী থাকার স্বাধীনতা নেই। বিবাহের সম্বন্ধে তাই আপত্তি করার প্রশ্ন

না। সে চেষ্টা করিনি আমি। কোন কোন ক্ষেত্রে তেমন অপছন্দ হলে তখনই কেবল আমার আপত্তি জানিয়েছি। মেয়ের বয়স হয়েছে বলে সে আপত্তি বাড়িতে অগ্রাহ্য করা হয়নি এইমাত্র। আবার কোন কোন সম্বন্ধ দেনাপাওনার প্রশ্নে ভেঙ্গে গেছে। পাত্রের বাড়ি থেকে অপছন্দের দরুনও একাধিক সম্বন্ধ বরবাদ হয়ে গিয়েছে।

এবারও আমার পছন্দ হয়নি পাত্রকে। তার কারণ যে মিশেল তা নিজের কাছে গোপন ছিল না। তবু আমি নিজেই এবার সেটা প্রশ্রয় দিইনি। যা হবার হবে ভেবে নিজেকে শক্ত করেছি। মেনে নিয়েছি একে ভবিতব্য বলে। অথচ আমার মনে জগদ্দল পাথরের মত বিরাট একটা কষ্টের পাহাড় যেন চেপে বসেছিল। উঠতে বসতে সেই পাহাড়ের ভার দুঃসহ হয়ে বুকে বাজত। সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়াতে সেই পাথরটা মন্ত্রবলে সরে গেল যেন। আবার সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম আমি।

আকস্মিক যে ঘটনার জন্য এই মুক্তির স্বাদ পেলাম সেই ঘটনার চাপও কিছু কম ছিল না। আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। শোক ছাপিয়ে আমার মধ্যে তীব্র এক উল্লাস সশব্দে বিদীর্ণ হতে চাইছে দেখে। জ্যাঠা-মশাই মারা না গেলে এই মুক্তি আমার আসত না এটা বুঝে অস্বস্তিও বড় কম হলো না। আমাদের মনে মায়া মমতা উদারতার সঙ্গে যে সহাবস্থান করে স্বার্থপরতা, নীচতা আর নিষ্ঠুরতা তা নিজের জীবনে মর্মে মর্মে বুঝলাম।

বাড়ির কেউ সেকথা না বুঝলেও বিদিশা যেন বুঝতে পারল। জ্যাঠা-মশাইয়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে ও এল আমাদের বাড়ি। অফিস ফেরত।

গরমের ছুটি চলছে তখন আমার স্কুলে। বাড়িতে শুধু আমি আর জ্যাঠাইমা। বাবা মাকে নিয়ে গেছেন ছোট মাসিমার বাড়ি নাকতলায়। বড়দা আর দাদা যে যার অফিসে।

তখনও ভীষণ রকম শোকগ্রস্ত জ্যাঠাইমা। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আকস্মিক আঘাতে বিহ্বল, হতবুদ্ধিপ্রায়। জ্যাঠাইমার সঙ্গে আলাপ তেমন জমল না। দু'চারটে কুশল প্রশ্নের আদান প্রদানের পর চলে আসল বিদিশা আমার ঘরে।

বিদিশাকে দোতলার বারান্দা থেকে আসতে দেখেছিল উর্মিলা। আমাদের রাতদিনের কাজের লোক। ও দরজা খুলে দিয়েছিল আগে-

ভাগেই। তাই সাড়াশব্দ পাইনি আমি। খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে পড়ছিলাম মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা'। তন্ময় অভিভূত হয়ে। হঠাৎ ওর সাড়া পেয়ে চমকে গেলাম ভীষণভাবে।

—শুয়ে শুয়ে কি বই পড়ছিস? চোখ খারাপ করতে চাস? চশমা না পড়লে হচ্ছেনা কেমন?

ত্বরিতে বই বন্ধ করে উঠে বসি।

—আয়। তোকে আশাই করিনি এখন।

—কাকে আশা করেছিলি? মিশেলকে?

—বিদিশা! হোল কি তোর? এরকম রসিকতা করতে তো আগে কখনও দেখিনি তোকে!

—আগে কি বুঝেছি যে মিশেলের প্রেমে এমন করে হাবুডুবু খাচ্ছ তুমি?

—কি যাতা বলছিস? ওকে পছন্দ করি। তবে মনে মনে। মুখ ফুটে বলিনি কোনদিন। এরকম কত হয়! সেটাকে অত পাত্তা দিলে চলে কখনও?

—চলেনা বুঝি? তাহলে অত মন খারাপ হয়েছিল কেন?

আমার ঠিক বোধগম্য হয়না প্রশ্নটা।

—মন খারাপ হয়েছিল? কবে? কেন?

—কবে? কেন? বাঃ! এই তো কয়েকদিন আগের কথা। উচ্ছ্বাসের মাথায় কত কি বললি। এর মধ্যে সব ভুলে গেলি?

এতক্ষণে বুঝতে পারি। শুনে খারাপ লাগে। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর বেশিদিন হয়নি। এখনও বাড়িতে শোকের ছায়া ফিকে হয়নি। এই সব প্রসঙ্গ আলোচনার সময় নয় এখন। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। বিদিশাকে বাধা দিই।

—সুব্রত ফিরে আসছে বলে আনন্দে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়েছিস তুই। এখন কি এইসব কথা আলোচনার সময়? জ্যাঠাইমা যদি এসে পড়েন খুব দুঃখ পাবেন শুনে।

একটু অপ্রস্তুত হয় বিদিশা।

—কি যে বলিস? ওঁর সামনে কি বলছি নাকি? আর মনের অগোচরে পাপ নেই। বিয়ে ভেঙ্গে গেছে বলে খুশি হয়েছিস কিনা সত্যি

করে বল তো ?

—অখুশি হইনি। খুশিই হয়েছি। তুই তো জানিস আমি শুধু মেনে নিচ্ছিলাম। মনের দিক থেকে তেমন সাড়া পাচ্ছিলাম না। কিন্তু সেটা অন্য প্রশ্ন। মিশেলের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আলিঁয়সের সঙ্গে সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে। আমি আর ওমুখো হচ্ছিনা।

একটু এস্ত দেখায় বিদিশাকে।

—তা কেন মীনাক্ষী ? এর মধ্যে যদি অন্য কোন বিয়ের সম্বন্ধ না আসে তাহলে তুই শুধু শুধু ছাড়বি কেন পড়াটা ? সবচেয়ে ভাল ছাত্রী তুই এখন ক্লাসে। প্রথম হয়েছিস পরীক্ষায়। তোর পড়া ছেড়ে দেওয়ার কোন মানে হয়না। মিশেলের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেই চলবে। তুই তো জানিস আমার নিজের এতটুকু সায় নেই এ ব্যাপারে। মজা করছিলাম শুধু তোর সঙ্গে। দেখছিলাম তুই কি বলিস ? তোকে একটু বাজিয়ে দেখার শখ হয়েছিল।

—তাই ? তা বাজিয়ে কি দেখলি ?

—দেখলাম তুই জবরদস্তি করে মনের দুর্বলতা দূর করতে চাইছিস। মিশেলের ভয়ে নিজের ক্ষতি করতে চাইছিস। আগে তবু একটা অর্থ ছিল। শ্বশুরবাড়িতে মেনে নেবে কিনা এইসব প্রশ্ন ছিল। এখন যখন সেই কাঁটা সরে গেছে তখন ওভাবে চিন্তা করার মানে হয়না। ইচ্ছাশক্তির জোর থাকলে সবরকম দুর্বলতা জয় করতে পারে মানুষ। আমি যখন সুব্রতকে ছেড়ে এখানে চলে এসেছিলাম কম কষ্ট হয়নি আমার। সেই চরম সিদ্ধান্ত নিতে কত রাত চোখের জল ফেলেছি। বাড়িতে সকলে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। বলেছিল ওকে আঁকড়ে থাকতে। ওকে বোঝাতে। আমি কারুর কথা শুনিনি। জোর করে চলে এসেছিলাম।

একটুক্ষণ থামে বিদিশা। চুপচাপ কি যেন ভাবে। কেমন অভিভূত দেখায় ওকে। পরে ধরা গলা পরিষ্কার করে নেয়।

—তোরা জানিসনা কি কষ্টে কেটেছে আমার দিনরাত তখন। তোদের কাছেও মন খুলে আমার কষ্টের কথা জানাতে পারিনি। কেন জানিস ? ভেবেছি তোরা যদি আমায় আবার মিটমাট করে ফিরে যেতে বলিস তাহলে আমার মনের জোর যাবে কমে। আমার দুর্বলতা প্রশ্রয় পাবে। এখন আমার দুর্বলতা অনেক কমে গেছে। এখন তোদের কাছে সব কিছু খুলে

বলা যায়। আর কোন গুরুতর প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমার করণীয় আমি নিজেই ঠিক করে ফেলেছি শক্ত মনে। হয়ত সুব্রতও বুঝেছে সেটা। তাই ওর চিঠিতে এখন অনেক নরম সুর। আগে ও আমায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। বলেছিল আমি অবুঝ, গোঁয়ার, মানিয়ে চলতে জানিনা। এখন অন্য সুরে বলছে ও। হয়ত এখন আত্মকৃত অপরাধের জন্য গ্লানি বোধ করছে বলেই আমাকে লিখতে পেরেছে যে মোটামুটি একটা ভদ্র গোছের চাকরি পেয়ে গেলেই ফিরে আসবে এখানে।

—তোর চিঠির জবাব এসেছে তাহলে?

—হাঁ। কিন্তু সে কথা এখন থাক। তুই পড়া ছাড়িস না মীনাক্ষী। জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা। কখন কোন কাজে লাগবে আগে থেকে বলা যায়না তা।

—দূর। আমাদের মত পরিবারে কতটুকুই বা করা যায়? গণ্ডীর মধ্যে কেটে গেছে জীবনের অনেকগুলো বছর। বাকি সময়টাও মনে হয় গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে দিতে হবে। কোন উজ্জ্বল বিশাল সম্ভাবনা চোখের সামনে দেখতে পাইনা আমি। আর বাড়িতেও খুব সুনজরে দেখেনা কেউ আমার এই পড়াটা। মনে হয় শুধু শুধুই অর্থ নষ্ট, সময় নষ্ট করছি!

—মাঝখানে তোর মধ্যে একটা পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখেছিলাম। একটু নড়েচড়ে বসেছিলি যেন। এখন আবার সেই আগের মত হয়ে যাচ্ছিস।

—পুনর্মূষিক ভব অবস্থা তো? আমি বুঝতে পারছি। এমনি এমনি চাঙ্গা রাখা যায়না নিজেকে। তার জন্য দরকার হয় কোন স্টিমুল্যান্টের। আমার মধ্যে সত্যিই একটা আলস্য এসে ভর করেছে। আর যেন উৎসাহ পাচ্ছিনা নতুন কিছু করতে। মনে হচ্ছে কি হবে ছুটোছুটি করে? শেষ পর্যন্ত তো সেই আর দশটা মেয়ের মত জীবন কাটাতে হবে?

—এসব চিন্তা ছাড় তো মীনাক্ষী! কি হতে পারে আর কি হতে পারেনা তা এত সহজে বলে দেওয়া যায় না। পরিস্থিতি মানুষকে কত পাল্টে দেয়। আমি চাই তুই আবার আগের মত উৎসাহ নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাবি।

—কেন সঙ্গী চাইছিস আমায়?

হেসে তরল সুরে প্রশ্ন করি আমি।

—সে তো চাইই! তবে শুধু সেজন্য বলছিনা। আমি নিজেও ভাবিনি

তুই এত অল্প সময়ে এত ভাল শিখতে পারবি ভাষাটা। আমি কয়েক বছর ফ্রান্সে থেকে যতনা শিখেছি তুই নিজের চেষ্টায় তার থেকে অনেক বেশি শিখেছিস।

—তা আমি জানিনা। পরীক্ষার ফল দিয়ে সব কিছুর বিচার হয়না। আর তোর মত উচ্চারণ আয়ত্ব করতে অনেক সময় লেগে যাবে আমার।

—তোর উচ্চারণ যদি খারাপ হতো তাহলে মিশেল তোকে নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে দিতনা।

—সে যাই হোক্। আমি জানি আমার উচ্চারণ তোর মত অত সুন্দর নয়। তুই ফরাসী বলিস ফরাসীদের মত।

—দেখতে হবে কে সেটা বিচার করছে। কোন ফরাসী এখানে উপস্থিত থাকলে নয় জিজ্ঞাসা করা যেত কার উচ্চারণ বেশি নির্ভুল, বেশি ফরাসী-সুলভ। এখন কাজের কথা হোল মনস্থির করে ফেল্। ক্লাস সুরু হতে আর মাসখানেক বাকি। এর মধ্যে যা ঠিক করার করে ফেলতে হবে।

অফিস থেকে সোজা এখানে এসেছে বিদিশা। ঊর্মিলাকে ডেকে চা জলখাবারের কথা বলে দিলাম। চা খাবার খেতে খেতে অলস ভঙ্গীতে এটাসেটা কথা হতে লাগল।

একেকটা মুহূর্তে কি যেন হয়! খুব সাবধানী মানুষও চরম অসাবধানী হয়ে পড়ে। আমার মনে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত হয়েছিল ক্ষোভ, হতাশা, মনঃকষ্ট। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু সংযোজিত হয়েছিল তার সঙ্গে। মিশেলের শেষ দুদিনের গম্ভীর আচরণের স্মৃতি মনের অন্ধকার আরও ঘনীভূত করেছিল যেন।

বিদিশা এসে অনেক হালকা করে দিল সেই অন্ধকার। টানটান হয়ে থাকা মনের রাশটা হঠাৎ যেন আলগা হয়ে ফেঁসে গেল। অনাবৃত হয়ে পড়ল গোপন বাসনার নগ্ন চেহারা।

—বিদিশা! একটা প্রশ্ন করব। জবাব দিবি?

কিছু না বলে অবাক হয়ে তাকায় বিদিশা আমার দিকে।

—মিশেলের সঙ্গে যদি আমার কোন সম্পর্ক তৈরি হয় কোনদিন তুই মেনে নিবি?

সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই নিজের প্রশ্ন শুনে। এমন প্রশ্ন কেন আমার মাথায় এলো নিজেই বুঝলাম না। সমস্ত পরিবেশ যেন

কারসাজি করে আমাকে আত্মবিস্মৃত করল।

আগের মতই নির্বাক থাকে বিদিশা। অবাক হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে খালি। পরে গলাটা ঝেড়ে পাল্টা প্রশ্ন করে।

—একটু আগেই অন্য সুরে কথা বলছিলি। এর মধ্যে পাল্টে গেল সুর? লক্ষণটা তো খুব ভাল মনে হচ্ছেনা মীনাক্ষী! আলিয়ঁসের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিবি বলে এতক্ষণ এত কিছু বললি। আর এখনই সব ভুলে অন্যরকম কথা বলছিস?

—আমি কিছুই ভুলিনি। আলিয়ঁসে আমি সত্যিই যাব না বলে ঠিক করেছি। কিন্তু তবু আমার মন বলছে ঘটনাস্রোত যেন কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে আমায়। ঠিক যেন আমার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই সব কিছু। হয়ত—

—যত সব বাজে কথা। নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে না কেন? মানুষের জীবনে অনেক রকমের ঘটনা ঘটতে পারে। সেগুলো আমরা হয়ত আগে থেকে অনুমান করতে পারি না। তাই বলে সেগুলিকে অলৌকিক বা আমাদের ব্যাখ্যার বাইরে বলে ভাবব কেন? তুই যদি আলিয়ঁসে না যাস তাহলে মিশেলের সঙ্গে তোর যোগাযোগ থাকবে কি করে? আর সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে না। আর আমার মতামতের ওপর কিছুই নির্ভর করে থাকবে না মীনাক্ষী। আমি অনেক কিছুই মেনে নিতে পারিনা বা পারব না। তাই বলে সেগুলো ঘটবেনা একথা বলতে পারি না!

বিদিশাকে একটু অসন্তুষ্ট দেখায়। একটু আগেও কিছুটা প্রশ্রয়শীল মনে হয়েছিল ওকে। মুহূর্তের মধ্যে ওর এই পরিবর্তন দেখে বুঝতে পারি আমার কথার দরুনই ওর মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া এসেছে। আমার খারাপ লাগে। আমি নিজেই জানিনা কেন ওসব বলেছি।

পরিস্থিতি কত সময় আমাদের দিয়ে কত কি বলায়, করায়। আগের মুহূর্তেও বুঝতে পারিনা আমরা। তাই নিজেদের কথা শুনে, নিজেদের আচরণ দেখে নিজেরাই অবাক হয়ে যাই। ভাবি ওকথা কেন বললাম? ওরকম আচরণ কেন করলাম? মনে হয় আমাদের মধ্যে অন্য কেউ সেকথা বলেছে। তবু যে কথা একবার মুখ থেকে উচ্চারিত হয় তার দায় এড়ানো সহজ নয়।

চুপ করে সে কথাই ভাবতে থাকি আমি আনমনাভাবে। বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হয় বিদিশা।

—চলি মীনাক্ষী। রাত হয়ে যাবে নাহলে। মাসিমার সঙ্গে দেখা হলো না। জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করে যাব নাকি?

—না থাক! দরকার নেই। একবার তো দেখা করেছিস। হয়ত শুয়ে আছেন। আজকাল কেমন চুপচাপ হয়ে গেছেন। বেশি কথা বলতে চান না।

—থাক তাহলে। আর শোন মনটাকে শক্ত রাশ টেনে ধর। মিশেল যদি ভারতীয় হতো তাহলেও বা কথা ছিল। ও জাতে ফরাসী। তেলে জলে কখনও মিশ খায় না। খেতে পারে না। আর বয়সের কথাটাও হয়ত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওদের দেশে সেটা কোন বাধা নয় ঠিকই। কিন্তু তুই ফরাসী নোস। তোর নিজের মনেই নানারকম জটিলতা তৈরি হবে ওটা নিয়ে। তবে আলিঁয়সের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে কোন লাভ হবে না। বরং ভাল করে ফরাসীটা রপ্ত করতে পারলে আখেরে লাভই হবে।

ঠিক পরের দিন সকালে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল অপ্রত্যাশিত এক চমক। আগের দিন সন্ধ্যায় বিদিশা এসে পড়ায় শেষ হয়নি উপন্যাসটা। সকালের নিত্যকর্ম সমাধা করে সেটা নিয়ে পড়েছিলাম। ঊর্মিলা এসে নাচতে নাচতে দিয়ে গেল একটা খাম।

—দিদি তোমার চিঠি।

আমি ভেবে পেলামনা কে আমায় চিঠি দিতে পারে। চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস খুব কম আমার। প্রথম প্রথম বন্ধু বান্ধবেরা মাঝে মাঝেই চিঠিপত্র দিত। পরে জবাব না পেয়ে বিরক্ত হয়ে তারাও ছেড়ে দিয়েছে চিঠি লেখা। আজকাল খুব কম পাই চিঠিপত্র। ঊর্মিলার হাত থেকে খামটা নিয়ে দেখি বিদেশী ডাকটিকিটের ছাপ দেওয়া খাম। চকিতে মনে হোল এ চিঠি এসেছে মিশেলের কাছে থেকে।

অনেক কথা ভুলে গিয়েছি। অনেক ঘটনার স্মৃতি মুছে গেছে মন থেকে। কিন্তু যেদিন সকালে মিশেলের চিঠি এসেছিল সেদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারা দিনের ঘটনা হুবহু মনে আছে আমার। স্মরণীয় দিন সেটি আমার জীবনে।

আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারে ঘেরাটোপ জীবনে খুব বড় কিছু ঘটে না। প্রায় নির্দিষ্ট একটা ছকের মধ্যে আবর্তিত হয় আমাদের জীবন। চাই হয়ত মনে মনে অনেক কিছুই। কিন্তু জীবনে তার অনেক কিছুই অপ্রাপ্য থেকে যায়। আর না পেতে পেতে চাওয়ার পরিধিও ক্রমশঃ কত ছোট হয়ে আসে।

জুলাই মাসের সেই সকালে মিশেলের চিঠি আমার কাছে ছিল এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ঘটনা। সাত রাজার ধন এক মাণিকের মত সেই চিঠি আমি সেদিন সকাল সন্ধ্যা বারবার খুলে খুলে দেখেছি। বারবার পড়েছি প্রতিটি পংক্তি। আমার মনে হয়েছে রক্তমাংসের মিশেলের সান্নিধ্য পাচ্ছি আমি।

আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হয়ে এল সেই চিঠি। আমার বুকে যে পাখিটা দুঃখের নীড় বেঁধেছিল ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল সেটা। কোথায় থেকে ধেয়ে এল হাজার হাজার সুখের পাখি। অবিশ্রাম কলগুঞ্জনে সুখের হাট সাজিয়ে বসল তারা আমার বুকে।

এতদিন পরেও মনে আছে দিনের মধ্যে অনেকবার পড়া সত্ত্বেও রাত্রে আবার বসেছিলাম চিঠিটা নিয়ে। দরজা বন্ধ করে নীল খাম খুলে দেখেছিলাম। আমার রক্তে তখন তীব্র নেশার মত্ততা। পৃথিবীর সব কোলাহল নীরব হয়ে গেছে। দুই কান জুড়ে ঝঙ্কৃত হয়ে চলেছে চিঠির কথাগুলো।

শের মাদ্‌মোয়াজেল সেন!

জানিনা আপনাকে এই চিঠি লিখে অন্যায় করছি কিনা। কিন্তু ন্যায় হোক অন্যায় হোক না লিখে উপায় নেই আমার। অনেক দিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। নিজেকে শাসন করেছি। ভেবেছি তাড়াহুড়ো করব না। যা হবার তা যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হোক্। কিন্তু এখন আমার কতগুলি বিষয়ে বড় আশঙ্কার কারণ ঘটেছে। আমার মনে হচ্ছে না চাইলেও পরিস্থিতি কেমন যেন জটিল হয়ে উঠছে। সব কিছু হয়ত স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন নেই। আমার বিশ্বাস আপনি বুদ্ধিমতী। আমার সমস্যা কোথায় কেন তা বুঝবেন।

ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে আমার জন্মভূমি ফ্রান্সের এই শহরে ছুটি কাটাতে এসেও কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছিনা। সারাক্ষণ কাঁটার মত বিঁধছে একটি মুখের স্মৃতি। সেদিন প্রদর্শনীতে আপনার চোখে জল দেখেছিলাম।

কেন যেন মনে হয়েছে আমিই তার কারণ। অবশ্য তারও আগে আপনার আচরণে অনুমান করেছি কোথায় একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে আপনার মনে। তবু সাহস করে আপনার কাছে এগিয়ে যেতে পারিনি। আপনার কষ্ট লাঘবের জন্য। আইফেল টাওয়ারের মত অনধিগম্য এক দূরত্ব রয়েছে যেন আপনাকে ঘিরে।

আর কিছু লিখতে সাহস হচ্ছে না। হয়ত যা বলতে চাইব ঠিকমত বলতে পারব না। আপনার শরীর কেমন? আশা করি আগামী সেমেস্টারে আবার আপনি ফরাসী ভাষার চর্চা অব্যাহত রাখবেন।

আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

মিশেল বেরঁতা

বহুদিন মনে মনে চেয়েছি এরকম কিছু ঘটুক। নীরবতার ভার যেন আর বইতে পারছি না। আমার সত্তা কবেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। একটি পারিবারিক বেষ্টনীর মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে চাইত। অকারণ ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে ভয় পেত। অপরটি সতত অস্থির ছিল। একঘেয়ে পারিবেষ্টনী থেকে মুক্তি চাইত। চাইত মিশেল তাকে পরিপূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করুক। তাকে স্বীকৃতি দিয়ে তার জীবন ছন্দময় সুরময় বৈচিত্রময় করে তুলুক।

মিশেলের প্রতি নীরব ভালবাসার ধিকি ধিকি আগুনে একটু একটু করে দগ্ধ হচ্ছিল সেটি। মিশেলের কাছে তার প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছিল না বলে আশাভঙ্গের তীব্র দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছিল।

মিশেলের সেই প্রথম চিঠিতে প্রেম নিবেদন ছিল না। কিন্তু যা ছিল তাতে মন ভরে গিয়েছিল। বহুদিনের সঞ্চিত সংশয়, আশঙ্কা দুঃখ বিদূরিত হয়েছিল। মিশেলের সপ্রেম স্পর্শ ছিল যেন সেই চিঠিতে। বারবার মনে হচ্ছিল চেনাপরিচিত অনেককে ডেকে ঘোষণা করি সেই চিঠির কথা। আমার দুর্লভ রত্নলাভের কথা সগৌরবে শোনাই সকলকে।

সেই রাত্রে চিঠির জবাব দিইনি। দিয়েছিলাম তার পরের দিন রাত্রে। খাওয়া দাওয়া সেরে দরজা বন্ধ করে টেবিলে বসেছিলাম। কি লিখব কি লিখবনা ভেবে পাচ্ছিলাম না। মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল বাঙালী মেয়ের পক্ষে এই সংকোচ কাটিয়ে ওঠা কতটা শক্ত তা সেই ফরাসী যুবকের পক্ষে অনুধাবন করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

সন্তর্পণে সবদিক বাঁচিয়ে লিখতে হবে। অন্যথায় অর্থান্তর করবে মিশেল। মিশেলের একাধিক চিঠি পরবর্তীকালে পেয়েছি। প্রত্যুত্তরে তাকে লেখা আমার চিঠির খসড়াগুলো সেইসব চিঠির সঙ্গে সংরক্ষণ করেছি। তাকে লেখা আমার প্রথম চিঠিতে একেবারেই ধরাছোঁয়া দিইনি। তবে সে যাতে আহত বা ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য সযত্ন প্রয়াসের অভাব ছিলনা আমার সেই চিঠিতে।

শের মঁসিয়ো বের্তা!

আপনার চিঠি পেয়ে নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত বোধ করেছি। কিন্তু আপনার সংশয় দেখে তার সঙ্গে দুঃখও পেয়েছি। আপনাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আপনার আচরণে ত্রুটি হতে পারে বলে আপনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তা অমূলক। আমার অনুরোধ আপনি তা নিয়ে অকারণ চিন্তা করবেন না।

আমার চোখে সেদিন সত্যিই জল এসেছিল। তবে তার দায় সম্পূর্ণ-ভাবে আমার। আপনি কোনভাবেই তার জন্য দায়ী নন। তবু আপনি যে সেটা নিয়ে ভেবেছেন তার জন্য অভিভূত বোধ করছি আমি।

আমাকে 'আইফেল টাওয়ারে'র মত দুরধিগম্য বলে ভাবার কি কোন কারণ ঘটেছে কোনদিন? আমি অত্যন্ত সহজ, সাধারণ একটি মেয়ে। আমার বিরুদ্ধে আপনার এই অভিযোগ একেবারেই খাটে না।

পারিবারিক কারণে হয়ত আমার পক্ষে ফরাসী ভাষার চর্চা চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হবে না। তবে আপনাদের শিক্ষা যাতে বিফল না হয় তার জন্য সচেষ্ট থাকব নিঃসন্দেহে।

আর কি লিখব? আশা করি ভাল আছেন।

মীনাক্ষী সেন

সেই চিঠির জবাব এসেছিল। মিশেল তার মনোভাব যেন আরও একটু স্পষ্ট করেছিল সেই চিঠিতে। আমার আড়ষ্টতা কিছুটা কেটে গিয়েছিল তারপর। তবে পুরোপুরিভাবে সব দ্বিধা দূর হয়নি তখনও মন থেকে।

সবচেয়ে বড় বাধা ছিল বয়সের। কিংবা শুধু বয়সের কথা বলছি কেন? তার দেশ, ধর্ম সব কিছুই বাধার প্রাচীর তৈরি করতে চাইত আমাদের মধ্যে। আমি যে পরিবারের মেয়ে সেখানে এসবের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা অজানা ছিল না আমার। কিন্তু দুর্লভ চাঁদ যদি স্বেচ্ছায় ধরা দেয় হাতের

মুঠোয় তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে কে? বসন্তবাহারের সুরে ভরপুর হয়ে উঠেছিল আমার মন। সেই সুর, সেই মূর্চ্ছনা কেমন এক ঘোর সৃষ্টি করেছিল। প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছিল আমার।

আমার জীবনে মিশেল পর্বের তৃতীয় অধ্যায় সুরু হয়েছিল সেই চিঠি পাওয়ার দিনটি থেকে। আজও তার রেশ বয়ে চলেছি। চতুর্থ অধ্যায় সুরু হবে ফ্রান্সে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সুরু হয়েছিল আমাদের মন জানাজানির পালা। অনেক কিছু ঘটেছে, অনেক কিছু বলেছি আমরা। কিন্তু তার অনেক স্মৃতি মুছে গেছে মন থেকে।

সুখের এক অবিরাম প্রবাহে ভেসে চলেছি আমরা। উত্তাল সেই স্রোতধারার মধ্যে একটি ঢেউ অপর ঢেউয়ের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। তাদের বিচ্ছিন্ন করে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ঘটনা, দৃশ্য বা কথোপকথনের স্মৃতি গভীরভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে আমার বুকের গভীরে। চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মত ভেসে উঠছে তারা একে একে আমার চোখের সামনে। আর নতুন করে আবার আমাকে আবর্তন করছে হর্ষ-বিষাদের সুতীব্র অনুভূতি।

।। এগার ।।

তৃতীয় সেমেস্টারে দেরি করে ভর্তি হয়েছিলাম আমি। মনস্থির করতে সময় লেগেছিল আমার। বিদিশা আগেই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। আমার জন্য অপেক্ষা না করে। তবু আমায় পীড়াপীড়ি করতে ছাড়ত না। আমার কাছে খুব দুর্বোধ্য ঠেকত এই ব্যাপারটা। মিশেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠুক সেটা ও চাইত না ঠিকই। কিন্তু আলিয়ঁসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছেদ হোক সেটাও যেন ওর মনঃপূত ছিল না।

ইতিমধ্যে বাড়ির পরিবেশ কিছুটা ঢিলেঢালা হয়ে গিয়েছিল। পরিবারের ছত্রধর পুরুষটির আকস্মিক মৃত্যুই তার কারণ। সবচেয়ে বেশি রক্ষণশীল ছিলেন জ্যাঠামশাই। তার মতামতই সব ছিল বাড়িতে। তার আপত্তি অগ্রাহ্য করার সাহস কারুর ছিল না আমাদের বাড়িতে।

দিদিকে কি ভালই না বাসতেন। নিজের মেয়ে ছিল না। মেয়ের মত

আদরযত্ন পেয়েছিল দিদি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। তবু দিদির পছন্দ মেনে নেননি। আজও যে এ বাড়িতে ঢুকতে পারেনা দিদি তার প্রধান কারণ জ্যাঠামশাই। আমার মনে হয় জ্যাঠামশাই মেনে নিলে আর কেউ দ্বিমত করত না।

আমাকেও যে এত বয়স পর্যন্ত পাত্রস্থ করা যায়নি তার জন্য আক্ষেপটাও ছিল জ্যাঠামশাইয়েরই বেশি। আমি যখন এম. এ. পড়তে চেয়েছিলাম তখনও আপত্তি তুলেছিলেন জ্যাঠামশাই। শেষে আমার পীড়াপীড়ি, আর জ্যাঠাইমার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে নিমরাজী মত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই বেশি করে উঠে পড়ে লেগেছিলেন পাত্র খুঁজতে।

আমার কাছে এই ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য ঠেকে। তখন মনে হয় 'কপালের লিখন' কিংবা 'ভবিতব্যের নির্দেশ' বলে যে কথাগুলো প্রচলিত আছে সেগুলি বুঝি অবৈজ্ঞানিক বলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আরও মনে হয় নেহাৎ কপালের জোরে বেঁচে গিয়েছি। দেনা-পাওনা বা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার না থাকলে কবেই বিয়ে হয়ে যেত আমার আমাদের মত কিংবা আমাদের চেয়েও বেশি রক্ষণশীল কোন পরিবারে। নসীবের খেল দেখে তাজ্জব হয়ে যাই।

শুধু তাই নয়। ভাগ্যকে বারবার ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা করে। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক সম্পন্ন পরিবারের সুশিক্ষিত একটি ছেলে ভারতবর্ষে এসে পছন্দ করল আমার মত একটি সাদামাটা মেয়েকে এ যদি অদৃষ্টের পূর্বনির্দিষ্ট লিখন না হয় তাহলে তাকে আর অন্য কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? সমস্ত ব্যাপারটা শুধুই কাকতালীয় বলে ভাবতে পারি না যেন কোনমতেই।

আর মনের অগোচরে পাপ না রেখে বলতে পারি নৌকার পালে যেন হাওয়া লেগেছিল জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর। বাড়িতে যেমন নিষেধের আগল অনেকখানি শিথিল হয়ে গেল আমার মনের আগলও ঠিক অনেকখানিই খুলে গেল সেই সঙ্গে।

সুখ দুঃখের সহাবস্থানের কথা চিন্তা করলেও খুব আশ্চর্য লাগে। নিজের জীবনেই বারবার দেখেছি দুঃখের অভিজ্ঞতা কিভাবে তৈরি করছে সুখের পিরামিড। মিশেল পর্বে বারবার দেখেছি এই দ্বৈত সমন্বয়। অদৃষ্ট বাম হাতে দুঃখকে গুঁজে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ হস্তে উপুড় করে দিয়েছে সুখ।

এভাবে আগে কোনদিন চিন্তাই করিনি। চিন্তার পরিধি, চেতনার

পরিধি উপলব্ধির পরিধি যেন একটু একটু করে প্রসারিত হয়ে চলেছিল। আমার মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল অদৃষ্টচেতনাও। মনে মনে এক খেলায় মেতে উঠেছিলাম আমি তখন থেকে। ভাগ্যকে যাচাই করে নেওয়ার খেলা। নিজেকে পুরোপুরি ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে তার দৌড় কতটুকু তা দেখা।

আলিঁয়সে ভর্তি হতে চাইনি সেই কারণেই। আমার মনে হয়েছিল যদি আমার জীবনে নিয়তিনির্দিষ্ট হয় মিশেল তাহলে দু'তিনটি চিঠিপত্রের মধ্যে সেই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হবেনা। অন্য হাজারটা উপলক্ষের সূত্র ধরেই ও প্রতিষ্ঠিত হবে আমার জীবনে।

বাস্তবে সেটাই হয়েছিল। বাড়িতে তেমন আপত্তি করার কেউ ছিলনা। অন্য সময়ে হয়ত এত অনায়াসে ফয়সলা হোতনা। কিন্তু আমার বিয়েটা আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাবা মা এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে তাদের দুঃখটা আমার মধ্যেও অভিক্ষিপ্ত করেছিলেন। শুভকাজে বিঘ্ন ঘটায় আমিও মুষড়ে পড়েছি ভেবেছিলেন। সেটা ব্যক্ত হয়েছিল তাদের হাবভাবে, কথাবার্তায়।

বিদিশাকে ভর্তি হতে আমার অনিচ্ছার কথা বলেছিলাম। কিন্তু বাবা-মা-জ্যাঠাইমার কাছে তাসত্ত্বেও পেড়েছিলাম কথাটা। সাগ্রহে সমর্থন জানাবেননা কেউ তা আমি জানতাম। কিন্তু মুখ ফুটে একটিবারও তাদের অপছন্দের কথা বলবেননা তা যেন ধারণাই করতে পারিনি। তবু যে আমি খুব সচেষ্ট হইনি তার কারণ ছিল আমার মনের মধ্যে সদ্য জন্ম নেওয়া রহস্যময় কৌতূহলের তাগিদ। ঘটনা আমাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দেখিনা একবার।

আমার অনুমান মিথ্যা হলোনা। আবার পত্রাঘাত করল মিশেল। অনেক সংক্ষিপ্ত সেই চিঠি। বক্তব্য একটাই। তেমন বিশেষ কোন কারণ না থাকলে আমি যেন অবিলম্বে এসে ভর্তি হই নূতন ক্লাসে। আর যদি ক্লাস করতে আমার অনিচ্ছা থাকে তাহলেও একবার যেন এসে তার সঙ্গে দেখা করি লাইব্রেরিতে।

অতঃপর দ্বিধা ত্যাগ করে ত্বরিতে উপস্থিত হয়েছিলাম আলিঁয়সে। ক্লাস কিছুদিন আগেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। সে খবর আগেই বিদিশার কাছে পেয়েছিলাম। তবে ইচ্ছা করেই বোধহয় একটা খবর ও দেয়নি।

নতুন ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিলেন অপর একজন শিক্ষক। মিশেল নয়। অথচ মিশেলের চিঠি পেয়ে আমার কিন্তু অন্যরকম ধারণা হয়েছিল। ভেবেছিলাম মিশেলই পড়াবে আবার আগের মত। বিদিশা নিজের থেকে কিছু বলেনি বলে ওকে কোন প্রশ্ন করিনি সে ব্যাপারে।

আমার ভুল ভাঙ্গল আলিঁয়সে গিয়ে। মিশেলের কথামত পূর্বনির্দিষ্ট সময়েই দেখা হলো আমার তার সঙ্গে। আলিঁয়সের লাইব্রেরিতে। সেই সন্ধ্যার স্মৃতি আজও অত্যন্ত প্রিয় আমার কাছে।

সেদিন তাকে বিশেষ চোখের আলোয় দেখেছিলাম বলে ভারী সুন্দর লেগেছিল তার চেহারাটি। অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি আকর্ষণীয়। সাদা পোষাকে তার গৌরবর্ণের জেল্লা অনেক বেশি খুলেছিল যেন। ভাল দর্জির তৈরি পোষাকের খাপে তার পুরুষশরীর ধারালো তলোয়ারের মত বিভ্রম এনেছিল আমার চোখে।

সেই সন্ধ্যায় আমি মীনাক্ষী সেন তার দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম এতদিন আমার মধ্যে অধিষ্ঠান করছিল একটি অপরিণত মনের কিশোরী। সেদিন তার শরীরের সান্নিধ্যে আমার শরীর অস্থির হয়ে উঠেছিল। হাজারটা উপন্যাস পড়েও যে ইচ্ছার সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিলনা সেদিন সেই বেগবতী ইচ্ছাই তরঙ্গায়িত হয়েছিল আমার রক্তে।

আমার মনে হয়েছিল এতদিন অন্ধ ছিলাম আমি। হঠাৎ চক্ষুষ্মান হয়ে যেন নতুন চোখে দেখেছিলাম মিশেলকে। তার সুন্দর সতেজ টগবগে শরীরকে। মনে হয় সে হয়ত সেটা বুঝেছিল। আমার চোখে যে আত্মহারা মুগ্ধতা ফুটে উঠেছিল তা হয়ত সেও লক্ষ্য করেছিল। দেখেছিলাম সূক্ষ্ম গর্বমিশ্রিত আনন্দের সঞ্চরন তার চোখের দৃষ্টিতে। আমার পাশের চেয়ারে বসে শুভসন্ধ্যা জানিয়ে অতি মৃদু গলায় কেমন রহস্যময় ভঙ্গীতে সেই চিরাচরিত প্রশ্নটি করেছিল।

—কেমন আছেন মাদ্‌মোয়াজেল ?

আজও জানিনা মনের কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করা সেই প্রশ্ন আমার কানে এনেছিল অন্য একটি প্রশ্ন। তার নরম চোখের আলোয় আর মৃদু কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনা পেয়েছিল সেই প্রশ্ন।

—এতদিন কোথায় ছিলেন ?

নাটোরের বনলতা সেনের মত তার চোখে দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন পাখির নীড়ের মত নিবিড় কোন আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি।

—ভালো মসিয়েঁা। আপনি?

সমান রহস্যময় ভঙ্গীতে জবাব দিয়েছিল সে।

—খুব ভালো।

ছোট্ট করে হেসেছিল একটু। আমি কি বলব বুঝতে পারছিলাম না।

ততক্ষণে কিছুটা আত্মস্থ হয়েছিলাম। স্থানকালবোধ ফিরে পেয়েছিলাম। আর হঠাৎ যেন রাজ্যের লজ্জা এসে ঘিরে ধরেছিল আমায়। তার চোখে তখন ঘনিয়ে এসেছিল নিবিড় এক মুগ্ধতা। একটু যেন খুঁটিয়ে দেখেছিল সে আমার শরীর। পুরোপুরি নিষ্পাপ, নিষ্কাম ছিল না সেদিন তার চোখের দৃষ্টি। অবাধে সঞ্চরণরত তার দৃষ্টি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমার শরীর। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েছিল তা আমার বুকে।

আগে ঠিক তেমনটি দেখিনি। তাকে পরে বলেছিলাম সে কথা। সে হেসে একটি বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়েছিল।

—সেদিন সন্ধ্যায় তোমাকে আমার সম্পূর্ণ নিজের বলে মনে হয়েছিল। সেই অধিকারবোধে হয়ত চোখের সংযম মানিনি। দৃষ্টি দিয়ে ভোগ করেছি তোমায়।

মিশেলকে বরাবর একরকম দেখলাম। সে যা করে তার জন্য বিন্দুমাত্র গ্লানি বোধ করেনা কখনও। মিশেলের জবাব শুনে মনে হয়েছিল আমিও তো সে সন্ধ্যায় মনে মনে পুরোপুরি নিষ্কাম ছিলাম না। বার্নার্ড শ-এর সেণ্ট জোন-এর এক জায়গায় এমন একটি প্রশ্ন ছিল। শরীরের সংযম কি সব সময়ে মনের সংযমও বোঝায়? মনে মনে অনেক ইচ্ছা অনেক সময় অবাধ, দুরন্ত হয়ে উঠতে চায়। শরীর হাত গুটিয়ে থাকে বলেই তার প্রকাশ ধরা পড়ে না লোকচক্ষে।

মিশেলের কথা শুনে আমারও মনে উদয় হয়েছিল সেই প্রশ্ন। সেই সঙ্গে নিজেকেও প্রশ্ন করেছিলাম। আমি যে তার মত অবাধে বলতে পারি না আমার ইচ্ছার কথা তার মূলে কি আছে আমার ভণ্ডামী? বিশ্লেষণ করে জবাব পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম সেটার মূলে আছে ভণ্ডামী নয়, লজ্জা, সংকোচ। দীর্ঘদিনের সংস্কার আর শিক্ষার প্রভাব রাতারাতি অস্বীকার করা সহজ নয়। আমাদের 'জেনেটিক কোড'ও হয়ত সেই কথাই বলে।

মিশেলের সঙ্গে আমার যে অখণ্ড সম্পর্ক আজ গড়ে উঠেছে তা রোদ বাতাসের মত সহজভাবে বিনা বাধায় আসেনি। নানা ঘটনার মধ্যে খণ্ড খণ্ড ভাবে গড়ে উঠেছে তা। যে সব অনুভূতি, যেসব বিশ্লেষণের সোপান ধরে ধরে আমি সেই প্রার্থিত মঞ্জিলে প্রবেশ করেছি সেগুলিকে অগ্রাহ্য করলে আমার এই দুর্লভ আরোহণের সত্যটিই মিথ্যা হয়ে যায়।

সেদিন লাইব্রেরিতে দু'চারজন যারা বসে বসে পড়ছিল তাদের কেউ কেউ চোখ তুলে লক্ষ্য করেছিল আমাদের। মিশেল সেটা বুঝেছিল কিনা জানিনা। তবে আমি তাদের দৃষ্টিতে কৌতূহল অনুমান কৌতুক খেলা করতে দেখেছিলাম।

মিশেল যথারীতি সম্রাটের মত নিয়ন্ত্রিত করছিল পরিবেশ। অপরের প্রতিক্রিয়া দেখে বিচলিত হবার মত মানসিকতা তার মধ্যে কোনদিনই দেখিনি। কিন্তু আমি যে কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে উঠছি সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় পরিবেশ সহজ করতে চাইল সে।

—মাদ্‌মোয়াজেল! আপনি ক্লাস করছেন না কেন?

—ভাবছি কি হবে করে? শেষে যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে তো সবই অনর্থক হয়ে যায়।

—কাজে লাগবে না বলে ভাবছেন কেন? আর কাজে লাগাতে চাইলে ঠিকই লাগাতে পারবেন। সেদিক দিয়ে কি আপনি কিছু চিন্তা করেছেন?

—না তা করিনি। তবে আমি যে ধরণের কাজ করি তাতে আমার ফরাসী চর্চা কাজে লাগানোর কোনই সুযোগ নেই।

—কি কাজ করেন আপনি?

আন্তরিক কৌতূহলের সুর তার প্রশ্নে। এর আগে কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন তাকে করতে দেখিনি। সেদিক থেকেও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল সেই সন্ধ্যা। তার আর আমার মধ্যে পরিচয়ের গণ্ডীটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হচ্ছিল। আরও কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছিল সে সেদিন।

আমার পরিবার সম্পর্কে, আমার নেশা, পড়াশোনা গানবাজনার শখ ইত্যাদি সম্পর্কে ক্রমাগত কৌতূহল প্রকাশ করছিল সে। তার কৌতূহল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পর্কে আমার মনের অনেক কৌতূহলেরও নিবৃত্তি করছিলাম। হঠাৎ একটি বিপজ্জনক প্রশ্ন শুনে চমকে গিয়েছিলাম।

—মাদ্‌মোয়াজেল আপনার বয়স কত?

বয়স নিয়ে তার আগে কোন দুর্বলতা ছিল না আমার। কিন্তু সেদিন তার প্রশ্ন শুনে মনে মনে একটু অপ্রসন্ন হয়েছিলাম। আমি আলিঁয়সের ছাত্রী। বয়স জানতে চাইলে সে তা অনায়াসে জানতে পারত। আমাকে প্রশ্ন করার দরকার ছিলনা। পরীক্ষার ফর্মে বয়সের উল্লেখ করতে হয়।

তবু কেন সে আমার মুখে সেটা শুনতে চেয়েছিল তা আজও জানিনা। আমিও তাকে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করিনি পরে। মনে হয়েছিল আমার মনোভাব বুঝতে পেরে ক্ষুব্ধ হবে সে, অপ্রসন্ন হবে। তবু তাকে সঠিক জবাব দিয়েছিলাম সেদিন।

—চৌত্রিশ।

চকিতে বিস্ময়ের দ্রুত ঝলক উদ্ভাসিত হয়েছিল তার চোখে। তার অকপট বিস্ময় ব্যক্ত করেছিল সে নির্দ্বিধায়।

—আশ্চর্য! আপনাকে দেখে একেবারেই তা মনে হয়না।

সে কথা অজানা ছিলনা আমার। যেদিন ছেলেদের মুখে আমার বয়স নিয়ে আলোচনা শুনেছিলাম সেদিন আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলাম ওরা কি করে অনুমান করল?

পরে জেনেছিলাম ওরা অন্যভাবে জানতে পেরেছিল সেটা। শীতল যাদবের দিদি আমার সঙ্গে ইতিহাসের ছাত্রী ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। আলিঁয়সে আমার অভিনয় দেখে চিনতে পেরেছিল। ভাইকে বলেছিল। মোটামুটি একটা হিসাব অনুমানে ধরে নিয়েছিল ছেলেরা। অন্য কোন ভাবেও অবশ্য জানতে পেরে থাকতে পারে ওরা।

আমার পাতলা ছিপছিপে শরীর, আমার নরম চামড়া কিংবা আমার বুক আর কোমরের গড়ন দেখে সঠিক বয়স যে অনুমান করা যায়না তা আমি পরিচিত অনেকের মুখে অনেকবার শুনেছি। এতদিন সেটা সপ্রশংস উক্তি মনে হয়েছে। কিন্তু মিশেলের মুখে সে প্রসঙ্গ আমার তেঁতো বিস্বাদ কটু লেগেছিল। বিস্ময় প্রকাশের পরে পরেই নিজের বয়সের কথা উল্লেখ করেছিল সে।

—আমার বয়স উনত্রিশ।

মিশেলের চেহারায়ও এমন টানটান সতেজ একটা তারুণ্য আছে যে তাকেও বয়সের তুলনায় অনেক ছেলেমানুষ মনে হয়। উনত্রিশ বছর বয়স একজন পুরুষের পক্ষে কোন বয়সই নয়। তবু তার যুবকশরীরের তুলনায়

মুখের অভিব্যক্তি ছিল অনেকটা কিশোরের মত। আমার মনোভাব কিন্তু ব্যক্ত করিনি। পরস্পরের পিঠ চুলকানির ব্যাপার হতো সেটা।

আমার কেন যেন মনে হয়েছিল আমার বয়সের কথা জেনেছে যখন তখন দমে যাবে ও। নিজেকে গুটিয়ে নেবে। পরে যখন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তখন বুঝেছি কুয়োর ব্যাঙের মত মানসিকতা দিয়ে অনেক কিছু বিচার করি আমরা। দেশে দেশে যে চিন্তাধারা মানসিকতা বিকশিত হচ্ছে তার সঙ্গে পরিচয় থাকেনা বলেই মনগড়া যত আশঙ্কা পুষে রাখি মনে। অকারণ কষ্টে পীড়ন করি আত্মাকে।

সেদিন অতখানি অগ্রসর ছিলাম না। ভেতরে ভেতরে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলাম। একটা অপরাধবোধ ইঁদুরের মত কুরে কুরে খাচ্ছিল ক্রমাগত। আজও সেটা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়নি।

এখনও আমার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব টের পাই। মিশেলের প্রতি গভীর আসক্তিময় ভালবাসা ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে দুঃসহ এক গ্লানিবোধ। বীজাণুর মত গ্রাস করে নেয় মানসিক স্বাস্থ্য, স্বস্তি, আনন্দ।

সেদিন আমার সেই আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছিল একটু পরেই। একটুক্ষণ চুপ করে কি ভেবেছিল মিশেল। তারপরেই সেই চিরন্তন অনুভূতি ব্যক্ত করেছিল অনাড়ম্বর ভাষায়।

—মাদ্‌মোয়াজেল! জো টেইম।

মাদ্‌মোয়াজেল! আমি তোমায় ভালবাসি। শিউরে উঠেছিলাম আমি। সে কথা অনুমান করেছিলাম আগেই। কিন্তু মুখে অকপট ভাষায় যখন ব্যক্ত করল সে কথা তখন আমার মনে হোল সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য ছেনে এনে উপহার দিল সে আমায়।

আমার রক্তে শিরায় উপশিরায় ঝন্‌ঝন করে উঠল সে কথা। এক মুহূর্ত আমি সেই শব্দঝঙ্কারের মধ্যে বন্দী হয়ে রইলাম। জো টেইম, জো টেইম—শব্দ দুটি আমাকে ঘিরে উল্লাসের নৃত্য করতে লাগল। অসহ্য সুখে আর ভালবাসায় আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল।

আমার কর্ণকুহরে ঝিঁঝিঁ পোকার মত গুঞ্জরণ করে বেড়াতে লাগল সেই শব্দ। একটু পরে সেই আবিষ্ট ভাব কেটে গেলে মুখ তুলে তাকাই। দেখি আমার অতি সন্নিকটে এসে গভীর তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে। তার দুই পিঙ্গল চোখে সপ্রেম সেই তৃষ্ণা দেখে আমার

শুধু একটি কথাই মনে হোল। ঈশ্বর! এত সুখ সইবে তো?

হঠাৎ আমার অজানতে দুচোখ জলে ভরে গেল। লাইব্রেরিতে বসে আছি। সংখ্যায় কম হলেও আশেপাশে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে। তাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি বর্ষিত হবে আমাদের দিকে। এসব কোন কিছুই মনে থাকল না। সব কিছু বিস্মৃত হলাম একেবারে। বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত বাধা মানল না অশ্রু। শত বাধা বিপর্যয়ের মধ্যে বুক নিঙড়ে যে ভালবাসা জন্ম নিয়েছে তা ব্যক্ত হোলো সেদিন কান্নার মধ্যে।

পরে মিশেল আমাকে ভারী সুন্দর একটি কথা শুনিয়েছিল। সে বলেছিল 'তোমার মানসিক ঐশ্বর্যকে দেখতে পেয়েছিলাম আমি তোমার কান্নার মধ্যে। তোমার নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণা সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় ঝরে পড়েছিল বলেই যেন আরও অন্তরঙ্গ করে চিনেছিলাম তোমার আসল রূপটি।'

আরও একটি অদ্ভুত কথা বলেছিল সে সেই প্রসঙ্গে।

—জানিনা তোমার প্রতি পক্ষপাতের জন্য একথা বলছি কিনা। কিন্তু আমার মনে হয় কোন অল্পবয়সী মেয়ের প্রেমে পড়লে এতখানি পেতাম না। তোমার ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া পেয়ে সবকিছু কেমন রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। সেদিন যে কান্না তুমি উজাড় করে দিয়েছিলে তা আমার কাছে এক আশ্চর্য দুর্লভ সম্পদ বলে মনে হয়েছিল। পৃথিবীর খুব কম পুরুষের ভাগ্যেই জোটে এমন একটি মহার্ঘ্য উপহার। মীনাক্‌শি! তুমি খালি বয়সের কথা তোল। তোমার বয়স তিল তিল করে তোমার যে চেতনা তৈরি করেছে তার আসল চেহারাটা তো তুমি নিজে দেখতে পাও না! যদি পেতে তাহলে কস্তুরী মৃগের মত নিজের মধ্যে নিজের সুরভির খোঁজে উন্মাদ হয়ে যেতে।

॥ বার ॥

শেষ পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম নতুন ক্লাসে। মিশেলের অনুরোধ ঠেলতে পারিনি বলে। মঁসিয়ো কুর্তিকে নির্বাচিত করা হয়েছিল আমাদের শিক্ষক। মিশেলের কাছে ক্লাস করার বাড়তি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম বটে কিন্তু অপর দিক থেকে স্বস্তিও পেয়েছিলাম যেন।

'জো টেইম' দীক্ষামন্ত্রের মত আবিষ্ট করে রেখেছিল আমাকে। সেকথা

শোনার পর শিক্ষকছাত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখা খুব অসুবিধার ব্যাপার। যতদিন সংশয় ছিল ততদিন দূরত্ব বজায় রেখেছি। এখন মনের মধ্যে পেখম তুলে যে ময়ূরটা নাচছে সে যেন আগল মানতে চাইছে না।

বিয়ের পর আমার কাছে বিদিশা তার একটা ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছিল। কোন একটা প্রসঙ্গে রেজেস্ট্রি বিয়ে ও আনুষ্ঠানিক বিয়ের সুবিধা-অসুবিধার কথা উঠেছিল। ও আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলেছিল যে রেজেস্ট্রি বিয়েতে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা আনুষ্ঠানিক বিয়ের তুলনায় অনেক কম।

পরক্ষণেই বাড়তি একটা মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে। বলেছিল অগ্নি সাক্ষী করে বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক পবিত্র এক শিহরণ আসে মনে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পুরুষকেও তার প্রভাবে নিজের বলে বোধ হয়। দুটি মানুষের মধ্যে দ্রুত সম্পর্ক স্থাপনে বেদমন্ত্রের, আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণের নাকি খুবই প্রভাব আছে।

বহুবেশী পুরুষটিকে দর্শনমাত্র অপছন্দ হলেও সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের শক্তিতে তাকে পরম আত্মীয় বলে সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় কিনা সে প্রশ্ন জেগেছিল আমার মনে। অপ্রয়োজন বোধে সে প্রশ্ন করিনি তখন। তাছাড়া ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ব্যক্ত করছে বিদিশা। তত্ত্বকথা নয়। কাজেই মূল সত্য কি বা কোথায় তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি।

কিন্তু লাইব্রেরি ঘরে দুচোখে তৃষ্ণা নিয়ে মিশেলের গাঢ় গভীর স্বরে ভালবাসা ব্যক্ত করার পর আমার ভেতরে ওলোটপালোট ঘটে গিয়েছিলো। পৃথিবীর অন্যান্য নারীপুরুষের কি হয় জানিনা। কিন্তু আমি নিজে মিশেলের সেই আত্মনিবেদনের পর থেকে ভেতরে ভেতরে অনেক পাল্টে গিয়েছিলাম। ভেতরে ভেতরে একটা অধিকারবোধেরও উন্মেষ হয়েছিল সেদিন থেকে। সেই দুটি কথা আমার ভেতরে এমন একটি সকাম ইচ্ছা জাগিয়েছিল যার তাগিদ আগে কোনদিন সেভাবে বোধ করিনি।

বিদিশা হেসেছিল পরে আমার কথা শুনে। সব কিছু ওর কাছে বলতাম না ঠিকই। কিন্তু কোন কোন বিশেষ অনুভূতি বা তাগিদ বুঝি নিজের ভেতরে দীর্ঘকাল চেপে রাখা যায় না। ও বলেছিল ওরকম কথা অনবরত একজন অপরজনকে বলছে। সেটা নিয়ে আমার কেন এত মাতামাতি বুঝতে পারছেনা ও। আর ফরাসীরা দিনে কতবার কতজনকে নির্দ্বিধায় একথা বলছে। ওদের কাছে এই কথার কতখানি গুরুত্ব?

আমার রাগ হয়েছিল শুনে। বলেছিলাম আমি আমার অনুভূতির কথা বলছি। অপরের কথা শুনতে চাইছি না। জবাবে আফশোষ করেছিল বিদিশা।

—তোর জন্য বড় ভাবনা হয় মীনাক্ষী। অন্ধের মত ছুটে চলেছিস। নিজের বাড়ির পরিবেশের কথাটাও ভাবলি না। আমি যেন নিমিত্তের ভাগী হলাম! কি কুক্ষণে যে তোকে ফরাসী শিখতে বলেছিলাম! এখন নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে। তোর বাড়ির লোকেও কিন্তু পরে আমাকে দোষ দেবে।

বিদিশা যাই বলুক আমার জন্য চেনা ভুবনের বাইরে নতুন এক ভুবন তৈরি হয়েছিল সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার পর। রাজরাজেশ্বর হয়ে বিরাজ করত মিশেল সেই ভুবনে স্বমহিমায়।

প্রথম প্রথম সমস্ত ব্যাপারটা কেমন স্বপ্নের মত সুন্দর আর বিচিত্র মনে হোত। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্খার চৌহদ্দি পেরিয়ে সে জিনিষ ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে মনে পড়ত সুন্দরদর্শন সেই বিদেশী যুবকের মুখ। বুকের মধ্যে ঘনিয়ে আসত গর্বমিশ্রিত সস্নেহ ভালবাসা।

অনেক সময় এমন হয়েছে যে স্কুলে 'অফ পিরিয়ড'-এ হয়ত বসে আছি। এটাসেটা কথা হচ্ছে। হঠাৎ সব কিছু মুছে গেছে চোখের সামনে থেকে। কুয়াশা ভেদ করে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুন্দর একটি মুখ। শিশুর মত হামটি মেরে চলে আসত সে আমার বুকের কাছে।

আর মাতৃস্তন্যের মত উদ্বেল হয়ে উঠত তখন নিবিড় মমতাভরা ভালবাসার সুধা। মনশ্চক্ষে ফুটে ওঠা সেই ছবি আমার মুখে কোনরকম রেখাপাত করত নিশ্চয়ই। কারণ সেরকম মুহূর্তে কোন না কোন সহকর্মীকে কৌতুক করতে দেখেছি তা নিয়ে।

—কি হোল মীনাক্ষী? একমনে তন্ময় হয়ে কার ধ্যান করছ?

চমক ভেঙ্গে যেত। ওদের কথা শুনে ভাবতাম ধ্যানের আরাধ্য দেবতার বরলাভই তো হয়ে গেছে! আমার সেই সৌভাগ্যের কথা জনে জনে ডেকে বলতে ইচ্ছা হোত। কিন্তু দাবিয়ে রাখতে হোত সে ইচ্ছা। পাঁচকান হলে তার জের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোবে। আর সবচেয়ে ভয় তো আমার নিজের বাড়িকেই!

মিশেল আমাদের আর পড়াত না। কিন্তু নাটক ইত্যাদি নিয়ে আগের মতই ব্যস্ত থাকত সে। সেই সব উপলক্ষে তার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রটা অবিচ্ছিন্ন থাকত। কিন্তু আমি আর অভিনয় করতে রাজী হলাম না। মিশেলকে সত্যি কথাই বললাম। আমার বাবা পছন্দ করেন না এসব। আগে তাকে না জানিয়ে দুঃসাহস দেখিয়েছি। এখন আর তা সম্ভব নয়। তার কানে আমাদের কথা এসেছে। মিশেল বুঝে নিল। তবে রসিকতা করতে ছাড়ল না।

—এখন অবশ্য তার প্রয়োজন হবে না। অভিনয়ের সুযোগে তোমাকে প্রেম নিবেদনের কিংবা কখনও কখনও অল্প একটু আলিঙ্গন করার। এখন ইচ্ছা হলে আমার বুকের মধ্যে পিষে ফেলতে পারি তোমাকে।

—কি সুন্দর কথা! মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি!

রাগ দেখাতাম। কিন্তু তা মুখে। ভেতরে আমার মধ্যে যে ইচ্ছার বীজ বপন করা হয়েছিল সেই সন্ধ্যায় সেটা একটু একটু করে মহীরুহের আকার নিচ্ছিল। মিশেলের কথা শুনে নাড়া লাগত সেটায়। আমার ইচ্ছে করত সে আমায় নিষ্পিষ্ট করুক তার আলিঙ্গনে। তার নিবিড় সান্নিধ্যে ফিরে পাই আমি নিজেকে।

তবু আমরা কোনদিন উর্বশী লোগ্রোঁর মত প্রকাশ্যে নির্লজ্জ হয়ে উঠিনি। ফরাসী হয়েও সেদিকে খেয়াল ছিল মিশেলের। তার কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার সেজন্যই। আমার প্রতি তার আগ্রহ সে কোনদিনই গোপন করার চেষ্টা করেনি।

কিন্তু আমি যাতে অসুবিধায় না পড়ি সেদিকেও সবিশেষ খেয়াল ছিল তার। তার সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তও উপভোগ করেছি। তার নিবিড় সান্নিধ্যের উত্তাপে আবেগ-উত্তাল অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হয়েছি। কিন্তু তার জন্য স্থানকালপাত্রের চিন্তা বিসর্জন দেয়নি সে অনেকের মত।

বিদিশা অবশ্য অন্য কথা বলে। ও বলে নিজের পথ খুলে রাখছে মিশেল। সব দিকে যাতে জট না বাধে সেটাই দেখছে ও। ছোট্ট একটি গ্রন্থি অনায়াসে খুলে নিয়ে চলে যেতে পারবে ও প্রয়োজন হলে। অনেকের তুলনায় ও অনেক কম বেহিসেবী।

আগে এসব কথা শুনলে রাগ হোত। এখন অন্য রকম অনুভূতি হয়। জীবনে বিরাট এক ধাক্কা খেয়েছে ও। বুদ্ধিবৃত্তির স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক প্রবাহ

ব্যাহত হয়েছে তাই। আমি বুঝি ইচ্ছা করে ও এসব কথা বলে না। আরও বুঝি আমার জন্য ওর মনে গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে কোন খাদ নেই। তাই প্রতিপদে আমাকে সাবধান করে দেয় ও। ভবিষ্যতের যে কালো ছায়াটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তাকে ও আড়াল রাখার চেষ্টা করে না আমার কাছে থেকে।

তবু বিদিশাকে সব কিছু না বলে পারিনা আর। যখন পেরেছি পেরেছি। আমার বাড়িতে একজনেরও কাছে যদি বুকের বোঝা হালকা করতে পারতাম তাহলে বিদিশাকে বাদ দিতে পারতাম। কিন্তু আমাদের বাড়িতে বাধানিষেধ আর রক্ষণশীলতার পরিবেষ্টনীর মধ্যে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্ক তৈরি হতে পারেনি।

দিদির সঙ্গে একাধিকবার গিয়ে দেখা করেছি। কিন্তু সেখানেও আশ্রয় পাইনি। বয়সের কথা তুলে দেশের কথা তুলে আমাকে নিবৃত্ত করারই চেষ্টা করেছে ও কেবল। নিজের সন্তানশোকের কারণ হিসাবে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ না পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে সকাতর অশ্রুসজল চোখে। আমার মনে হোত পরোক্ষে আমাকে যেন ও ভয় দেখাতেই চাইত।

এসব সত্ত্বেও আমার জীবনে অনাস্বাদিতপূর্ব আবেগের জোয়ার এসেছিল যেন। ক্লাসে মিশেলের সঙ্গে দেখা হোতনা বলে ক্লাসের দিনগুলোতে চেষ্টা করে আগে চলে আসতাম। লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করতাম মিশেলের জন্য।

বাইরে থেকে আমাদের সম্পর্কের হেরফের নিঃসংশয়ে বোঝা যেত না। নীচু গলায় কথা বলতাম আমরা পরস্পরের সঙ্গে। যেদিন একটু সেজে আসতাম ধরা পড়ে যেতাম তার কাছে। অবাধ দৃষ্টিতে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত লক্ষ্য করে গাঢ় গলায় প্রশস্তি জানাত ও।

—তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে মীনাক্ষি। নিজেকে আমি আর ধরে রাখতে পারছি না।

আমার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হতো। আনন্দ, উত্তেজনা আর ভয়ের মিশ্র অনুভূতি খেলে যেত মনে। বলতে ইচ্ছা করত 'আমিও আর নিজেকে ভাবে ধরে রাখতে পারছি না।' মুখে বাধত সেকথা। সন্ত্রস্ত হয়ে বুকের আঁচল ঠিক করতাম নিজের লজ্জা চাপা দিতে না পেরে। মুখে বলতাম অন্য কথা।

—এসব কথা থাক্। তোমাকে যে বইটা আনতে বলেছিলাম এনেছ ?

নিজের ঝোলা থেকে সেই বই বার করে রসিকতা করত সে।

—তুমি যদি অনুমতি কর বট্টিচেলীর দু'একটা ছবি তোমাকে দেখাই। তোমার শরীরের সঙ্গে————

আমি তখন সত্যি সত্যি রেগে যেতাম।

—তুমি কি সুরু করেছ মিশেল ? এসব কথা কেউ শুনলে কি ভাববে বলত ?

—কিছুই ভাববে না। সকলেই জানে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা। আচ্ছা মীনাক্শি তোমার কি ধারণা কেউ বুঝতে পারে না আমরা কেন একসঙ্গে বসে এভাবে কথা বলি ?

—সেকথা হচ্ছে না। কিন্তু কোন কোন কথার অনেক কিছু প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ভারতবর্ষের সমাজ তুমি ভাল করে চেন না।

—এটা তুমি ঠিক বলেছ। তোমাদের অনেক কিছু আমার কাছে খুব আশ্চর্য ঠেকে। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি তোমাদের দেশেও কম হয়নি। তবু তোমাদের সমাজমানসের মধ্যে তার যেন তেমন প্রতিফলন দেখি না। দুটি নারীপুরুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দেখলেই মারমুখী হয়ে ওঠে যেন তোমাদের সমাজ।

—আমার মনে আছে তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে যে ভারতবর্ষের আত্মাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলে তুমি। তোমার ভারতবর্ষে আসার মূলে শুধুই বাধ্যবাধকতা নেই। স্বেচ্ছায় এদেশে এসে এখানকার জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছ তুমি।

—তা আমি আজও অস্বীকার করছিনা মীনাক্শি। ভারতবর্ষের এই আত্মাকে আমি খুঁজে বেরিয়েছি প্রথম থেকেই। আর তার প্রকাশ নানাভাবে লক্ষ্য করেছি অনেকের মধ্যে। হয়ত সচেতন নও বলে অনেক কিছু আমার মত করে দেখতে পাও না। কিন্তু আমার কৌতূহলী উৎসুক অন্বেষণকারী দৃষ্টিতে এমন অনেক সত্য উদ্ভাসিত হতে দেখি যা তোমরা ধারণাই করতে পারবে না।

হঠাৎ অন্যরকম দেখায় মিশেলকে। একটু আগে বাসনাব্যাকুল হয়ে উঠেছিল যে তার মধ্যে উদ্ভাসিত হতে দেখি শাশ্বত আত্মার মহিমময়

প্রকাশ। তার গম্ভীর শান্ত সংযত মুখ দেখে বিশ্বাসই হবে না মাত্র একটু আগেই আমার শরীরের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। উদারাসপ্তক থেকে তারসপ্তকে এমন অনায়াস আরোহণ-অবরোহণ দেখে প্রতিবারই বিস্ময়ে অভিভূত হতাম।

আমার কৌতূহল হয়েছিল জানতে ভারতবর্ষের আত্মার স্বরূপটি কি ভাবে ধরা পড়েছে তার চোখে। আমার প্রশ্ন শুনে কোনরকম তর্কবিতর্ক বা আলোচনার মধ্যে না গিয়ে তার মত করে সুন্দর একটি উদাহরণ দিল।

—শনিবার সন্ধ্যায় যে মেয়েটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিল আমি তাকে লক্ষ্য করছিলাম। তুমিও তো এসেছিলে। লক্ষ্য করেছিলে ওর মুখচোখের ভঙ্গী? লক্ষ্য করেছিলে কি কেমন তন্ময় হয়ে চোখ বুজে গাইছিল ও? ওর কণ্ঠস্বরে, ওর মুখের অভিব্যক্তিতে সেই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছিলাম শাশ্বত ভারতবর্ষের আত্মাকে। এরকম এক একটি মুহূর্তে হঠাৎ হঠাৎ আমার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের শাশ্বত কিছু রূপ। তোমাকেও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি আমি। দেখি শরীর ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয় ছাড়িয়ে তোমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই আত্মা বিরাজ করছে শাশ্বত গৌরবে। সেরকম কোন মুহূর্তে আমার ইচ্ছা করে তোমার পায়ের কাছে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি তোমার দিকে। বুঝে নিই তোমার শরীরের কোথায় মূর্ত হচ্ছে তার বিপুল বিভাস।

আমার কান্না পাচ্ছিল। মানুষের আত্মার গভীরতম প্রকাশের মধ্যে বোধহয় লুকিয়ে থাকে এই কান্না। আমাকে সেই মুহূর্তে মন্ত্রোচ্চারণের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মিশেল এক দেবপীঠিকায়। পাহাড় পর্বত সমুদ্র-বেষ্টিত ভারতবর্ষের এক বিচিত্র উপলব্ধি ধূপধূনার সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত করে ভর করেছিল আমায়।

সেই উপলব্ধির তীব্র তরঙ্গস্রোতে বিদ্যুৎশিখাবৎ ভারতাত্মার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিলাম। যাদুকরের মত কুহককাঠি ছুঁইয়ে আমাকে কুহকঘোরে বন্দী করে ফেলেছিল মিশেল। আবার সে নিজেই অপর কাঠি ছুঁইয়ে কুহকঘোর থেকে মুক্ত করে আনল আমায়।

—মীনাক্‌শি! উর্বশীকে আমি বলেছি 'ভারতবর্ষের আত্মা' নাম দিয়ে কতগুলি ছবি আঁকতে। আমি তাকে বলেছি আমার অন্বেষণ, আমার আবিষ্কারের নিশানা দেব তাকে। খুব ভাল 'সিরিজ' হবে সেটি। উর্বশীর

প্রতিভা আছে। মনে হয় সে পারবে।

উর্বশীর নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কষ্ট সঞ্চারিত হোল মনে। উর্বশীর প্রতিভা নেই আমার। মিশেলের চিন্তাকে রূপায়িত করতে কোন-দিন সাহায্য করতে পারব না আমি উর্বশীর মত। আমার প্রতি মিশেলের এই আবেগ বদ্ধজলের ঘোলা হয়ে যাবে না ত?

আমার এই সংশয় অন্যভাবে প্রকাশ করি।

—তোমাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে মিশেল। মাঝখানে তোমার সঙ্গে উর্বশীর নাম জড়িয়ে একটা গুজব উঠেছিল। আলিয়ঁসের ছাত্রছাত্রী মহলে তা নিয়ে কিছুদিন একটু জলঘোলা করাও হয়েছিল। মাঝে-মাঝেই কানে আসত তোমাকে আর উর্বশীকে কোন রেস্তোঁরায় দেখা গেছে কিংবা তোমার বাড়িতে উর্বশী এসেছে কিংবা আলিয়ঁসের কোন অনুষ্ঠানে তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে গল্প করতে দেখা গেছে।

—তুমি কি বলতে চাইছ মীনাক্‌শি?

অকপট বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হয় মিশেলের গলায়।

—আমি তেমন কিছুই বলতে চাইছি না। শুধু বলতে চাইছি প্রথম প্রথম আমার খুব মন খারাপ হোত। ভাবতাম উর্বশীর মত শরীর দেখাতে ভালবাসে এমন মেয়েকে তোমার ভাল লাগছে কেন? উর্বশীকে নিয়ে নানা কথা বলে নানা জনে। সে ছবি আঁকে জানতাম। কিন্তু এত ভাল আঁকে তা জানতাম না। ওর ছবির প্রদর্শনী হবার আগে কত জনে কত কথা বলেছিল। আমি নিজেও বিরূপ ধারণা নিয়ে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। ঠিক ছবি দেখতে হয়ত নয়। বলা যায় ছবি পরখ করতে গিয়েছিলাম। ভাব কতখানি ছিল আমার ধৃষ্টতা। কিছুই বুঝিনা ছবির। তবু সেই উদ্দেশ্য নিয়েই উপস্থিত হয়েছিলাম আলিয়ঁসে। পরে মনে হোল মূর্খের স্বর্গে বাস করি আমরা অনেকেই। নিজেদের অক্ষমতা না বুঝে অন্যকে বিচারের স্পর্ধা দেখাই। উর্বশীর মত প্রতিভা আমাদের অনেকেরই নেই। তবু আমরা বাইরেটা দেখে বিচার করি কেবলি।

হেসে ফেলে মিশেল।

—হঠাৎ এসব কথা কেন মীনাক্‌শি?

—হঠাৎ নয় মিশেল। সেদিন প্রদর্শনীতে আমার চোখে জল দেখে তুমি তার কারণ জানতে চেয়েছিলে না? তার একটা কারণ কিন্তু উর্বশী ছিল।

—অনুমান করেছিলাম। একদিন উর্বশী আমার সঙ্গে তার ছবির বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। সিনেমা দেখতে এসেছিলে তুমি। আমি তোমার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তুমি তার প্রত্যুত্তর না দিয়ে ঢুকে গিয়েছিলে ভেতরে। তার কারণ কি হতে পারে ভেবে মনে হয়েছিল হয়ত উর্বশীই তার কারণ। সেদিন তোমার ঈর্ষা দেখে স্পষ্ট করে বুঝেছিলাম আমার প্রতি তোমার মনোভাবের চেহারা।

—ছিঃ মিশেল! তোমাদের পুরুষদের এই একটা বড় দোষ। আমাদের সব আচরণেরই একটা অপব্যাখ্যা করতে ভালবাস তোমরা। বিশ্বাস কর আমি কিন্তু ঈর্ষা বোধ করিনি। আসলে উর্বশীর সম্পর্কে ধারণা ভাল ছিলনা বলেই ওর সঙ্গে তোমার ঘনিষ্টতা পছন্দ হয়নি আমার। তোমার প্রতি আমার মনোভাব ঠিকই বুঝেছিলে তুমি। তোমার প্রতি দুর্বলতা না থাকলে আমার প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হতে পারত। তুমি তো জান এখনও মাঝে মাঝে তোমার জন্য খারাপ লাগে?

—সে কি? কেন? এখন তো বুঝেছ উর্বশীর শিল্পপ্রতিভার কদর করি আমি। তার শিল্পকলার সমঝদার একজন। তার বেশি অতিরিক্ত কোন সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার তৈরি হয়নি। তবে ওর জন্য বড় মায়া হয়। ওকে সকলে কেন এত অপছন্দ করে ভেবে পাইনা। আসলে একটা জিনিস তোমরা তলিয়ে দেখনি। দেখলে বুঝতে সব শিল্পীই একটা জায়গায় বড় দুর্বল। সেখানে সে মানুষের মায়া মমতা ভালবাসার জন্য কাঙ্গাল। উর্বশীর কথা আমিও কিছু কিছু শুনেছি। আমার মনে হয় ওকে বুঝতে পারে এমন পুরুষ আসেনি ওর জীবনে। যারা এসেছে ও তাদের আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। তারা অন্যভাবে বুঝে ওকে ধোঁকা দিয়েছে। ওর সঙ্গে কথা বলে আমার এমনই ধারণা হয়েছে। শরীর দেখানো যাকে বলছ আসলে সেটাও শারীরিক বা মানসিক যে কোন রকমের দুর্বলতারই প্রতিফলন। ভেতরে ভেতরে অসহায় বোধ করে যে মানুষ, তার নিরাপত্তাবোধ চিঁড় খেয়ে যায় যখন তখনই তার প্রকাশ এরকম নানা ভাবে হতে পারে বলে মনে হয় আমার। আমার দেশেও তো এরকম মেয়ে পুরুষ দেখেছি! তোমার সঙ্গে একটু খোলাখুলি আলোচনা করা যাক মীনাক্‌শি। মঁসিয়ো লোগ্রোঁকে আমি যতটুকু বুঝেছি খুব হাল্কা ধরনের। উর্বশী যে ওকে আঁকড়ে থাকতে চাইছে সেটা যখন ও বুঝল তখন আর ওর ভাল

লাগল না। খিটিমিটি বাধতে লাগল উর্বশীর সঙ্গে। লোগ্রেঁার সঙ্গে বিরোধের পর উর্বশীর সঙ্গে পরিচয়টা আমার ঘনিষ্ঠ হয়। বলতে পার উর্বশীই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিল। তোমার কাছে অস্বীকার করব না উর্বশী অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি করতেই চেয়েছিল। কিন্তু আমি মুখ ফিরিয়ে থাকিনি। ও যে কত অসহায় তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি। ওর সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করেছি। যতটুকু সম্ভব খোলাখুলি ওর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। ফলও হয়েছে। ও বুঝতে পেরেছে আমার মনোভাব। আর অন্যরকম চেষ্টা করেনি। ও যদি খারাপ হতো তাহলে নিবৃত্ত হতোনা। লেগে থাকতো ঠিক। আসলে কি জান মীনাক্‌শি আমরা মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবিনা, ভাবতে চাইনা। বাইরের আচরণটাই বড় হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। আর গোল বাধে সেখানেই।

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে থামে মিশেল। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম এ-মুহূর্তে। ঠিক এভাবে তলিয়ে চিন্তা করিনা আমরা অনেকেই। মিশেল ঠিকই বলেছে। যে মানুষ ভেতরে ভেতরে যত দুর্বল বোধ করে, যত অসহায় বোধ করে সেই বাইরে নিজেকে বেশি জাহির করে। তা সে যেভাবেই হোক্। আমি নিজেও তো দেখেছি বাইরে বাইরে ভীষণ রাগী আর দাপটে যে মানুষ ভেতরে ভেতরে সে তত দুর্বল আর অসহায়।

আমার জানতে ইচ্ছা করল মানুষের জন্য এই মমতা কিভাবে অর্জন করেছে মিশেল? তার এই গভীর উপলব্ধির মূলে কি তার পরিবেশের কোন প্রভাব আছে?

হঠাৎ মিশেল কেমন যেন আর্তস্বরে ডাকে আমায়।

—মীনাক্‌শি। আমি কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি আমার কথা?

—পেরেছ মিশেল।

—তাহলে বলো কেন তোমার খারাপ লাগে আমার জন্য?

—সেটা আমার নিজের কথা ভেবে। মনে হয় তোমার চেয়ে বয়সে কত বড় আমি। তোমার সঙ্গে আমার এই যে সম্পর্ক গড়ে উঠল তার জন্য নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়।

—তোমার ভূমিকা কতটুকু সে ব্যাপারে মীনাক্‌শি? তুমি তো কোনদিনই সে ব্যাপারে সক্রিয় বা উদ্যোগী হওনি। সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমার জন্য। মাঝে মাঝে মনে হয় কি জান? তুমি আমাকে করুণা করে

ভালবাসতে দিয়েছ। নিজে সেই নির্লিপ্ত উদাসীনই থেকে গেলে।

—ঠিক তা নয়। বারবার তোমাকে সেই এক কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে হয়। আমার ভেতরে একটা অপরাধবোধ আর গ্লানি কাজ করে। মাঝে মাঝে তোমাকে দেখে ভাবি এ আমি কি করলাম? মনে হয় তোমাকে যেন ঠকালাম। আমার থেকে অনেক সুন্দর আর কমবয়সী মেয়ের সঙ্গে মানাত তোমায়। আমার যত সংকোচ আর দ্বিধার মূলে আছে এই চিন্তা। তুমি আমায় মাপ করে দিও মিশেল।

—কখনই না। এ তোমার অমার্জনীয় অপরাধ। এতদিন পরে এসব চিন্তা একেবারে নির্মূল হওয়া উচিত ছিল তোমার মন থেকে। আসলে কি জান এইসব অকারণ চিন্তায় লাভ কিছু হয়না। শুধু মানসিক অশান্তি তৈরি হয়। আমার মনে হয় এইজন্যই তোমার আচরণে কেমন একটা আড়ষ্টতা দেখি। স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের অভাব কখনও কখনও খুব পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

—তুমি পশ্চিমের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। ভারতবর্ষের আত্মার কথা বলছিলে না? এসবের মধ্যেও তার প্রতিফলন পাবে। প্রতিমুহূর্তে এই আত্মবিশ্লেষণ এই আত্মান্বেষণের ফাঁদে ধরা পরি আমরা। উদ্দামতা বাধা পায় সেজন্য। অবশ্য আমাদের দেশেও এখন অন্য রকম হাওয়া এসেছে। তবে তারা সবাই নয়। আমার মধ্যে হয়ত পারিবারিক আবহাওয়া, মধ্যবিত্ত সংস্কার বাড়তি জটিলতা এনেছে। আমি সেকথা অস্বীকার করিনা। কিন্তু এসব নিয়েই তো আমি। আমাকে যদি মেনে নাও তাহলে এসব জিনিষও মেনে নিতে হবে তোমাকে।

—একটু রাগের মত শোনাচ্ছে যেন কথাগুলো। আমি জানি মীনাক্শি মানুষ যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে তার প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনা। কিন্তু যেসব জটিলতা মানুষে মানুষে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় সেগুলি তো কাটিয়ে উঠতেই হবে। তোমার বিরুদ্ধে আমার সেখানেই অভিযোগ মীনাক্শি। আমরা যেন কিছুতেই পরস্পর পরস্পরের কাছে আসতে পারছিনা।

আমি রসিকতা করি।

—এখনই অভিযোগ তৈরি হয়েছে? ভাববার কথা। এরপরে তো দেখছি পাহাড় তৈরি হবে অভিযোগের। আমাদের মধ্যে আড়াল করে

দাঁড়াবে না তো সেটা মিশেল ?

দ্রুত চারদিকে তাকিয়ে আমার হাতে মৃদু একটা উষ্ণ চাপ দেয় মিশেল। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে জরীপ করি চারদিকে। সেই মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য করার মত কেউ ছিলনা ধারে কাছে। দেখে আশ্বস্ত হই। আমার দিকে তাকিয়ে সেটা যেন বুঝতে পারে মিশেল। সস্নেহ স্মিত হাসি হেসে বঁসোঁয়া জানায় আমায়।

॥ তের ॥

জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর বাড়ির অনেক বাঁধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের ঢেউ এলো সেদিন যেদিন বড়দা এসে বাবাকে জানালো যে গড়িয়ার দিকে একটা জমি কিনেছে ও। শিগগিরই বাড়ি তৈরি করে চলে যাবে সেখানে।

বাবা খুবই আহত হলেন। চিরকালের জন্য নয় একান্নবর্তী পরিবার। কালের নিয়মে তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তার সূচনা আসবে তা আদৌ ভাবেননি তিনি। আঘাতটা পেলেন বোধহয় সেজন্যই। খবরটা আমাকে শোনালেন মা।

—মীনা শুনেছিস খোকন জমি কিনেছে গড়িয়ায়। শিগগিরি চলে যাবে বাড়ি করে। বাবা মন খারাপ করছিলেন। বলছিলেন দাদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে এভাবে সবাই পর হয়ে যাবে তা আমি ভাবিনি। দাদা থাকলে এ জিনিষ হতোনা।

মায়ের কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারি তারও খুব খারাপ লাগছে। শুধুই বাবার মনোভাব ব্যক্ত করছেননা। নিজের মনোভাবের চেহারা দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। যতটা খারাপ লাগা উচিত ততটা খারাপ যেন লাগছে না। বরং মনের গভীরে সূক্ষ্ম একটা মুক্তির আনন্দ অঙ্কুরিত হতে চাইছে। পলকের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল ভবিষ্যতের একটা ছবি।

আমাদের চারজনের পরিবারে নতুন হাওয়া বইছে। সাবেকী চালচলন অন্তর্হিত হচ্ছে। রক্ষণশীলতার চূড়ায় বসে জ্যাঠামশায় আর জ্যাঠাইমা আর নিয়ন্ত্রিত করছেন না সবকিছু! দিদি আবার আসা যাওয়া সুরু করেছে এ বাড়িতে। শঙ্করদার সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বাড়ির লোকের।

কিন্তু এসব ছবিকে ম্লান করে উদ্ভাসিত হলো যে ছবি তা আমার আর মিশেলের মিলিত জীবনের ছবি। দিদির কথা মনে করে মেনে নিয়েছেন বাবা-মা মিশেলকে। মিশেলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ব্যবহার করছেন তারা। দাদাও কোনও বিরোধিতা করছে না। বিধা বাধায় রেজেস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের। অতঃপর পতিগৃহে যাত্রা। কলকাতার বাস উঠিয়ে ফ্রান্সে পাড়ি দেওয়া। বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে ওঠা সেই ছবিটা আচমকা ফেটে গেল মায়ের প্রশ্নে।

—মীনা রাগ করিস না। একটা কথা শুনলাম। বাবু আমায় আগেই বলতে বলেছিলেন। আমি তেমন গা করিনি। কাল আবার দিদিও কথাটা বলছিল বলে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাইছেন মা। এসব ব্যাপার অবশ্য চিরদিন চাপা থাকে না। আর চাপা থাকলেও চলে না। তবু সংঘাতের মুখোমুখী হতে বড় ভয় পাই আমি।

বাড়ির ছোট মেয়ে বলে বরাবরই শাসনের দড়ি ঘুরিয়েছে সকলে আমার ওপর। বিয়ের আগে দিদিও কম শাসন করেনি। এই সবের দরুন অনেকের তুলনায় ভীতু স্বভাবের আমি। এত বয়স পর্যন্ত আমার জীবন যে বিশেষ অর্থে ঘটনাবিহীন রয়ে গেছে তার কারণ অনেকটাই আমার এই ভীতু স্বভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে অনেকে মিলে কফি হাউসে নরক গুলজার করেছি। কিন্তু বিশেষ একজনের সঙ্গে চা খেতে যাওয়া বা সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা এর আগে হয়নি।

ব্যতিক্রম মিশেলের ক্ষেত্রে। তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাইনি অদ্যাবধি। কিন্তু পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোঁরায় বসে কফি পান করেছি একাধিকার। লাইব্রেরিতে বসে বহুক্ষণ ধরে গল্প করেছি। তার চেয়েও বড় কথা তার গাড়িতে কবে বেড়িয়েছি, ঘুরেছি অনেক জায়গা। তার কাছে আমার দুর্বলতাও ব্যক্ত করেছি অকপটে। এ শুধু অভূতপূর্ব নয়, অভাবনীয়ও বটে। মাঝে মাঝেই ভাবি আমি এটা নিয়ে। আমার এত লজ্জা, ভয় দ্বিধা, কোন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হলো?

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আমার স্বভাবের কোন হেরফের অদ্যাবধি চোখে পড়েনি আমাদের পরিবারের কারুর। এখনও পর্যন্ত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হয়নি আমায়। যেভাবেই হোক্ বাবার কানে গেছে মিশেলের কথা।

তবে আমার সঙ্গে তার সরাসরি তা নিয়ে কোন কথা হয়নি এ পর্যন্ত। বিদিশার কাছে ব্যক্ত করেছেন তিনি তার আশঙ্কা।

বিদিশা আমাকে জানিয়েছে সেকথা যথাসময়ে। কিন্তু পারিবারিক সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি আজ পর্যন্ত। মায়ের কথায় আমার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হলো। জ্যাঠামশাই জীবিত থাকলে কি হতো চিন্তাই করতে পারিনা। কিন্তু জ্যাঠাইমাকেও তা বলে কম ভয় করি না। আর শুধু ভয় নয়। সীমাহীন লজ্জা এসে ঘিরে ধরে আমায়।

মা বোধ হয় বুঝলেন। আমার পাশে ঘন হয়ে বসে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিলেন।

—বাবু আমাকে আগেই বলেছিলেন। কাল আবার দিদির মুখে শুনে চিন্তায় পড়লাম। খোকনের মুখে শুনেছে দিদি। তোর নাকি এক ফরাসী সাহেবের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন মা। আমি নির্বাক থাকি। আমাকে নির্বাক দেখে বাধ্য হয়েই তার চরম আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

—সকলেই নাকি বলাবলি করছে ঐ সাহেবকে তুই বিয়ে করবি। খোকন তো বলছে কে জানে হয়ত বা রেজেস্ট্রিও হয়ে গেছে এর মধ্যে।

এরকম একটি মুহূর্ত আসবে জানতাম। আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তর্জনগর্জন শুনতে হবে। কিন্তু মায়ের সকাতর সংশয়ে মিশ্র এক প্রতিক্রিয়া হয় আমার মধ্যে।

একদিকে মায়ের কষ্ট দেখে অনুশোচনা অপরদিকে অবোধ্য আনন্দের টানাপোড়েন চলে। মায়ের মুখে মিশেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা কিংবা মিশেলকে কেন্দ্র করে বড়দাদের আশঙ্কা পরোক্ষে স্বীকৃতি দিল যেন মিশেলকে। ইচ্ছায় না হোক অনিচ্ছায় অন্ততঃ আমার জীবনের সঙ্গে একটু যেন জুড়ে দিলেন তারা মিশেলকে।

আবার আমাদের রক্ষণশীল পরিবারের পক্ষে এই ঘটনা যে কত বড় আঘাত তা অনুধাবন করা কঠিন নয়। কিন্তু ঘটনা যেভাবে এগিয়ে গেছে তাতে তাকে আর এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আজ হোক কাল হোক তার মোকাবিলা করতেই হবে।

শঙ্কিত চোখে আমাকে লক্ষ্য করতে থাকেন মা। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি স্বাভাবিকভাবে জবাব দিতে।

—যা শুনেছ তা মিথ্যা নয় মা। সত্যিই আলিঁয়সের এক সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে আমার। তবে রেজেস্ট্রি করার কথা যা শুনেছ তা ঠিক নয়।

—তুইও তোর দিদির মত কষ্ট দিলি আমাকে? আমি কি কপাল করে এসেছিলাম বলতে পারিস? একজন লোক হাসিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। ভাবলাম অন্য জনের বিয়েটা দেখে শুনে ভালভাবে দেব। তা এমন অদৃষ্ট বয়স হয়ে গেল। কিন্তু উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষে খুঁজে পেতে বাবু যাও বা ভাল একটা সম্বন্ধ আনলেন তাও বরাত দোষে টিকল না। আর এখন শুনছি তলে তলে এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছিস তুই? আমাদের কথাটা একবারও ভাবলিনা?

আর্তনাদের মত বুকভাঙ্গা আওয়াজ বের হয় মায়ের কণ্ঠ থেকে। মায়ের অভিব্যক্তি দেখে মনে হোল মিশেলের কথা। ও দেখলে অবাক হয়ে যেত। আমার বয়সী কারুর প্রেম করার স্বাধীনতাও নেই—এ জিনিষ ওর কাছে অকল্পনীয়। অনেকবার আমার ভয় দেখে সংকোচ দেখে অকপট বিস্ময় প্রকাশ করেছে ও।

—তুমি বারবার তোমার বয়সের কথা বলো। কিন্তু তোমার আচরণ তো অপরিণতবয়সী মেয়ের মত। তোমার এত ভয় আর সংকোচ দেখে আমার বড় অদ্ভুত লাগে।

আমি প্রতিবাদ না করে বোঝাতে চেয়েছি।

—আমি অস্বীকার করছিনা মিশেল। কিন্তু তুমি যদি জানতে কেমন পরিবারে আমি মানুষ হয়েছি তাহলে অবাক হতে না। বরাবর বড়দের শাসনের মধ্যে থেকেছি। অনেক ব্যাপারেই নিজেদের মতামত কিংবা পছন্দ অপছন্দ জানানোর কোন সুযোগ পাইনি। প্রেম. বিয়ে সম্পর্কিত ব্যাপারে নিজস্ব মতামত জানানোটা বড়রা বেহায়াপনা বলে মনে করেন। এতদিন এই আবহাওয়ার মধ্যে থেকেছি। রাতারাতি বদলাব কি করে বলতে পার?

মিশেল তবু মেনে নেয়নি পুরোপুরি।

—সব দায় বড়দের ঘাড়ে চাপিওনা মীনাক্‌শি। তোমাদেরও কি কোন দোষ নেই? আসলে তোমরা নিজেরাও নিশ্চিন্ত পরিবেশের মায়া কাটিয়ে ঝুঁকি নিতে চাওনা।

আমিও মেনে নিইনি।

—মিশেল তুমি বার বার এক কথা বলছ। আমি দায় এড়িয়ে যাচ্ছিনা। শুধু বলতে চাইছি আমরা যে ঝুঁকি নিতে পারিনা তার একটা বিশেষ কারণ আছে।

—কারণ থাকতেই পারে। সেটা নিয়ে কথা হচ্ছেনা। কিন্তু সেটা নিয়ে আত্মসন্তুষ্ট থাক কেন তোমরা? জীবনে বড় কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয় মীনাক্‌শি। ঝুঁকি নেওয়ার প্রশ্ন সেখানেই। চিরকাল বড়দের ছাতার তলায় থাকতে পারনা তুমি।

মায়ের আর্তনাদ শুনে আমার প্রতিক্রিয়া তাই অবিমিশ্র হলোনা। একদিকে তীব্র কষ্ট অপরদিকে সেই কষ্টকে অতিক্রম করার আপ্রাণ প্রয়াসে আমার বুকের ভেতরে যেন ঝড়ের তোলপাড় সুরু হোল। এরকম মুহূর্ত আসবে জেনে লাগসই জবাবের খসড়া তৈরি করেছিলাম অনেকদিন। কিন্তু সেই চরম মুহূর্তের মোকাবিলায় সাজানো জবাব এলোমেলো বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। নিজের ভাঙ্গা গলা নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকল।

—বিশ্বাস করো মা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। তবু সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। আমি জানি তোমরা কষ্ট পাবে। মেনে নেবেনা। তাই কতভাবে চেষ্টা করেছি ঠেকাবার। বিয়েতে আমার মত ছিল না। তবু মিশেলকে এড়াবার জন্য মেনে নিয়েছিলাম সেটাও। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন অন্যরকম ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। এটা অদৃষ্টের লিখন মা। সেটা ভেবেই মেনে নাও না কেন!

—অদৃষ্ট তো নিশ্চয়ই। তা নাহলে দু দুটো মেয়েই এমন শত্রুতা করে? কিন্তু শোন্ মীনা। এখনও সময় আছে। আমার কথা ছেড়ে দে। এ বাড়িতে আমার কতটুকুই বা দাম? কিন্তু বাবু কিছুতেই মেনে নেবেননা। উনি আমাকে বলছিলেন তোকে বোঝাতে। বলছিলেন যা হবার হয়েছে। এখন ওকে ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করতে বলো। তোর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আবার সেই পুরনো সম্বন্ধটার জন্য চেষ্টা করবেন বলেছেন।

—এখন আর তা সম্ভব নয় মা। তোমাকে সত্যি কথা বলছি। সম্প্রতি ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে।

—অনেক দূর এগিয়েছে মানে? তুই যে বললি রেজেস্ট্রি হয়নি?

আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করেন মা।

—তা হয়নি ঠিকই। কিন্তু তোমাকে বলতে লজ্জা করলেও বলতে হচ্ছে

যে এখন আর ঠিক ছেলেখেলা করা যায় না। তুমি বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলো।

—কি সুন্দর! বাবা বলছেন মেয়েকে বুঝিয়ে বলো। মেয়ে বলছেন বাবাকে বুঝিয়ে বলো। কিন্তু আমি এখন কি করব বলতে পারিস? বাবু তো সব শুনলে আমাকে খেতে আসবেন হাঁ করে।

—মা আমি তো জীবনে কোনদিন তোমাদের অবাধ্য হইনি। কোনদিন কোন অন্যায় আবদার করিনি। এই প্রথম তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি। আমাকে মত না দেও। অন্ততঃ বাধা দিও না।

হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে চরম আকুলতা প্রকাশ করে ফেলি আমি।

—মিশেলকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবনা মা। মরে যাব। তোমরা দয়া করো।

মা কিন্তু নরম হলেন না। তীব্র ভৎসর্নার চোখে তাকিয়ে ছিছি করে উঠলেন।

—লাজ লজ্জা সব গেছে! বুড়ো বয়সে এসব নাটুকেপনা করতে লজ্জা করছেনা তোর? ভাগ্য করে এসেছিল বটে দিদি! তোদের মত মেয়ে পেটে ধরতে হয়নি। খোকন কোন বেজাতের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তা তোর জ্যাঠামশায়ের দাবড়ানি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা। ও ছেলে হয়ে বাপের কথা শুনল। আর তোরা মেয়ে হয়েও এমন স্বাধীনচেতা হলি? তোদের জ্যাঠামশাই আজ বেঁচে থাকলে কি হোত তাই ভাবি!

—কি আবার হোত? কেন দিদি যখন শঙ্করদাকে বিয়ে করল তখন জ্যাঠামশাই বেঁচে ছিলেন না?

হঠাৎ রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার মায়ের কথা শুনে। একটু আগের মিনতির ভঙ্গী ত্যাগ করে তাই শক্ত হয়ে উঠি। মাও একটু অবাক হয়ে যান আমার ভাব পরিবর্তন দেখে। আগের কাঠিন্য বর্জন করে তিনিও অন্য সুরে কথা বলেন।

—তোর দিদি তবু নিজের দেশের ছেলেকে বিয়ে করেছিল। তোর মত সবদিক দিয়ে একেবারে মিলছাড়া কাউকে বিয়ে করেনি!

আমাকে আর দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন মা ঘর থেকে। মা বলতে এসেছিলেন একান্নবর্তী পরিবারের আসন্ন ভাঙ্গনের কথা। কিন্তু হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে এসে সেই সমস্যার কথা বেমালুম

ভুলে গেলেন।

মা চলে যাওয়ার পর বিচিত্র কারণে হালকা বোধ করতে থাকি। এক হিসাবে এ যেন ভালই হোল। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা একটা গুরুভার বোঝার মত চেপে রয়েছে মনে। আমি যেন আর পারছিলাম না। গোপনতার কষ্ট বড় কম নয়। তার গ্লানি কুরে কুরে খায় মনের স্ফূর্তি, আনন্দ, শান্তি। আজ হোক কাল হোক্ বাড়িতে বলতেই হোত। নিজের থেকে কথাটা তুলে ভালই করেছেন মা।

সম্প্রতি মিশেল একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আমার অসুবিধা বুঝেও অসন্তুষ্ট হয় ও। মাঝে মাঝে সন্দেহ প্রকাশ করে আমার শরীরে রক্তস্রোত ঠিকমত প্রবাহিত হচ্ছে কিনা?

আমি মজা করে হাতটা বাড়িয়ে দিই।

—দেখ পরীক্ষা করে দেখ।

ও আরও বেশি দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। আমার হাত ধরেনা। পরিবর্তে আমার বুকের ওপর ওর উষ্ণ হাতের আলতো স্পর্শ পাই।

—দেখতে ইচ্ছা করে কি আছে এখানে? ঠাণ্ডা বরফ না উষ্ণ রক্তস্রোত?

সেই স্পর্শে শিউরে ওঠে আমার শরীর। মনে হয় হৃৎপিণ্ড চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে—গমকে গমকে ঝলকে পড়বে তরল উষ্ণ রক্তস্রোত। মিশেলের সংশয় মিথ্যা প্রমাণিত করে।

ভীষণ ভয়ে উত্তেজনায় কাঠের পুতুলের মত আমাকে বসে থাকতে দেখে হেসে হাত সরিয়ে নেয় ও।

—মাপ চাইছি মাদমোয়াজেল।

মুখের ওপরে ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিষন্নতা। তার কষ্ট দেখে আমার ইচ্ছা করে মুক্ত বাতাসের মত স্বচ্ছন্দ প্রশ্রয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাই। গাড়িতে তার পাশে ভদ্র দূরত্ব নিয়ে বসেও মনে মনে আমি তাকে অবাধ প্রশ্রয় দিই। আমার শরীরে তার রাজকীয় অভিষেকপর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

আর কিছুই ঘটেনা। তবু আউটরাম ঘাটের কাছে মোটরবিহারের শেষে যখন সেইসব যন্ত্রণাবিজরিত বাসনাবিধুর মুহূর্তের স্মৃতি নিয়ে ঘরে ফিরে আসি তখন আমার সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় যেন। আমার শরীর মন আর্তনাদ করতে থাকে। মধ্যবিত্ত সংস্কার পুরনো জঞ্জালের মত বাতিল করে দিতে ইচ্ছা করে। মনের মধ্যে ক্ষেপে ওঠে কালাপাহাড়ের মত বিদ্রোহী

সত্তা। ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো করে দিতে ইচ্ছা করে সংস্কার লোকলজ্জার যত অচলায়তন।

মিশেলের সঙ্গে যত বেশি ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে তত বেশি করে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে এই বিদ্রোহের বীজ। তাসত্ত্বেও মায়ের আফশোষ, ধিক্কারের একটা অপ্রতিহত প্রভাব টের পেলাম নিজের মধ্যে। ভালবাসার সুরভিত গৌরব কোথায় অন্তর্হিত হলো। পরিবর্তে মনের মধ্যে স্থান করে নিল সীমাহীন গ্লানি আর আশঙ্কা।

ব্যাপারটা ছেড়ে দেবেনা কেউ আমার ওপরে। অনেক জল ঘোলা হবে তা নিয়ে। দিদির ক্ষেত্রে নির্যাতনের প্রকৃতি যা ছিল আমার ক্ষেত্রে তা অপরিবর্তিত থাকবেনা। জ্যাঠামশাই নেই। তাছাড়া প্রথম ধাক্কার প্রতিক্রিয়ার চেয়ে পরবর্তী ধাক্কার প্রতিক্রিয়া তুলনায় কম প্রবল হবে। কিন্তু আমাকে অব্যাহতি দেবেনা তা বলে কেউ।

মায়ের কাছে থেকে সব কিছু শোনবার পর বাবার মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছবে তা অনুমান করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবার কথা নয়। জ্যাঠাইমা কিংবা বড়দা বা দাদার তরফ থেকেও কোন বিরোধিতা আসবে না বলে চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র।

হঠাৎ নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হতে থাকে। মনে হয় এই বিশাল বিশ্বে আমি বড় নিঃসঙ্গ, বড় একা। সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। স্বর্গতুল্য যে সুখের পৃথিবী সৃষ্টি করতে চলেছি আমি আর মিশেল তাকে প্রতিহত করতে চাইছে সকলে মিলে সংঘবদ্ধভাবে। দুঃখ, গ্লানি আর আশঙ্কার নরকে নিক্ষেপ করতে চাইছে আমাদের।

আমি বুঝলাম যে ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা ভয়ঙ্কর বজ্রপাত সহযোগে আকাশ বিদীর্ণ করে ফেটে পড়বে শিগ্‌গিরই। কিন্তু বাস্তবতঃ তা হলোনা। বাড়ির পরিবেশ হঠাৎ যেন ভীষণ ঠাণ্ডা থমথমে হয়ে গেল। তা দেখে আমি কিন্তু স্বস্তি বোধ করতে পারলাম না। বরং ভয়ঙ্কর কুট গভীর কোন ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করতে লাগলাম। অথচ আমাকে কেউ কোন প্রশ্ন করলনা। কিংবা কোন জবাবদিহি দিতে হোলনা তর্জন গর্জনের প্রত্যুত্তরে।

সেই অবস্থা যেন আরও অসহনীয় হয়ে উঠল আমার কাছে। গুমোট আবহাওয়ার তুলনায় স্বাভাবিক সরল ঝড় বৃষ্টি অনেক বেশি সহনীয়। বাবা

দাদারা তো বটেই এমন কি জ্যাঠাইমা বা মা পর্যন্ত পারতপক্ষে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। জাতিচ্যুত একঘরের মত দেখতে লাগল সকলে আমাকে।

গড়িয়ায় বড়দার জমি কেনার ঘটনা এবং অতিশীঘ্র জ্যাঠাইমাদের বাসা-বদলের সম্ভাবনা পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে গেল। খেতে বসে মা আর জ্যাঠাইমার টুকরো টাকরা আলোচনা থেকে বুঝতে পারতাম যে বাড়ি তৈরি সুরু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাবা গিয়েও তদারক করে আসছেন। আসন্ন বিচ্ছেদের কষ্টে জ্যাঠাইমা বা মা দুজনকেই কিছুটা ম্রিয়মান দেখতাম। কিন্তু আমার সঙ্গে সে ব্যাপারে আলোচনা করতে দেখতাম তাদের প্রবল অনিচ্ছা।

এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি আগে। সংসারের ঘটনাস্রোতে যে যার মত পাড়ি দিচ্ছে। অসহায়ের মত অপেক্ষা করে আছি আমি। তীরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছি অবিশ্রাম খেয়া পারাপার। কিন্তু খেয়া নৌকায় স্থান হচ্ছেনা আমার।

একটা জিনিষ বুঝে উঠতে পারতামনা। এই ঔদাসীন্য আর অবহেলা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত? আপাতদৃষ্টিতে আমার প্রাত্যহিক রুটিনে কোন হেরফের ঘটেনি। আমার গৃহকর্ম, চাকরি, ক্লাস করা সব যথানিয়মে চলছিল। কিন্তু বাড়িতে আমার অবস্থা একেবারে একঘরের মত হয়ে উঠল।

আর কোন সমাধান খুঁজে না পেয়ে আমি মিশেলের সঙ্গে দেখাশোনা বন্ধ করে দিলাম। আগে লাইব্রেরিতে মিশেলের সঙ্গে দেখা হলে ঠিক করতাম কোথায় বেড়াতে যাব ইত্যাদি ইত্যাদি। শনি রবিবার কিংবা ছুটির দিন মিশেলের গাড়ি করে চলে যেতাম আউটরাম ঘাট, বোটানিকাল গার্ডেন কিংবা অন্য কোন নিরিবিলি জায়গায়।

মন জানাজানির পর্ব শেষ হতে সুরু হয়েছিল এই একত্রবিহার। দু' একবার মিশেলের ইচ্ছামত ট্রেনে করে শ্রীরামপুর বা সোদপুরের মত জায়গায় গিয়েও ঘুরে এসেছি। দুজনের মিলিত ভ্রমণের অনেক সুখকর স্মৃতি জমা হয়ে আছে অভিজ্ঞতায়।

পারিবারিক আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে এলে দেখাসাক্ষাতের তাগিদ কেমন হোঁচট খেয়ে গেল। অনেক আগে যেমন করে সন্তর্পণে তাকে এড়িয়ে চলতাম ঠিক তেমন করে সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতে থাকলাম। পর পর বেশ কয়েকদিন এই লুকোচুরি খেলার পর ধরা পড়ে গেলাম মিশেলের কাছে।

সেদিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এসে দেখি নীচে দাঁড়িয়ে মিশেল। ওকে দেখে একই সঙ্গে ভয় আর আনন্দ হাত ধরাধরি করে লাফাতে লাগল আমার বুকে। ও যে আমার জন্য অপেক্ষা করছে তা বুঝতে দেরি হলো না। অন্য দিনের মত আমাকে দেখে সস্মিত আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল না ওর মুখ।

তীব্র এক ভ্রূকুটি ওর মুখে প্রকট হয়ে উঠতে দেখে ভীষণ কষ্টে দুমড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল আমার হৃদয়, মন, আত্মা। স্বভাবগম্ভীর মিশেলের মুখে বাড়তি গাম্ভীর্যের সেই ভয়াল ভীষণ কঠিন সৌন্দর্য লক্ষ্য করে অভূতপূর্ব ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল মনে। কয়েকদিন ধরে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছি আমি। সেটা তার বুঝতে না পারার কথা নয়। হয়ত কৈফিয়ৎ চাইবে ও। কিন্তু কি জবাব দেব তার? আমার নিজের কাছেই কি খুব স্পষ্ট সেটা?

আর যদি আমার পারিবারিক পরিবেশ কিংবা সেই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মানসিক অবস্থার কথা খোলসা করে বলি ওকে তাহলেও কি ঠিক বুঝতে চাইবে ও? ওকি আমার এই প্রতিক্রিয়া দেখে ধিক্কার দিয়ে বলবে না যে এতদিন পর আবার এইসব প্রতিক্রিয়া যার হতে পারে তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ হতে পারে? আমাকে অন্তঃসারশূন্য, ঠুনকো ভাববেনা?

এক মুহূর্ত আমার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে কি খুঁজল সে। আমার অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ। সে কি বুঝল কে জানে? অস্বাভাবিক গম্ভীর থমথমে গলায় প্রায় হুকুমের সুরে শুরু করে তার কথা।

—মীনাক্ষি। তোমার সঙ্গে খুব দরকারী কথা আছে। আজ দেরি হয়ে যাবে। কাল ন্যাশনাল লাইব্রেরির ক্যান্টিনের সামনে ৫টার সময় আমার জন্য অপেক্ষা করো।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা মিশেল জেনেছিল আমার কাছেই। জায়গাটা আমার পছন্দসই। দু'চারদিন সেখানে দেখা করেছি আমরা এর আগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় এখানে আমরা অনেকে এসে জমায়েত হয়েছি। পড়াশোনা শেষ করে ক্যান্টিনে বসেছি। পরে মাঠে বসে গালগল্পও চালিয়েছি কিছুক্ষণ।

মিশেলের সঙ্গে আলাপের পর আমিই তাকে বলে এখানে আনিয়েছি। ওরও পছন্দ হয়েছে। ও বলেছে—তোমাদের দেশে প্রেম করার বড়

অসুবিধা। যেখানেই যাবে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে সকলে। আজকের দিনেও ছেলেমেয়েকে পাশাপাশি বসে গল্প করতে দেখলে সহজভাবে নিতে পারেনা সেটা অনেকেই। এখানে পরিবেশ অনেক অন্যরকম।

আমার মনে আছে রসিকতা করে জবাব দিয়েছিলাম আমি।

—আসলে একজন সুন্দর চেহারার সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়েকে দেখেই অবাক হয়ে যায় অনেকে। তারপর আবার আমার মত বয়সের একজন বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে!

মিশেল হাসেনি। গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছে।

—বয়স নিয়ে তোমার এই মানসিক জটিলতা আর গেলনা মীনাক্‌শি। আমার ভয় হয় ভবিষ্যতে এটা নিয়ে অনেক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা না দেখা দেয় তোমার। তুমি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্যা তৈরি করতে চাইছ। এটা কিন্তু কোনমতেই সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়।

মিশেলকে বড় ভয় আমার। এই দুই তিন বছরে যাদুকরের মত কুহক-কাঠি ছুঁইয়ে আমাকে রূপান্তরিত করেছে। আমার মধ্যে যে ভীরু, অজ্ঞ কিশোরীটি অধিষ্ঠান করছিল মিশেলের যাদুকাঠির ছোঁয়ায় সে ঘুম ভেঙে নতুন চোখে দেখছে পৃথিবীকে। নতুন ক্ষুধা, নতুন বাসনার এক বিচিত্র মোহময় পৃথিবীতে বিচরণ করতে সুরু করেছে।

তার সান্নিধ্যে অস্থির হয়ে ওঠে আমার শরীর। তার স্পর্শে আমার শরীরে সঙ্গীতের ঝঙ্কার ওঠে, নৃত্যের ছন্দ-গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। আমি বড় অসহায় হয়ে পড়ি। পাকে পাকে বেঁধে ফেলে সে নিপুণ ইন্দ্রজালের মায়ায়। কালের মন্দিরা হয়ে বাজতে থাকে আমার অস্তিত্ব, আমার হিতাহিতবোধ, আমার ইহকাল পরকাল তার হাতে।

অথচ নাড়িতে নাড়িতে বাঁধন যে পরিবারে সেখানে পরদেশীর মত আর থাকতে পারছি না। সকলের চোখে মুখে দেখতে পাচ্ছি নীরব ভর্ৎসনা। আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে তারা।

বড় বিপজ্জনক মিশেল। বড় সর্বনাশা খেলায় মেতেছে সে আমাকে নিয়ে। আমার বাড়িঘর দেশ থেকে বিচ্যুত করে ছিন্নমূল করে দিচ্ছে আমায়।

আমি সাহস সঞ্চয় করে মিশেলের চোখে চোখ রাখি।

—মিশেল আমাকে দয়া করো! আমি বড় কষ্টে আছি। তুমি সব

কিছু জাননা। জানলে আমাকে এভাবে দেখা করতে বলতে না।

তুমুল ঝড়বৃষ্টির শেষে যেমন করে প্রশান্ত হয়ে ওঠে পৃথিবী ঠিক তেমন করেই একটু আগের ভ্রূকুটি, কাঠিন্য, গাম্ভীর্য কোথায় অন্তর্হিত হলো। দীর্ঘ বেতের মত শরীর একটু নুইয়ে আমার দিকে তাকিয়ে অসম্ভব নরম গলায় মিনতি পেশ করে সে।

—আমি সব ঠিক করে দেব মীনাক্‌শি! শুধু তোমার সমস্যাগুলোর কথা মন খুলে বলো আমার কাছে। আমাকে এড়িয়ে যেওনা এভাবে।

আমি জবাব দিতে গিয়ে দেখি সেই অবসরে নেমে এসেছে বিদিশা ওপর থেকে। কয়েকদিন ধরে কাজের অছিলায় ওকেও এড়িয়ে যাচ্ছিলাম আমি। একটু দূরে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে ও স্থির হয়ে।

আমি সতর্ক হলাম। মিশেলকে দ্বিতীয় কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মৃদুস্বরে ওর প্রস্তাব মেনে নিলাম।

—ঠিক আছে। আসব।

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি। স্বপ্ন অধরাই থাকে। জেগে উঠে তাকে পেতে চাইলে সেটা নির্বুদ্ধিতাই হয়। মিশেলকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেব যে আমার পক্ষে সব কিছু অগ্রাহ্য করে নতুন জীবনের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। সে যেন ক্ষমা করে আমায়।

মনে আছে এই সিদ্ধান্ত নিতে চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছিল আমার। বুকভাঙ্গা যন্ত্রণা নিয়ে অনেক কষ্টে ঘুমিয়েছিলাম সেদিন। আশ্চর্য! স্বপ্নে হানা দিয়েছিল মিশেল। আমি দেখেছিলাম তার বুকে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছি আমি। বারবার এক কথা আওড়ে যাচ্ছি 'আমাকে ক্ষমা করো মিশেল। আমি পারব না, আমি পারব না।'

সস্নেহে চুমু খেয়ে মিশেল আমায় বলল—'অস্থির হয়োনা মীনাক্‌শি। ভয় কি? আমি সব ঠিক করে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল আমার। মিশেলের চুম্বন আর তার শরীরের নিবিড় সান্নিধ্যের মোহময় স্মৃতি কিন্তু চলে যায়নি সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিন একটি অদ্ভুত কথা মনে হয়েছিল আমার। নিদ্রার জগতের সঙ্গে আমাদের এই জাগ্রত চেতনার জগতের ব্যবধান হয়ত খুব বেশি নয়। সূক্ষ্ম আবরণের অন্তরালে বিরাজ করছে সেই পরোক্ষ জগত। আমরা সকলেই সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে হাসিকান্নার সেই কল্পজগতে কিছুটা সময় কাটাই

আমার মনে হয়েছিল আমাদের এই অতি প্রত্যক্ষ জগতের মত আরও কত অসংখ্য সূক্ষ্ম জগত রয়েছে। শুধুমাত্র সেই সব জগতের তথ্য অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে বলে আমাদের এই দৃশ্য জগতের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র খুঁজে পাইনা। আর সেজন্যই তাদের নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়না আমাদের।

আগে আমি চেতনায় বিভিন্ন স্তরে এমনভাবে অবগাহন করিনি। জীবনের সত্য চেতনার সাথে নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আমার জীবনে মিশেলের আবির্ভাবের পর চেতনার সিংহদরজা যেন খুলে গিয়েছিল। এক অপরূপ প্রাসাদে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পেয়েছিলাম। রুদ্ধশ্বাস বিস্ময় নিয়ে সেই প্রাসাদের সাজানো ঐশ্বর্য ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছি।

তবু মর্মান্তিক প্রয়াসে শক্ত করে বুক বেঁধে উপস্থিত হয়েছিলাম আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাঠে। পুজো থেকে একটি আগে ছুটি নিয়ে। ওকে দেখে আমার মনে হোল চির দিনের বিচ্ছেদ হবে বলেই বোধহয় অত আপনজনীয় লাগছে ওকে। আমাকে দেখে অল্প হেসে অভ্যর্থনা করেছিল মিশেল।

—এসো মনোকুশি। আর আমি একটা পেঁচি অধীর হয়ে অনেক আগেই এসে পৌঁছেছি। এ ক্ষণ কি করছিলাম জান? ভাবছিলাম যদি তুমি না আস? তাই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে দেখছিলাম তোমাকে টেনে নিয়ে আসতে পারি কিনা এখানে।

কথাটা এমনভাবে বলল মিশেল যে হাসবনা ভেবেও হাসি চাপতে পারলামনা। আমার হাসি দেখে আশ্বস্ত হলো যেন সে। আমার একটু কাছে সরে আসল।

—এটা যদি ফ্রান্স হতো আমি তোমাকে অত দূরে বসে থাকতে দিতাম না। বলতাম আর কত সময় নষ্ট করব আমরা কথা চালাচালি করে? তোমাকে টেনে নিতাম আমার কাছে। বলতাম আমার বুকের যন্ত্রণা টের পাবে কি করে অত দূরে বসে? বলতাম এস দুজনে দুজনের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনে দুজনের দুঃখের চেহারাটা ভাল করে বুঝি।

আমার চোখে জল এসে গেল তার কথা শুনে। বিদিশা বলে ফরাসীরা লঘু, চপল ধরনের। কিন্তু মিশেল যখন আমাকে এ ধরনের কথা বলে তখন আমার ইচ্ছা হয় ও এখানে উপস্থিত থাকুক। মিশেলের কথা শুনুক।

—তুমি আমাকে এত দুর্বল করোনা মিশেল। আমি বড় কষ্টে আছি। আমার কষ্ট আর বাড়িওনা।

—আমি তোমার কষ্ট কমাতে চাইছি মীনাক্ষি। আমি তোমার কষ্ট বুঝি। আমিও তো কষ্টে আছি। সেইজন্যই তো চাইছি একজন আরেক-জনের বেদনা লাঘব করি। মীনাক্ষি তোমাকে আমার অনেক কথা বলা হয়নি। আমার ছোটবেলাটা কি কষ্টে কেটেছে কল্পনা করতে পারবে না। পাঁচ বছর বয়সে আমার বাবা মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপরেই মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে একেবারে। বাবার হেফাজতে খুব নিরানন্দে কেটেছে আমার মাতৃস্নেহবঞ্চিত শৈশবকাল। বাবা সাধ্যমত কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে শুধু নীরস কর্তব্যপালন। আমার সহপাঠীদের মধ্যেও কারুর কারুর এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে দেখেছি বাবা-মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পরও বাবা কিংবা মায়ের সঙ্গে সন্তানের যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়নি। আমার ক্ষেত্রে কেন অন্য-রকম হয়েছে তা আজও জানিনা। ছোটবেলায় বাবাকে প্রশ্ন করলে বিরক্ত হতেন তিনি। পরে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলোচনা করিনি আমি বাবার সঙ্গে।

—কিন্তু পরে বড় হয়ে তুমি মায়ের খোঁজ নিতে পারতে!

—কি লাভ? পরে আমার মনে হয়েছে মায়ের যদি সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠা না থাকে তাহলে সন্তানেরই বা মায়ের জন্য খামকা দুশ্চিন্তা থাকবে কেন? আমার ছোটবেলার অনেক দুঃখজনক স্মৃতি আছে। পরে তোমাকে সেসব বলব। আজ সংক্ষেপে অন্য দু' একটা ঘটনার কথা বলব। আমার জীবনে সেগুলির ভূমিকাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তোমাকে এর আগে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম বোধ হয় প্রেমের ব্যাপারে আমি ভাগ্যবান নই। তোমার আগে তিনটি মেয়েকে ভাল বেসেছিলাম আমি। আমার যখন উনিশ বছর বয়স তখন পনের বছরের একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। আমার প্রতিবেশী ছিল সে। সেও আমায় ভালবাসত। আমরা ঠিক করেছিলাম বিয়ে করব। কিন্তু দুর্ঘটনায় মারা যায় সে। খুব কষ্ট পেয়ে-ছিলাম তখন। মনে হয়েছিল আমি কেন, কার জন্য বাঁচব? চব্বিশ বছর বয়সের সময় আরেকটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। আমার চেয়ে বছর খানিকের বড় ছিল সে। একটা স্কুলে পড়াত। তার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা

হয়েছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য মৃত্যু তাকেও ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার কাছে থেকে। তারপর আমার যখন সাতাশ বছর বয়স তখন আমি আমার এক বিবাহিতা কাজিনের প্রেমে পড়েছিলাম। আমার থেকে কয়েক বছরের বড় ছিল সে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল চলছিল না। মুখ ফুটে তাকে আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করিনি। মনে মনে ভেবেছিলাম ডিভোর্স হয়ে গেলেই বিয়ে করব তাকে। কিছুদিন পরে ডিভোর্সও হয়ে গেল। কিন্তু সে অন্য একজনকে বিয়ে করল। আমি সেই ভদ্রলোককে চিনতাম। কিন্তু অনুমান করতে পারিনি তার সঙ্গে ওর কোন ব্যাপার চলছিল। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে। পরে অবশ্য সবকিছু বিশ্লেষণ করে বুঝেছি দোষ ছিল আমারই। আমিই বেশি আশা করেছিলাম। অপর পক্ষ কতটা আগ্রহী তা ভাল করে মেপে দেখিনি।

নির্বাক হয়ে শুনছিলাম মিশেলের কথা। বিকেলের আলো একটু একটু করে মরে আসছিল। অন্ধকারের হালকা একটা ছায়া এসে গ্রাস করে নিচ্ছিল লাইব্রেরি প্রাঙ্গন, গাছপালা, ইতস্ততঃ চলমান লোকজন, তার সঙ্গে মিশেলকেও।

অনেকদিন মিশেলের সঙ্গে কথা বলেছি। তার সঙ্গে বেরিয়েছি। ব্যক্তিগত কথা অনেক বলেছি। কিন্তু তার পারিবারিক বা মানস জগতের দুঃখজনক অধ্যায়টির এমনভাবে দ্বারোদ্ঘাটন হয়নি। সে যে সুখী মানুষ নয় তা আমি তাকে দেখে প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে টুকরা টাকরা মন্তব্যের ভিত্তিতেও আমার সে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু খোলাখুলি এভাবে মেলে ধরেনি তার অতীত জীবন।

তার বুকের মধ্যে ঘন হয়ে আছে যে অন্ধকার তা ঢুকে পড়তে চাইছিল আমার বুকের মধ্যে। আমি তাকে যে কথা বলতে এসেছিলাম তা কি ভাবে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। যে এত দুঃখ পেয়েছে জীবনে তাকে বাড়তি দুঃখ দিয়ে সেই দুঃখের বোঝা কিভাবে ততোধিক গুরুভার করে তুলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এক মুহূর্তের জন্য মনে হোল যে কথা তাকে বলতে এসেছি তা কিছুতেই বলা যাবে না আজ। তার ক্ষতস্থানে নতুন করে ক্ষত সৃষ্টি করার সামিল হবে সেটা।

আমি একটিও কথা বলতে পারলাম না। শুধু দূরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে অদৃষ্টের প্রহসনের কথা ভাবতে লাগলাম। আমার ভাগ্যনিয়ন্তা

আমাকে নিয়ে কি দারুণ পরিহাসে লিপ্ত হয়েছে। এই মুহূর্তে যদিও বা তাকে বলি যে আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ হোক্ তাহলেও তার কারণ হিসাবে যে কথা বলব তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবেনা তার কাছে। হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে মিশেলই প্রথম সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গে।

—কিছুদিন থেকে তোমার আচরণ দেখেও ভয় পাচ্ছি আমি। দেখছি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। হয়ত কোনরকম অসুবিধার মধ্যে আছ। কিন্তু আমাকে তো বলবে সেটা? আমাদের পরিচয় যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে তোমার পক্ষে কোনরকম সংকোচ আর আশঙ্কার কোন মানে হয় না। আমি কিছুদিন থেকে সমানে চেষ্টা করছি তোমার সঙ্গে দেখা করার। কিন্তু পারছি না। কাল হঠাৎ খেয়াল হলো ওপর থেকে নীচে নেমে আসতেই হবে তোমাকে। কাল যদি দাঁড়িয়ে না থাকতাম তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হোতো না আজ এভাবে!

—ভালই হয়েছে মিশেল। আমি নিজেও বুঝেছিলাম শিগগিরই তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

—তাহলে এগিয়ে যাচ্ছিলে কেন?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মিশেল।

—দুটোই সত্যি মিশেল। তোমার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন বুঝেছিলাম। অথচ সাহস সঞ্চয় করতে পারছিলাম না। সেজন্যই এড়িয়ে চলতে হচ্ছিল।

—আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সাহস সঞ্চয় করতে হয় তোমায়—এ কেমন সব কথা বলছ মীনাক্‌শি?

—আমি জানি মিশেল তুমি অসঙ্গতি পাবে আমার কথার মধ্যে। তুমি তো সব কিছু জাননা। কিন্তু যদি সব কিছু তোমাকে বলি তাহলে বুঝতে পারবে যে এতটুকু অসঙ্গতি নেই আমার কথার মধ্যে। দুটোই সমান সত্য।

—সে যাই হোক্। ওসবে আমার দরকার নেই। শুধু তোমার কাছে একটাই অনুরোধ। আমাকে আবার যেন কষ্ট পেতে না হয় তোমার কাছে।

—মিশেল সাহসের কথা তুলেছিলাম কেন জান? তোমাকে আমি এমন কিছু বলতে এসেছি যা হয়ত খুবই খারাপ লাগবে তোমার কাছে। অথচ এমন একটা পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়েছি আজ যে সব কিছু আর এড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। এখনও যদি মোকাবিলা না করি তাহলে বড়

দেরি হয়ে যাবে।

হঠাৎ যেন বুঝতে পারল মিশেল। ত্রস্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ত্রাসকম্পিত স্বরে প্রশ্ন করে সে।

—তুমি কি সম্পর্কে ছেদ টানতে চাইছ মীনাক্ষি?

বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের মত, হৃদয়মথিত হাহাকারের মত শোনায় তার সেই প্রশ্ন। এক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে দেখি তাকে। ছাই রঙের স্যুটে অপূর্ব রূপবান দেখাচ্ছে আজ মিশেলকে। কোমল বেদনার গাম্ভীর্যের ছোঁয়ায় পরম রমণীয় তার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বজ্রাহতের মত সেদিনও মনে হোল আমার সমস্ত স্বপ্ন আর কল্পনা মথিত করে তৈরি হয়েছে সেই নব-সুষমা।

প্রথম দর্শনের সেই অভিভূত বিস্ময় এখনও মন ছেড়ে যেতে চায়নি আমায়। খালি মনে হয় বহু ভাগ্যে যে স্বপ্ন আমার জীবনের সঙ্গে মিলেজুলে থাকতে চাইছে—তাকেই যেন অজানা ভয়ে কোন ছলনায় তাকে বিতাড়িত করতে চাইছি। নিজেকে সংযত করে উত্তর দিতে চেষ্টা করি আমি।

—একবার যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা মিথ্যা হয়ে যায় না। তুমি এমন ভাবে জড়িয়ে গেছ আমার জীবনে যে তোমাকে অস্বীকার করি কি করে বল? কিন্তু আমার বাড়িতে খুব অশান্তি চলছে মিশেল। তারা কিছুতেই আমাদের মিলিত হতে দেবে না। তোমাকে সত্যি কথাই বলছি। আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করছে বাড়ির লোকেরা। আমার সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে তারা। আমি সহ্য করতে পারছি না মিশেল।

গম্ভীর হয়ে আমার কথা শোনে সে। পরে অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে আমায়।

—কিন্তু এসব তো তোমার অজানা নয়। তোমার বাড়ির কথা যতটুকু শুনেছি তাতে এ ঘটনা তো খুব অপ্রত্যাশিত নয়? তোমার বাড়ির কথা থাক মীনাক্ষি। তুমি কি করতে চাইছ সেটাই বলো।

—আমার বাড়িকে আমি অস্বীকার করতে পারছিনা মিশেল। আমার জন্মকর্ম সব কিছু তো সেখানেই। দীর্ঘদিন ধরে আমি যাদের সঙ্গে আছি তাদের মতামত অগ্রাহ্য করে নিজের সুখটা বড় করে দেখতে খারাপ লাগছে। আর আমার···আমার কেমন যেন ভয় করছে।

—আমার খুব আশ্চর্য লাগছে মীনাক্ষি। এতদিন পরে এসব কথা

আসছে কেন? তুমি তো সবই জানতে। তোমার দিদির কথাও তুমি বলেছ। তোমার ক্ষেত্রেও অন্যরকম কিছু হবেনা জানতে তুমি। তাসত্ত্বেও আমরা অনেক দূর এগিয়েছি! এখন তুমি কি সরে আসতে চাইছ?

—আমার বড় দুর্ভাগ্য মিশেল। তোমরা কেউ আমার কষ্ট বুঝছনা। আমার বাড়ির লোকের চোক্ষে আমি লজ্জাহীন, আত্মসুখপরায়ণ কুলাঙ্গার। তুমিও ভাবছ আমি চতুর, সুবিধাবাদী। তোমাকে নাচিয়ে এখন অসুবিধা দেখে সরে আসছি।

—না মীনাক্ষি না। আমি তা ভাবছিনা। তাহলে যে নিজেকেই অশ্রদ্ধা করতে হয় আমার। তুমি যদি তেমন স্বভাবের হতে তাহলে কি তোমার জন্য এত ছটফট করতাম? আমি তো কতজনকে দেখেছি আলিয়ঁসে। তবু তোমাকে তাদের থেকে আলাদা লাগল তো?

এবার সত্যি সত্যি ভেঙ্গে পড়ি আমি।

—দোহাই তোমার মিশেল। আমাকে এত স্তুতি করোনা। এসব শুনে আমার বুকের কষ্টটা আরও বাড়ে। মনে হয় তুমি যেন বাধনটা আরও শক্ত করে দিচ্ছ। তুমি আমাকে শক্তি দাও। এমন করে দুর্বল করে দিওনা।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মিশেল কিছু না বলে। পরে ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—আমি তোমায় দুর্বল করতে চাইছি না। বরং তোমার দুর্বলতা দূর করতেই চাইছি। তবু তুমি যদি সত্যিই মনে কর বাড়ির মতামত না মেনে আমাকে নির্বাচন করলে অন্যায় হবে তাহলে বলবো সেই অন্যায় করোনা তুমি। আর আমাকেও কোন জবাব দিতে হবে না। মানুষের শেষ জবাব দিতে হয় নিজেকে। নিজের বিবেককে প্রশ্ন করো তুমি যা করতে চাইছ তা ঠিক হচ্ছে কিনা?

হঠাৎ আমার সব হিসাব অন্যরকম হয়ে গেল। আমাদের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জটিল নিয়মে চলে। আমি তার কাছে মুক্তি চাইব বলে এসেছিলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে সে তার ভালবাসার পিঞ্জর থেকে আমাকে মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত হলো খোলা আকাশে সেই মুহূর্তে উড়ে যাবার ইচ্ছা চলে গেল আমার।

মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত অবাধ স্বাধীনতা পেয়েও ডানা উড়িয়ে চলে যেতে পারলাম না। পাখায় যেন টান লাগল! শুধু তাই নয়। মিশেলের

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে জিহোভার বর্জনির্ঘোষ ধ্বনিত হলো যেন আমার কানে। মনে হোলো কত বড় অন্যায় করতে চলেছি। এক দুঃখী অসুখী মানুষকে কাঁদিয়ে খুঁজতে চলেছি আমি নিরাপদ শান্তি? আমার কপালে নেমে আসবেনা অভিশাপের উদ্যত খড়্গ?

আমার সমস্ত শরীর মন কাঁপতে লাগল থরথর করে গভীর উত্তেজনায় অপ্রতিরোধ্য আবেগে। হঠাৎ মিশেলের হাত টেনে নিয়ে দুহাতে চেপে ধরি আমি।

—মিশেল! আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন! এই মুহূর্তে তুমি আমায় নিয়ে চল কোথায়ও।

আস্তে করে হাত সরিয়ে নিয়ে শান্ত ঠাণ্ডা মমতাভরা চোখে তাকায় মিশেল।

—কোথায় যাবে মীনাক্‌শি? তোমার দেরি হয়ে যাবেনা? আবার ঝামেলা বাড়াবে?

অবুঝের মত আকুল হয়ে বলতে থাকি আমি বারবার।

—তা হোক্ আমি কিছু গ্রাহ্য করিনা। তুমি আমায় নিয়ে চল কোথায়। সেখানে খুশি!

—চল তাহলে নিয়ে যাই তোমায় আমার ফ্ল্যাটে। আমি বুঝতে পারছি মীনাক্‌শি! তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি হঠাৎ কিছু করতে যেওনা। ভেবে দেখো! কথা দিচ্ছি যদি তোমাকে না ও পাই অবুঝের মত দোষারোপ করব না।

—আমি ভেবে দেখেছি মিশেল! সব কিছু ভেবে দেখেছি। আর আমি ছাঁইপাশ ভাবতে চাইনা।

সেদিন মিশেল তার গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল আমায় তার কামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। সেই প্রথম স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম আমি। তার বুকে মাথা রেখে অঝোরে কেঁদেছিলাম। আমার অনেক দিনের অনেক দ্বিধা সংশয় দুশ্চিন্তা সব উজাড় করে দিয়েছিলাম সেদিন। দ্বিধাহীনভাবে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে লঘুপক্ষ নির্ভার হয়ে ফিরেছিলাম সেদিন বাড়ি।

সেদিনের কথা মনে করলে নিজেরই খুব আশ্চর্য লাগে। যারা বলে মানুষের জীবন পুরোপুরি তার নিজের হাতে তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি

নিয়ে আমার সংশয় আছে। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য এক অঙ্গুলিহেলনে কত কিছু পালটে যায়। মানুষের চিন্তাভাবনা ইচ্ছা অনিচ্ছা সংকল্প সবকিছু। মুহূর্তের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় মানুষের জীবনে, তার মানসিকতায়। অথচ তার কারণ হিসাবে যে ঘটনা যে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ হয় আমাদের কাছে তা হয়ত নেহাতই উপলক্ষ মাত্র।

কতদিন কত কথা বলেছে মিশেল। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে কি বিস্ফোরণের শক্তি ছিল তার কথায় যে আমার মনে দিধা দুশ্চিন্তার যত পাহাড় ধ্বসে পড়ল তাই ভাবি।

মিশেলের গাড়িতে করে কিংবা ট্রেনে করে কলকাতার কিংবা তার আশেপাশে শহরতলীর অনেক জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু তার কামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে সে অদ্যাবধি অনেক বলে কয়েও নিয়ে যেতে পারেনি আমায়। গোঁ ধরে আপত্তি জানিয়েছি আমি কেবলি।

আমার মনে হোত বাইরে তবু ঘনিষ্ঠতার একটা মাত্রা বজায় থাকে। কিন্তু নির্জন ফ্ল্যাটে সে কেমন আচরণ করবে তা কে জানে? পুরোপুরি নিঃসংশয় যেন ছিলাম না আমি তার সংযম, তার আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। প্রথম প্রথম না বুঝলেও পরে হয়ত সে সেটা বুঝেছিল। তাই আর পীড়াপীড়ি করেনি সে ব্যাপারে।

কিন্তু আমি কি করে সেদিন নির্দ্বিধায় রাজী হয়ে গিয়েছিলাম তাই ভাবি। সেদিন আমিই তাকে জড়িয়ে ধরে তার শরীরের সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম। আমার বুকের ভেতরে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছিল প্রজ্জ্বলিত শূন্যতা। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছটফট করছিলাম আমি। তাকে নিবিড়ভাবে আকড়ে ধরে তার বুকের মধ্যে তৃষ্ণার সরোবর খুঁজেছিলাম সেদিন।

সেদিন যদি সে বেপরোয়া হোত তাহলে তাকে প্রতিহত করতে পারতাম-না আমি। চরম আত্মসমর্পনের এক দুর্বলতা যেন ভর করেছিল আমায়। কিন্তু সে বেপরোয়া হয়নি। আমার অসহায়তা দেখে গভীর মমতা নিয়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়েছে আমার মাথায়, গালে, পিঠে। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে নরম আলতো একটি সপ্রেম চুম্বন দিয়েছে শুধু।

—মা শেরি! ন তাকিয়েত্ পা। তু সোরা বিঁয়া।

॥ চোদ্দ ॥

ঠিক তার পরদিনই বিদিশার অফিসে গিয়ে, হাজির হয়েছিলাম। স্কুল থেকে দু' পিরিয়ড় আগে ছুটি নিয়ে। আমাকে দেখে অবাক ও।

--কি রে ব্যাপার কি? হঠাৎ এখানে আগমন?

—দরকার আছে। তুই একটু আগে বেরিয়ে পড় আজ। ছুটি নিয়ে।

—কিন্তু কি দরকার সেটা বলতে পারবি না?

—সব বলব বিদিশা। কিন্তু এখানে নয়। চল্ কোথায় বসে চা খেতে খেতে বলা যাবে।

আর কিছু না বলে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল বিদিশা। কাছাকাছি একটা রেঁস্তোরায় ঢুকে একটা কেবিন নিয়ে বসেছিলাম আমরা। বেয়ারাকে ডেকে চায়ের সঙ্গে ফিস্ ফ্রাইয়ের ফরমাস দিয়েই সুরু করেছিলাম আমার বক্তব্য।

—বিদিশা! আমি মিশেলকে বিয়ে করছি। তোকে সাক্ষী হিসাবে থাকতে হবে।

—সে কি! হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত?

—হঠাৎ বলছিস কেন? আমাদের ব্যাপারটা তো অনেকদিন ধরেই চলছে।

—তা চলছে। কিন্তু ওকে তুই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবি সেটা আমি ভাবিনি।

—কেন তুই কি ভেবেছিলি ওর সঙ্গে ফ্লার্ট করছি আমি?

—দূর! তা কেন? কিন্তু আমি সত্যিই ভাবিনি যে এরকম একটা খড় সিদ্ধান্ত এত তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলবি। হঠাৎ কি এমন ঘটল যে তড়িঘড়ি করে তুই ওকে বিয়ে করতে চলেছিস? এই সেদিনই তো শুনলাম তোর বাড়িতে খুব অশান্তি চলছে।

—সেজন্যই তো সব অনিশ্চয়তা দূর করতে চাইছি। আমি আর পারছি না বিদিশা। অনেক যুদ্ধ করলাম নিজের সঙ্গে। কিন্তু বুঝতে পারছি মিশেলকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব আমার পক্ষে। এমনভাবে পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে ও যে সেই বাঁধন ছিঁড়তে গেলে আমার সমস্ত অস্তিত্বে টান

লাগছে। সত্যিই আমি এখন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তার কারণ হোলো হঠাৎই আমার সামনে মিশেলহীন জীবনের শূন্যতাটা প্রকট হয়ে গেছে বলে।

—কেমন যেন হেঁয়ালির মত লাগছে সব কিছু আমার কাছে মীনাক্ষী। এখনও বলছি ভেবে দেখ্ ভাল করে।

আর কিছু ভাবব না। সব ভাবনার পালা চুকিয়ে ফেলেছি। শুধু তোর কাছে যেজন্য আসা। তুই সাক্ষী দিচ্ছিস তো?

—আশ্চর্য তুই যদি বিয়ে করতে পারিস আমি সাক্ষী দেব না কেন? কথাটা তা নয়। কিন্তু এতবড় ঝুঁকি নেওয়াটা—

ওকে শেষ করতে দিইনি। মিশেলের কাছে শোনা কথারই পুনরাবৃত্তি করেছি।

—জীবনে বড় কিছু পেতে গেলে ঝুঁকি তো নিতেই হবে বিদিশা। তোদের কাছে অনুরোধ তোরা আর অন্যরকম বোঝাস না আমাকে।

বিদিশার সঙ্গে কথা শেষ করেই চলে এসেছিলাম দিদির বাড়ি। শঙ্করদাও বাড়ি ছিল। আমাকে হঠাৎ দেখে দুজনেই অবাক হয়েছিল। শঙ্করদা হাত বাড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠেছিল—'এসো মীনা। সুস্বাগতম্। কি শুভসংবাদ নিয়ে আগমন আজ?'

—সংবাদটা আপনাদের কাছে শুভ নাও হতে পারে শঙ্করদা। এখন সুস্বাগতম্ বলছেন। শুনলে হয়ত তাড়া করবেন লাঠি নিয়ে!

দিদি কিছু বলছিল না। ত্রস্ত চোখে আমাকে লক্ষ্য করছিল খালি। ওকে দেখে মনে হোল ও হয়ত বা অনুমান করছে। শঙ্করদাও আমাদের ব্যাপারটা জানে। তবে দিদির মত প্রকাশ্যে সেভাবে কোনদিন আপত্তি করেনি। বিদিশার কাছে যত সহজে ঝপ করে বলে ছিলাম দিদিদের কাছে তত সহজে বলতে পারছিলাম না। কেমন একটা সংকোচ আর লজ্জা ঘিরে ধরছিল আমায়। শঙ্করদাই হঠাৎ আমাকে বাঁচিয়ে দিল সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে।

—তাই নাকি? তাহলে নিশ্চয় তুমি সেই সাহেবকে বিয়ে করতে চলেছ। কি ঠিক বলছি না?

দিদি হঠাৎ রেগে ঝাঁঝিয়ে উঠল শঙ্করদার ওপর।

—এইসব অলুক্ষণে কথা নিয়ে রসিকতা করতে বাঁধছে না তোমার?

কট্ করে কানে লাগে আমার দিদির কথাটা। আমার সেই একদা বিদ্রোহী বিপ্লবী দিদি কতখানি রূপান্তরিত হয়েছে তা আজ দিদিকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। দৃষ্টিভঙ্গী তো বটেই! ভাষাও কত পালটে গিয়েছে।

আমি বুঝতে পারছিলাম সূক্ষ্ম একটা রাগ ছড়িয়ে পড়ছে আমার শরীরে। অলুক্ষণে শব্দটা যেন অভিশাপের মত ভয়ঙ্কর কোন সম্ভাবনার কথা বলতে চাইছে। এরকম পরিস্থিতিতে এই শব্দটা দিদি নাও ব্যবহার করতে পারত। আমার হঠাৎ মনে হোল আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে না তো দিদি?

—অলুক্ষণে কেন বলছ দিদি? তুমি নিজেও তো পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে। জাত মানোনি, বাড়ির বাধা মানোনি। একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিলে বাড়ি থেকে। তখন তোমার যে বয়েস ছিল আজ তার থেকে অনেক অনেক বেশি বয়েস আমার। তবু তুমি মেনে নিতে পারছ না। আগেও বলেছি আজও বলছি ভারী আশ্চর্য লাগে যখন দেখি তুমি নিজের কথাটা ভুলে যাও। আগেও তোমার সঙ্গে কথা বলেছি ব্যাপারটা নিয়ে। তুমি মেনে নিতে পারনি মন থেকে। তবু আমি আশা নিয়ে এসেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত তুমি হয়ত বুঝবে। আমাকে সমর্থন করবে। দরকার হলে সাহায্য করবে।

চুপ করে থাকে দিদি। আমি বুঝতে পারি আমার কথায় লেগেছে ওর। শঙ্করদা চেষ্টা করে পরিস্থিতি সামলাতে।

—রাখ তোমার দিদির কথা। ওর যত বয়স বাড়ছে তত কেমন গ্রাম্য আর বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে। তোমার কথা ছেড়ে দাও। আমাকে পর্যন্ত মা-ঠাকুমাদের মত উপদেশ দিতে আসে। ভালমন্দ বোঝাতে আসে!

আমি সব কথা অগ্রাহ্য করে শঙ্করদার দিকে তাকাই।

—দিদির মত নেই বুঝেছি। শঙ্করদা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আমার বিয়েতে আপনি সাক্ষী দেবেন তো?

—নিশ্চয়! কেন দেব না? কিন্তু পাত্রটি কে? তোমার সেই সাহেব তো?

—ঠিক ধরেছেন। আমি ঠিক করে ফেলেছি তাকে বিয়ে করব।

আর চুপ করে থাকতে পারে না দিদি। ওর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ে আশঙ্কা, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা।

—মীনা! আমার ওপর রাগ করিস না। তোর ভালোর জন্যই বলছি। এ তুই ঠিক করছিসনা।

—কেন দিদি? তুমি কি করে বুঝলে আমি ঠিক করছিনা?

—কি করে বুঝলাম জিজ্ঞাসা করছিস? কেন তুই বুঝছিসনা কি করতে চলেছিস তুই?

—তা বুঝব না? বুঝেসুঝেই তো ঠিক করেছি।

—তুই আর কাউকে পেলিনা? সাহেবকেই ধরতে হোল শেষে?

—ছিঃ দিদি! শঙ্করদা ঠিকই বলেছে তুমি খুব গ্রাম্য হয়ে যাচ্ছ। তা না হলে এমন একটা কুৎসিত শব্দ ব্যবহার করতে পারতে না। আমি লেখাপড়া শিখেছি। চাকরি করছি। আমি খুব জলে পড়ে নেই। তুমি ভাল করে জান বাড়িতে আমার বিয়ের জন্য চেষ্টাও চলেছে। বয়স বেশি হয়েছে ঠিকই। তবুও আমায় যে কেউ পছন্দ করেনি তা নয়! অনেক সম্বন্ধ আমি নিজেই অপছন্দ হওয়ায় বাতিল করে দিয়েছি। বাবা-মা মেনেও নিয়েছেন বাধ্য হয়ে। বিয়ের জন্য লালায়িত হলে যেমন তেমন একজন পুরুষমানুষকে বিয়ে করতে পারতাম। কিন্তু জীবনে একজন পুরুষমানুষকে স্বামী হিসাবে পাওয়াটা কোন দুর্লভ পাওয়া বলে মনে করি না আমি। আর এই সাহেবকেও আমি কিন্তু ধরতে যাইনি!

—তুই না ধরিস। ও তোকে ধরেছে এই তো? খুব কিছু তফাৎ হয়না তাতে!

—এটা যে ধরাধরির ব্যাপার নয় তা তোমার অন্ততঃ বোঝা উচিত। তুমি নিজে ভালবাসার কত প্রশস্তি করেছ একদিন। বড়দাকে পর্যন্ত তার জন্য কত কথা শুনিয়েছ। অথচ আজ নিজের ছোট বোনকে তার জন্য চরম অসম্মানের কথা বলতেও বাধছেনা তোমার। অদৃষ্টের প্রহসন একেই বলে।

—আমি যে কাজটা খুব ভাল করিনি তা তো নিজেই স্বীকার করেছি বহুবার। কিন্তু তাবলে আমি বিদেশীকে বিয়ে করতে ছুটি নি!

আমি জবাব দিতে যাচ্ছিলাম। হাত উঠিয়ে আমাকে নিবৃত্ত করে শঙ্করদা।

—এসব কি বলছ তুমি আবোল তাবোল এণা? আমাকে বিয়ে করে তুমি ভুল করেছ এটাই কি বক্তব্য তোমার? আর সাহেব জটল কোথায়

তোমার যে তার পিছনে ছুটবে তুমি ?

একটু অপ্রস্তুত দেখায় দিদিকে।

—আমি তা বলছি না। কিন্তু বাড়ির অমতে বিয়ে করলে তার ফল সত্যিই ভাল হয় না। আমার জীবনেই তো প্রমাণ পেয়েছি আমি হাতে হাতে।

এতক্ষণ যে রাগটা জমছিল তা থিতিয়ে আসে। দিদির কষ্টটা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়। ওর হাতটা চেপে ধরি আমি জোরে।

—তুমি এভাবে ভেবোনা দিদি। বাড়ির কেউ তোমাকে কখনও অভিশাপ দিতে পারে না। তুমিই বলনা তুমি কি আমায় অভিশাপ দিতে পার আমি ইচ্ছামত বিয়ে করছি বলে ? পার না তো ? তাহলে বাবা মা জ্যাঠামশাইরাও তোমাকে কখনও অভিশাপ দিতে পারে না। ওটা তোমার অদৃষ্টলিখন। কেন তুমি দেখনি যে বাড়ি থেকে সম্বন্ধ করে হওয়া বিয়েও কত দুঃখের হয়েছে ? তাহলে ? আর তোমাকে আগে বলিনি। এখন বলছি। আমারও এটাই অদৃষ্টলিখন যে আমার স্বামী ভারতীয় হবে না। বিধি নির্বন্ধ তুমি আমি খণ্ডাব কি করে ?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিস্মৃতির কুয়াশা সরিয়ে আমার সামনে এসেছিল কফি হাউসের সেই বিকেল। অরুণাংশু ঘোষের সেই ভবিষ্যৎবাণী।

দিদি নরম হয়েছিল। একটু কান্নাকাটি করে পরে আমাকে বলেছিল—'আমি তোর ভাল চাই মীনা। তাই তোকে এসব বলেছি। কিন্তু তুই যখন মনস্থির করেই ফেলেছিস তখন তোকে আর বাধা দিতে যাওয়ার মানে হয় না বুঝতে পারছি। তোর শঙ্করদা তো বলেইছে যে সাক্ষী থাকবে। আমি কথা দিচ্ছি বাধা দেব না ওকে।

আমি যখন চলে আসছি তখন রসিকতা করতে ছাড়েনি শঙ্করদা।

—তুমি হয়ত আমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে গেলে মীনা। মনে হচ্ছে এখন হয়ত শ্বশুরালয়ে সমাদর পাব।

আমি বুঝতে পারিনি। বিস্ময় ব্যক্ত করেছি।

—কেন শঙ্করদা ?

—বাঃ বুঝতে পারছ না ? সাহেবের সঙ্গে তুলনায় পাত্র হিসাবে আমাকে অনেক শ্রেয় মনে করবে তোমার বাড়ির লোক। বলা যায়না তোমার

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত আমাকে শঙ্খধ্বনি করে বরণ করে নেবে।

পাল্টা রসিকতা করেছি আমিও।

—ভালই হয় তাহলে। আপনারা যদি একবার ঐ বাড়িতে ছাড়পত্র পান তাহলে আশা করতে পারি ভবিষ্যতে আপনারাও আমাদের জন্য ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে দেবেন।

আর একটি কাজ করেছিলাম সেদিন। বাড়ি ফিরে মাকে বলেছিলাম আমার সিদ্ধান্তের কথা। যথারীতি গালমন্দ, অনুনয়বিনয়, ভীতিপ্রদর্শন কোনটাই বাকি রাখেননি মা। অতঃপর অন্যদের কানেও গিয়েছিল সেই সংবাদ। আমার কানে এসেছিল অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা, বাঁকা কুৎসিৎ কটাক্ষ। কানে এসেছে দাদার কথা।

—এক মেয়েকে দেখেও শিক্ষা হয়নি তোমাদের। এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে না দিলে এরকম তো হবেই।

জ্যাঠাইমা এসে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন।

—ছিঃ ছিঃ মীনা তুই তো এরকম ছিলি না। তোরও শেষে দিদির মত মতিভ্রম হোলো? আর দিদির মতই বা বলছি কেন? সে তো শুধু বেজাতে বিয়ে করেছে। তোর মত সাহেবকে বিয়ে করেনি!

বাবা কি বলেছেন, বড়দা কি বলেছে, স্বকর্ণে শুনিনি। কিন্তু মায়ের কাছে থেকে যতটুকু কানে এসেছে তা আদৌ সম্মানজনক নয়। আমার বয়সটা দিদির থেকে অনেক বেশি বলে আর হয়ত চাকরি করছি বলে দিদির মত মারধর জোটেনি। হয়ত বা জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর বাবা অনেকটা হীনবল হয়ে পড়েছেন বলেও নির্যাতনের বহর আর মাত্রা অন্যরকমের হয়েছে।

পরের দিন গিয়ে নোটিস দিয়ে এসেছিলাম। সেও মাস খানিকের বেশি হয়ে গেল। আসছে কাল রেজেস্ট্রি করছি আমরা। অতঃপর চলে যেতে হবে এতদিনের চেনা এই বাড়িঘর, বাবা-মা আত্মীয় পরিজন ফেলে। জানিনা সাময়িকভাবে না চিরতরে? ভবিতব্যই জানে তা।

কিন্তু নিজের বিগত জীবনটাকে মেলে ধরতে গিয়ে আর ভবিষ্যতের ছবিটা কল্পনা করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল অরুণাংশু ঘোষের কথা। কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে যে আমার হাত দেখে আশ্চর্য একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল এক সন্ধ্যায়। ইচ্ছা করছে তার কাছে থেকে আরও একটি

কথা জেনে নিই। অতঃপর কি আছে ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জন্য? আমার আর মিশেলের জন্য? কিন্তু ভবিষ্যতেব কথা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক।

তা নিয়ে অকারণ দুশ্চিন্তার সময় নয় আজ। দারুণ গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ দিনের অবসানে অবশেষে নেমে আসছে বর্ষা অজস্র ধারায়। তার সেই শ্যামল সুন্দর সুস্নিগ্ধ আবির্ভাবকে আর কেন প্রতিহত করি মিথ্যা সংশয় নিয়ে সরোষ ভ্রূকুটিতে? আমার এই জীবনের তৃষার পরে, ভুখের পরে শ্রাবণের ধারার মত যা বর্ষিত হতে যাচ্ছে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই পরম নির্ভরতায়। বরণ করে নিই সেই আশু সম্ভাবনাকে পরম আস্থায়, প্রগাঢ় প্রশান্তিতে।